দুইটাকা

বাঙ্গালা সরকারের মাননীয় অর্থসচিব

শ্রদ্ধাস্পদ

ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে ভক্তি ও সম্মানসহ

'অতীত বস্তু'

অর্পণ করিলাম

কলিকাতা

৯ই অক্টোবর ১৯৪২

বিনীত

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নামকরণ

প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, পালি ভাষার 'জাতক'। জাতকের গল্পগুলিতে সাধারণতঃ পাঁচটি করিয়া অংশ পাওয়া যায়। প্রথম অংশ, 'প্রত্যুৎপন্ন বস্তু' অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ঘটনা ; দ্বিতীয় অংশ, 'অতীত বস্তু' অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ঘটনার অনুরূপ প্রাক্‌বুদ্ধযুগের কোন পুরাতন কাহিনী ; তৃতীয় অংশ, 'গাথা' অর্থাৎ সমস্ত গল্পটি মনে রাখিবার জন্য ছন্দে গ্রথিত গল্পের সারাংশ ; চতুর্থ অংশ, 'সমোধান' অর্থাৎ সেই গল্প সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের বাণী ; এবং পঞ্চম অংশ, 'ফলশ্রুতি' অর্থাৎ গল্পটি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের কিরূপ আত্মোন্নতি হইয়াছিল তাহারই ইতিহাস। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এইরূপ,—ভগবান বুদ্ধের নিকট কখনও কোন প্রসঙ্গের অবতারণা হইলে (প্রত্যুৎপন্ন বস্তু) বুদ্ধদেব সেই প্রসঙ্গটিকে সম্যকভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য অতীত কালের কোন এক কাহিনীর উল্লেখ করিতেন। এই কাহিনীর নামই অতীত বস্তু (পালিতে 'অতীতবৎথু') এবং ইহা 'অতীতে' এই শব্দ দিয়া আরম্ভ হইত যথা, 'অতীতে বারাণসীয়ম্ ব্রহ্মদত্তে রজ্জম্ কারেন্তে' বা 'অতীতে কস্‌সপসম্মাসম্বুদ্ধকালে' ইত্যাদি।

উপস্থিত গ্রন্থের গল্পগুলিতে বর্তমানের সহিত অতীতের অলক্ষ্য যোগসাধনই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই সূক্ষ্ম সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে অতীতই অধিকতর স্পষ্ট। সেইজন্যই গ্রন্থের নামকরণ,—অতীত বস্তু।

সূচী

অতীত জননী ১

তিথি পূজা ৮০

মূর্ত্ত স্মৃতি ১০৭

বন্দিনী ১৩০

সাথী ১৬০

... ... ১৭৮

মহাকালের বুভুক্ষা ১৯৮

ডায়রীর একদিন (প্রবন্ধ) ২২৩

অতীত জননী

ছোট একটি কুঁড়ে ঘর পাওয়া গিয়েছিল। বাড়ীর মালিক মন্মথবাবু ওখানে থাকেন না, বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে দিনাজপুর টাউনে বাস করেন। নরেশ খোঁজ করে তার কাছ থেকে একখানা ঘর ভাড়া করে চাবিটা নিয়ে এসেছিল। আমাদের ব্রাহ্মণ জেনে তিনি মাসিক ছ' আনা ভাড়ায় ঘরখানি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

উঁচু এবং সরু দাওয়ার কোলে দু'খানা ঘর। তার একখানায় মন্মথবাবুর নিজের তৈজসপত্রাদি আছে, হয় ত সেইটিই তাঁর শোবার ঘর ছিল; আর এ'খানি অর্থাৎ, যেটি আমরা ভাড়া করেছি, সেটি সম্ভবতঃ ছিল তাঁর ভাঁড়ার ঘর। ঘরের চার পাশের দেওয়ালেই মাচা; কোন দিকেই জান্‌লা নেই। মাচার তলায় চেটাই পেতে শোবার উপযুক্ত একটা বিছানা আমরা রাত্রের মত করে নিলুম।

কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেছে, আসল কথাই যে বলা হয় নি।

আমি ও আমার বন্ধু নরেশ দু'জনে মিলে কল্‌কাতা থেকে এসেছি এই মহীপাল গাঁয়ে। দিনাজপুর ষ্টেশন থেকে এই গ্রামটা প্রায় সাত

মাইল দূরে। মধ্যে কি একটা সরু নদী আছে, তার নামটা ঠিক্ মনে নেই। কোন রকমে গরুর গাড়ী করে' নদী পার হয়ে এই অসম্ভব বুনো জায়গায় এসে পড়া গেছে।

কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?

শুন্‌লে লোকে হাস্‌বে, কিন্তু নরেশ ত ছাড়বার পাত্র নয়—যা' ধরে, তা' সেই করবেই।

দুই

নরেশ আমার স্কুলের বন্ধু; কিন্তু সে কথা বল্লে একটু ভুল হয়, আসলে সে আমার খেলার মাঠের বন্ধু। আমি নরেশের চেয়ে ভাল ক্রিকেট খেল্‌তুম বলে' ভাগ্যদেবী আমাকে তার ঠিক্ প্রতিদানই দিয়েছেন— আমি আর স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুক্‌তেই পারলুম না, সে কিন্তু সমস্ত পাঁচিল টপ্‌কে টপ্‌কে সোজা গিয়ে হাজির হলো এম্-এ ক্লাসে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম্-এ পাশ করে পুরাকালের ভাষা এবং অক্ষর সম্বন্ধে সে হয়ে উঠ্‌লো ধুরন্ধর। এই থেকেই তার একটা বড় উপসর্গ হলো পুরান পুথি খোঁজার। এই পুথির বাতিক আমার ঠাকুর্দারও বড় কম ছিল না। কল্‌কাতার বাড়ীতে তিনি প্রচুর পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন, তবে তিনি মারা যাওয়ার পর আমরা সেগুলোকে আবর্জ্জনা ভেবে সিঁড়ির তলায় স্তূপাকার করে রেখেছিলাম। নরেশ একদিন খোঁজ পেয়ে সিঁড়ির তলায় ঢুকে সারা দিনের পরিশ্রমের পর ধূলো ও ঘামে এক রকম 'হোঁদলকুৎকুতে'র বেশে যখন সন্ধ্যেবেলা কয়েকখানি পুরানো পুথি নিয়ে বেরিয়ে এল, তখন আমার মা হলেন লজ্জিত, হাস্‌তে হাস্‌তে আমার ত দম্ বন্ধ হবার উপক্রম হলো। কিন্তু নরেশের মুখে এক অভাবনীয় তৃপ্তি!

এটা হলো আজ থেকে চার মাস পূর্ব্বের কথা।

তারপর সে আমায় হলুদ রঙের জীর্ণ একখানি পুথি দেখিয়ে বল্লে যে, সেইটাই না কি আমাদের কোন এক পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস। শেষের কয়েকখানি পাতা না থাকায় সেখানার তারিখ ঠিক্ জানা না গেলেও লেখা এবং ভাষা থেকে পুথিখানা যে খুবই প্রাচীন, তার কোন সন্দেহই

ছিল না, অবশ্য নরেশের কাছে। সেখানি কড়্চা, লেখকের জীবনচরিত বিশেষ; আর সেই লেখকটিও বড় কেউকেটা নন, মহীপাল নিবাসী দণ্ডধর মহামাত্য যজ্ঞেশ্বর কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং লিখিত ঐ গ্রন্থ। ওখানার মধ্যে সেকালের অনেকানেক বর্ণনা পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের ব্যাপার হলো পুথির শেষ দিকের কয়েকখানি পৃষ্ঠা নিয়ে। সংক্ষেপতঃ পুথির বিষয়টা হচ্ছে এই—

গৌড়েশ্বরের মহামাত্য এবং মহীপাল নামক গ্রামের দণ্ডধর, মহা-প্রতাপান্বিত যজ্ঞেশ্বর 'দণ্ডধর-মহামাত্য' নামে পরিচিত ছিলেন। স্বদেশে মহামাত্যের অসীম প্রভাব। রাজসভায় তিনি ছিলেন প্রধান মন্ত্রী এবং বিদ্বজ্জনসমাজেও তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। সংস্কৃত এবং দেশী ভাষায় তিনি তাঁর স্বরচিত অনেকগুলি পুস্তকের নামই ওই জীবনীর মধ্যে করেছেন—তবে সে বইগুলি ঠাকুর্দার সংগৃহীত পুথির স্তূপের মধ্যে পাওয়া যায় নি, এই হলো নরেশের সখেদ অভিযোগ। এ ছাড়া, যজ্ঞেশ্বর মহামাত্যের কতকগুলি দুঃখ-কাহিনীও ওই জীবনীতে পাওয়া গেল। তার মধ্যে সবচেয়ে দরকারী কথা হলো এই যে, তাঁর একমাত্র পুত্র রত্নেশ্বর দারুণ অবাধ্য ছিল। পিতার আদেশ অমান্য করে, সে তার বিবাহিত স্ত্রীকে হত্যা করে, কোন এক ধীবর-কন্যাকে নিয়ে গৌড় ছেড়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে; সম্ভবতঃ, কলিঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, এই হলো যজ্ঞেশ্বরের বিশ্বাস। পুথির পাতায় আমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষ যজ্ঞেশ্বরের জীবন বৃত্তান্ত অনেকই শুন্‌লুম কিন্তু শেষের দিকে ভারী একটা দরকারী খবর ছিল।

তিনি যা' লিখ্ছেন, তার অনুবাদ করলে এই হয়—

আমার এই বিশাল ঐশ্বর্য্য ও অগাধ সম্পত্তি আজ আমার কাছে ভার মাত্র। বৎসরান্তে চণ্ডমহাদেবীর নিকট নরবলি দিয়ে ইতঃপূর্ব্বে

বহুবার প্রার্থনা করেছিলুম ‘যেন আমার অগাধ ঐশ্বর্য্য হয়’ কিন্তু কি জানি কেন, মানসিক শান্তির জন্য কোন দিনও কামনা করি নি। এইখানেই বোধ হয় আমার ভুল হয়েছে। এখন এই বার্দ্ধক্যে এসে আমার মনে হয়, হল্‌দে রঙের কাপড় পরা ওই সব নেড়ানেড়ী সন্ন্যাসীগুলো হয় ত খুব সুখেই আছে, আর আমরা এই ‘ঐশ্বর্য্য ও বিস্তৃতির অনন্ত কুম্ভীপাকে’ কেবলই ঘুরে মর্‌ছি। সিন্দুকে আমার যতই সোনা থাক্‌, পুত্র ও পুত্রবধূর শোক আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌লুম না; রাজবৈদ্য ঔড়ুম্বরের সুখ্যাতিতে ‘চতুষ্কোণ পৃথিবী’ মুখরিত হলেও, মৃতপ্রায় পত্নীর শ্বাসকষ্ট সে মুহূর্ত্তের জন্যও প্রশমিত কর্‌তে পারে নি; ধানুষ্কি, হস্তী ও অশ্বের বিরাট বাহিনী আমার ইঙ্গিতে ওঠা-বসা করে, কিন্তু তাদের ওই সমবেত শক্তি দিয়েও আমি আমায় জরা ও বার্দ্ধক্যকে দূরে রাখ্‌তে পাচ্ছি না। অসহায় ক্রীতদাসের মত আমি আজ নিতান্তই মৃত্যু-রাজের ক্রীড়নক!

এতদূর পড়ে ফেলে নরেশ উল্লসিত হয়ে বলে উঠ্‌লো, শুন্‌লে, শুন্‌লে একবার! কি চমৎকার কবিত্বপূর্ণ লেখা! কিন্তু একটা বিষয় আমার আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে ভাই, পাল রাজার মহামাত্য হয়ে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন না, উল্‌টে নরবলি দিতেন। এইটে যেন আমার কেমন কেমন লাগ্‌ছে।

তারপর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আরও কিছু লিখেছিলেন, যার জন্য আজ আমরা এইখানে ছুটে এসেছি।

তিনি রত্নেশ্বরকে সম্বোধন করে লিখেছেন—রত্নেশ্বর, প্রিয়পুত্র, এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। দেখা করার ইচ্ছাও আমার তেমন নেই কারণ, তুমি বিনা কারণে স্ত্রীহত্যা করেছ। কিন্তু, কিন্তু আমার অর্থ আমি আমার পিণ্ডদানকারী ছাড়া আর কা’কে দিয়ে যাবো? আমার যাবতীয় ভূসম্পত্তি, উপস্থিত প্রজাদের

সম্পূর্ণ নিষ্করক্সপে দান করে গেলুম ; কারণ, জমি প্রজার—যারা চাষ করে এবং জমি রাজার—যিনি রক্ষা করেন। দণ্ডধর বা তথাকথিত ভূস্বামীর জমির ওপর কোন অধিকারই থাকা উচিত নয়—তাঁদের অধিকার অধিকার নয়, চিরাচরিত প্রথা ও বিশ্বাস অনুসারে তারা প্রজাদের শক্তি দিয়েই প্রজাদের শোষণ করে।

নরেশ পুনরায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠ্‌লো, দেখেছো, দেখেছো একবার ব্যাপারটা—এ ত খাঁটি 'কমিনুজিম্‌।' এই পুথিটা নিয়ে আমি অন্ততঃ দশটা প্রবন্ধ লিখ্‌বো। একবার ভেবে দেখো দেখি, যে জিনিষ নিয়ে আজ ইউরোপ পাগল হয়ে উঠেছে, ঠিক্‌ সেই ভাবটাই বাংলাদেশে হাজার বছর পূর্ব্বে—

বল্লুম, পড়ো পড়ো, এ সব আলোচনা পরে করা যাবে।

তখন যজ্ঞেশ্বরের লেখাই পড়া চল্‌তে লাগ্‌লো। তিনি লিখ্‌ছেন—সম্পত্তি আমি প্রজাদের দিয়ে গেলুম ; ঘর বাড়ী, গোবৎসাদি সমস্তই আমার আচার্য্যকে দিলুম, ক্রীতদাসদের অল্প অল্প জমি দিয়ে স্বাধীন করে গেলুম, কিন্তু বহুদিনের সঞ্চিত সহস্রভার স্বর্ণ, স্বর্গতা স্ত্রীর লক্ষ দ্রম্যের অলঙ্কার এবং মহাচীন, যবদ্বীপ, সিংহল ইত্যাদি দেশ থেকে প্রাপ্ত কোটী কোটী মূল্যের মণিরত্নাদি সমস্তই আমার ভাবী বংশধরের জন্য সঞ্চিত রইল। আমার এই দার্ব্বটের দক্ষিণদিকস্থ জলাশয়ে যক্ষের অধীন করে সমস্তই স্থাপন করলুম। আমার ভাবী বংশধরকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যক্ষরাজ মুক্তিলাভ করবে।

এই পর্য্যন্ত পড়েই নরেশ আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। তার চোখ মুখ সমস্তই যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

যজ্ঞেশ্বরের উচ্ছ্বাস তখনও থামে নি। অনাগত বংশধরকে লক্ষ্য করে' তিনি লিখ্‌ছেন—হে আমার অজ্ঞাত সন্তান, তুমি তোমার পিতৃপুরুষ

হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে স্মরণ করে মহীপাল সাগরের কূলে বসে পিণ্ডদান করো। তোমার সেই অমৃতময় পিণ্ড নিয়ে আমি তৃপ্ত হবো। ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য এ সমস্তের সমবেত প্লাবন যাকে তৃপ্ত কর্‌তে পারে নি, সেই আমি হবো তোমাদের কাছে গণ্ডূষমাত্র জলের প্রার্থী। পরপারের নিবিড় অন্ধকারে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়ে গেছে, জীবনের পুঞ্জীভূত পাপের বোঝায় আমি তিলে তিলে নেমে যাচ্ছি। হে আমার অনাগত বংশধর, তোমাদের ওপরেই আমার সকল আশা লূতাতন্তুতে দোলায়মান গিরিশৃঙ্গের মত অবস্থিতি কর্‌ছে।

এরপর পুথির পাতায় লেখা আছে চণ্ডীর কয়েকটি শ্লোক। দেখ্‌লেই মনে হয়, হতাশ লেখক তাঁর পারের পাথেয় সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বিশ্বাস ও শাস্ত্র যেখান থেকে যা' পেয়েছিলেন, সব কিছুরই স্মরণ নিয়েছিলেন।

তিন

তারপর সুরু হলো নরেশের গবেষণা ও আমাদের কল্পনা।

পরবর্ত্তীকালের লিখিত এবং সেই পুথির মধ্যস্থিত একটি বংশ-তালিকা ও ঠাকুর্দার সংগৃহীত অপরাপর কুলজী গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আমরাই যজ্ঞেশ্বরের বংশধর। এক জায়গায় ঠাকুর্দার সামান্য একটু 'নোট' করা ছিল; তাই থেকে এও বোঝা গেল যে, তিনিও ওইরূপ মত পোষণ করতেন। ব্যাপারটা সমস্ত শুনে মা বল্লেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার শ্বশুর বল্‌তেন বটে যে, আমাদের অভাব কি? সাত রাজার ধন আমাদের জলের নীচে জমা আছে।

নরেশ বল্লে, মাসীমা, এ বিষয়ে আপনি কি কিছু খোঁজ করেন নি?

মা বল্লেন কে জানে বাপু, আমি ও সব কথায় মোটে কানই দিই নি।

এই ঘটনার পরদিন নরেশ বল্লে, ভাই, তোমার এই টাকা যদি আমি উদ্ধার করে দিতে পারি, তা' হলে তুমি আমায় কি দেবে বলো দেখি?

বল্লুম, অর্দ্ধেক দেবো।

সে তা'তেই স্বীকৃত হলো এবং তারপর চাইলে ঠাকুর্দার সমস্ত পুথিগুলো বল্লে, এগুলো সব নিয়ে যেতে পারি?

বল্লুম, স্বচ্ছন্দে।

নরেশ বোধ হয় ঠিক্ করেছিল যে, ওই টাকা পেয়ে সে বেশ একজন ধনী হয়ে উঠ্‌বে এবং পুথিগুলো দিয়ে ঐতিহাসিক মহলে প্রকাণ্ড নাম কিন্‌বে।

চার

এরপর আমাদের যোগাড় চলেছিল পুরো উদ্যমে। 'ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' ঘেঁটে ঘেঁটে সারা বাংলাদেশে দুটো মহীপাল গাঁয়ের সন্ধানে পাওয়া গেল। একটা হলো দিনাজপুর মালদহের সীমারেখার কাছে, আর একটা মুর্শিদাবাদের মধ্যে। 'সার্ভে ম্যাপ্' অনুসন্ধান করে দেখা গেল এই যে, মুর্শিদাবাদের মহীপাল গাঁয়ে মহীপালের নামে কোন পুকুর নেই, কিন্তু দিনাজপুরের মহীপাল-দীঘি সমধিক প্রসিদ্ধ। সেকালে দীঘি বা পুষ্করিণী কথাগুলো চলিত ছিল না, পরিবর্ত্তে সাগর বল্‌তো। নরেশের হিসাবে এই মহীপাল-দীঘিই প্রাচীন মহীপাল সাগর। অতএব—

ইতঃপূর্ব্বে নরেশ একবার একাই এসে এখানকার হাল-চাল সমস্ত দেখে গেছে। পুকুরটা কার সম্পত্তি, গভর্ণমেণ্টের খাসমহল কি না, পুকুরের 'মাইনিং লিজ' পাওয়া যায় কি না, এই সমস্ত সন্ধান নিয়ে সে এসে আমায় জানালে যে, জায়গাটা আগাগোড়া জঙ্গল হয়ে আছে। আশপাশে নিম্ন-শ্রেণীর বাস অর্থাৎ, কৈবর্ত্ত, বারুই, জেলে এই সবই সেখানকার বাসিন্দা। ওইখানে গিয়ে অতি অল্প দামে জমিটা সমস্তই কিন্‌তে পারা যাবে। ওইগুলো কিনে নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে বসবাসের উপলক্ষে ওইখানে গিয়ে বাস কর্ত্তে হবে এবং পুকুরটা কাটাবার নাম করে কয়েকজন কুলি লাগিয়ে অল্প অল্প সন্ধান আরম্ভ করা যাবে; কারণ, একেবারে হৈচৈ সুরু করলে হয় ত বা ফ্যাসাদ ঘট্‌তে পারে।

হাঙ্গাম দেখে আমার কিন্তু উৎসাহ অনেক কমে এসেছিল। নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে তা'কে বল্লুম, নরেশ, তুমি কি বেশ জোর করে বল্‌তে পারো, ওই পুকুরটাই সেই পুকুর?

সে বল্লে, নিশ্চয়ই! এ বিষয়ে আমার তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কারণ, ওই পুথির মধ্যে যা' বর্ণনা আছে, সমস্তই হুবহু মিলে যাচ্ছে এমন কি, পুরাকালীন বটগাছ পর্য্যন্ত!

বল্লুম, তুমি কি ওই যজ্ঞেশ্বরের ভিটের সন্ধান পেয়েছ?

সে বল্লে; আলবৎ! সমস্তই ভেঙে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তা' হলেও সেই ভাঙা ভিত থেকে বাড়ীর 'প্ল্যান' আমি একরকম ঠিক করে ফেলেছি। মুসলমান যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে ওই জিনিষ একেবারে মিলে যায়। তারপর আরও অনেক প্রমাণ আছে, যাতে করে—। একটু থেমে দম নিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে সে বল্লে তুমি জানো, পুকুরের নৈঋত কোণে 'ন্যগ্রোধ বনস্পতির' তলায় 'জটা-ধরে'র বেদীর যে বর্ণনা ওই পুথিতে আছে, তাও অবিকল মিলে যায়। অবশ্য মাটীতে অনেকটা বসে গেছে, এই যা'। সিমেণ্টের পরিবর্ত্তে সেকালের ধনীরা 'বজ্রলেপ' ব্যবহার কর্ত্তেন। আমি ওই বটগাছের তলার বেদী থেকে একটুখানি ভেঙে এনে এখানকার 'আর্কিওলজিক্যাল এনালিষ্ট'কে দিয়ে পরীক্ষা পর্য্যন্ত করিয়েছি। তাঁরাও রিপোর্ট দিয়েছেন, ওগুলোকে 'বজ্রলেপ' বলে; আমি কি কাঁচা ছেলে হে?

বল্লুম, আচ্ছা, সবই ত হলো, কিন্তু এতকাল পরে ওই টাকা যে ঠিক্ ওইখানেই আছে, তার কি প্রমাণ? আগেই হয় ত কেউ তুলে নিয়েছে। এমনও ত হতে পারে?

সে বল্লে, দেখো, এইখানে অবশ্য নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। তবে আমার বিশ্বাস, টাকা কেউ তুলে নেয় নি।

বল্লুম, কেন, তোমার এই বিশ্বাস কি করে' হলো?

সে বল্লে, শুন্বে, তবে শোন। আমার এই বিশ্বাসের প্রথম কারণ হলো এই যে, পুথিখানা বরাবর তোমাদের কাছেই আছে এবং তোমার

ঠাকুর্দা নিশ্চয়ই বংশপরম্পরায় শুনে আসছেন যে, জলের তলায় তোমাদের সাত রাজার ধন আছে। অর্থাৎ, এটা ঠিক্ যে, তোমাদের বংশের কাহিনীতে টাকা আছে এই বিশ্বাস, কিন্তু ওই টাকা যে, তোলা হয়েছে, এ রকম কোন প্রবাদ নেই। দ্বিতীয়তঃ, আর একটা প্রমাণ আছে, সেটা অবশ্য তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না। কিন্তু সেটা হচ্ছে এই যে, ওখানে গিয়ে খোঁজ করে শুন্‌লুম, ওই পুকুরের জল কখনও শুকোয় না অথচ, পুকুরটা অত্যন্ত অগভীর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আশ্বিন মাসেও অত বড় মহীপাল দীঘির মাঝখানে দেখ্‌লুম মোটে এক বুক জল অর্থাৎ বর্ষাতেও ডুব জল হয় না। কিন্তু তা' সত্ত্বেও শুন্‌লুম ওই পুকুরে জল না কি কখনও শুকোয় না। অথচ, পাশাপাশি অন্যান্য দীঘিতে এই সময় আট দশ হাত পর্য্যন্ত জল থাকে, অথচ মাঘ মাসে সমস্তই শুকিয়ে যায়। আমাদের শাস্ত্রীয় প্রবাদ আছে এই যে, যক্ষের পুকুর কখনও শুকোয় না। এদিকে সাধারণ বুদ্ধিতে দেখ্‌ছি যে, দশ হাত জলের পুকুর শুকিয়ে গেলে, তিন হাত জলের পুকুরও শুকানো উচিত কিন্তু তা' যখন হচ্ছে না, তখন—

হেসে উঠ্‌লুম।

নরেশ এবার রীতিমত চট্‌লো। বল্লে, কি ভাব্‌ছো হে তুমি, তোমার ওই হাসিটাই হলো মূর্খের হাসি। এটা মনে রেখো যে, তোমার ওই অবজ্ঞার হাসিতে মানুষকে চিরদিনই পেছিয়ে রাখে কিন্তু যদি কেউ তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়—তবে সে বিশ্বাস।

বল্লুম, ভাই, যাই বলো আর যাই কর, আমি এই অনিশ্চিতের পেছনে কিন্তু বাজে পয়সা নষ্ট কর্‌তে একেবারেই রাজী নই।

সে বল্লে, বহুত আচ্ছা! তোমায় এক পয়সাও খরচ কর্ত্তে হবে না, সমস্তই আমি করবো। তবে টাকা যদি ওঠে, তা' হলে খরচ-খরচা বাদ

দিয়ে যা' থাক্‌বে, তার তিন ভাগ কিন্তু আমার, এক ভাগ তোমার। তবে গোড়া থেকেই তোমায় আমার সঙ্গে থাকতে হবে কারণ, তুমি হলে বংশধর, গুপ্তধনে একমাত্র অধিকার যে তোমারই।

বাধ্য হয়ে স্বীকৃত হলুম; কারণ, স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায়ই আমার ছিল না।

সেদিন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে আপন-মনেই বল্‌তে লাগ্‌লো, আছে, আছে, নিশ্চয়ই আছে! আমার মন বল্‌ছে—সত্যি. সত্যি, সব সত্যি!

আমিও ভাব্‌লুম—'সত্যি', নরেশ যে এতখানি পাগল, তা' আমি আগে ত মোটেই জান্‌তুম না।

পাঁচ

আজ দুপুরে আমরা মহীপাল গাঁয়ে এসে হাজির হয়েছি। সঙ্গে আমাদের বসবাসের আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র সবই আছে; সেই প্রাচীন পুথিখানা এবং খরচের মত অল্প কিছু টাকাও। গ্রামের অনেকেই আমাদের উদ্দেশ্য জান্‌বার জন্য এসেছিল। আমরাও তাদের উপযুক্ত একটা মনগড়া উত্তর দিয়ে দিয়েছি। তারা যেন বোধ হল, খুসি হয়েই গেছে, হয় ত বা কেউ সন্দেহের চোখেও দেখ্‌ছে। তা দেখুক, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।

বিকালে একটু ঘুরে এসে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আহারাদি শেষ করে নেওয়া গেল; কারণ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের রাত্রিকাল যেমন কাজের পক্ষে অচল, এখানকার রাত্রিও ঠিক্ সেইরূপ। বিশেষতঃ, দিনাজপুর জেলাটাই হলো সাপের জন্য বিখ্যাত।

আহারাদি শেষ করে সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই সেই ছ' আনি ঘরের কীটদষ্ট দরজায় হাঁক্ [অর্গল] দিয়ে আমি ও নরেশ মশারী ফেলে বিছানার মধ্যে আশ্রয় নিলুম। তারপর এদিক-ওদিক নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনায় আরও খানিকটা সময় আমাদের কাট্‌লো।

রাত্রি ক্রমেই গভীর হচ্ছে, সেই সঙ্গে নানারূপ শব্দও শোনা যাচ্ছে। শীতকাল, কিন্তু তা' সত্ত্বেও ব্যাঙের ডাকের মত আওয়াজ, গাছ থেকে পাখীদের কত রকম অদ্ভুত স্বর, ঘরের বারান্দায় ইঁদুরদের দ্রুত গতিবিধির শব্দ, ঘরের পেছনেই শৃগালেরা প্রহর হাঁক্‌ছে, অল্প অল্প হাওয়ায় নিকটবর্ত্তী বাঁশবনে বিকট বংশীধ্বনিও শোনা যাচ্ছে, শেষে ঘরের ভেতরেই—ও কি, ও যে ঠিক্ মশারীর বাইরেই! ডাইনে না বাঁয়ে—

—নরেশ!

একই বিছানায় দু'জনে শুয়েছিলুম। ওকে ডেকেই উঠে 'টর্চে'র আলো জ্বেলে মশারীর ভেতর থেকে বাইরেটা ভাল করে দেখে নিলুম। কই, কেউ ত কোথাও নেই।

নরেশ বল্লে, দেখো, এক কাজ কর, হ্যারিকেনটা জ্বেলেই রাখো, কি জানি যদি কোন দরকার-টরকার হয়।

হ্যারিকেনটা আমিই নিবিয়েছিলুম, কিন্তু এখন ওই প্রস্তাবটা নরেশ না করলে হয় ত আমিই করতুম।

বেরিয়ে এসে হ্যারিকেনটা জ্বেলে সদ্য কেনা মাটীর কলসী থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে আবার মশারীর মধ্যে প্রবেশ কল্লুম।

শুয়ে শুয়ে নানারূপ কথা মনে পড়তে লাগ্‌ল। হাজার বছর পূর্ব্বে কোন্ পিতৃপুরুষ অর্থ সঞ্চয় করে রেখে গেছেন, গেছেন কি না জানি না, কিন্তু আমরা আজ তারই আশায় ঘর-বাড়ী ছেড়ে একরকম পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এসেছি অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে। কে জানে আমাদের এই চেষ্টার কি ফল হবে, হয় ত এই বিদেশে এসে অপঘাত মৃত্যুই হবে, কি হয় ত ধনরাশির সন্ধান পেয়ে পৃথিবীর মধ্যে—। যজ্ঞেশ্বর, না জানি যজ্ঞেশ্বর কি রকম লোক ছিলেন? এখানকার সম্পত্তিগুলো তিনি ত সমস্তই তাঁর আচার্য্যকে দিয়েছিলেন। যে অর্থের সন্ধানে আমরা এসেছি, সেই আচার্য্য-পুরোহিত কি ওই অর্থের সন্ধান জান্‌তেন না? তিনিই যদি ওই সবগুলো বার করে নিয়ে থাকেন—

নরেশের প্রশ্নে আমার এলোমেলো চিন্তাস্রোত বাধা পড়লো। সে বল্লে—আচ্ছা, ওই আচার্য্য লোকটি কেমন ছিলেন, যাকে যজ্ঞেশ্বর তাঁর বাস্তুভিটা দান করে যান।

আশ্চর্য্য, দু'জনেরই চিন্তা ঠিক্ এক সঙ্গে একই রকম মিলেছে! বল্লুম,,

কেমন করে বল্‌বো বলো, তোমার পুথিতে কি আছে, সে তুমিই জানো।

ঘরের বাইরে বারান্দায় কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ হলো। নরেশ ও আমি দু'জনেই কান খাড়া করে শুন্‌তে লাগ্‌লুম—কার যেন পদশব্দ, কে যেন আস্‌ছে। এবার স্পষ্ট শুন্‌লুম, দরজায় কে যেন আঘাত করলে। 'টর্চ' জ্বেলে চট্‌ করে দরজার দিকে আলোটা ফেল্লুম। দেখি, দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। আততায়ীর আশঙ্কায় আমরা দু'জনেই এক-সঙ্গে মশারীর বাইরে এলুম। 'টর্চে'র তীব্র আলো ফেল্লুম আগন্তুকের মুখে, একটি সুন্দর, প্রৌঢ় লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ কল্লেন।

আগন্তুকের খালি গা, মাথায় একটি ছোট পাগড়ী, কাঁধের ওপর লাল ছোট একগাছি পৈতা, কোমরে ফের দেওয়া কাপড় হাঁটুর ওপরে উঠে আছে, খালি পা, মুখে যেন বিষাদের ম্লান ছায়া।

নরেশই তাঁকে প্রথম প্রশ্ন কল্লে, কে, কে আপনি ?

কোন উত্তরই তিনি দিলেন না।

মশারীর মধ্যেই ছোট একটা লাঠি আমি রেখেছিলুম ; বেরোবার সময় সেটা হাতে করেই বেরিয়ে এলুম। নরেশের প্রশ্নে নিরুত্তর দেখে আমার সন্দেহ যেন আরও বেশী হলো। লাঠিটা শক্ত করে ধরে খুব জোর গলায় বল্লুম, কে আপনি বলুন—বলুন, বল্‌তেই হবে।

আমার মুখের দিকে স্নেহকোমল দৃষ্টি দিয়ে আগন্তুক খাঁটী সংস্কৃত ভাষায় উত্তর দিলেন, বল্লেন, আমি আচার্য্য।

আচার্য্য, কে আচার্য্য! নিদারুণ বিস্ময়ে নরেশ তাঁকে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ কর্‌তে লাগ্‌লো,—কোন আচার্য্য ?

তেম্‌নি সংস্কৃতে তিনি উত্তর দিলেন, বৎস যজ্ঞেশ্বর, তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না ? আমি আচার্য্য, তোমাদের কুলপুরোহিত।

তাঁর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে নরেশ বল্লে, কে, কে আপনি? কা'কে আপনি যজ্ঞেশ্বর বল্‌ছেন? আপনি কার কুলপুরোহিত? তা' আপনি যেই হোন্, এখানে এ সময় আপনি কি কর্ত্তে এসেছেন?

অল্প হেসে আগন্তুক বল্লেন, এলুম আমি তোমাদের যুগ্ম আকর্ষণে। তোমরা যে দু'জনে একত্রে আমার চিন্তা কর্‌ছিলে। আমি কি না এসে থাক্‌তে পারি।

চকিতের জন্য নরেশ আমার মুখের দিকে চাইলে। সেই ব্রাহ্মণের কথায় আমি যেন নিজের ওপরই নিজের বিশ্বাস হারাচ্ছিলুম।

ছয়

ঘর থেকে বাইরে আসার জন্য আচার্য্য আমাদের ইঙ্গিত কল্লেন। সেই ইঙ্গিতের মধ্যে কি একটা মোহিনী শক্তি ছিল জানি না কিন্তু আমরা দু'জনেই আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই, যেন বিশাল পৃথিবীতলে এই তিনটি মাত্র প্রাণী ছাড়া জীবন বলে আর কিছুই নেই। জড়জগতের পরমাণুগুলিও সুপ্তিতে বিভোর, কেবল মাথার ওপর আধখানা চাঁদ। তারই আলোয় সেই আলো আঁধারি উঠানটি কি যেন এক অজ্ঞাত রহস্যে পরিপূর্ণ।

রোয়াকের ওপর ধূলোতেই আচার্য্যদেব বস্‌লেন। নরেশ ও আমাকে বস্‌তে ইঙ্গিত কল্লেন। তারপর পরিষ্কার সংস্কৃতে তিনি বল্লেন, যজ্ঞেশ্বর, তুমি আমায় রেহাই দাও।

নরেশ ভাঙা ভাঙা সংস্কৃতে উত্তর দিলে। বল্লে, আপনি কে, আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই বা কি, আর আমাকে যজ্ঞেশ্বরই বা বল্‌ছেন কেন, এ সমস্ত কিছুই ত বুঝ্‌ছি না।

ডান হাতের উল্‌টা পিঠটা কপালের ওপর বুলিয়ে নিয়ে তিনি চাঁদের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বল্লেন, ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, ভ্রান্তিই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল। ওরে মুগ্ধ মানব, তুমি কে, তা' তুমি জান না— তুমিই যে দণ্ডধর মহামাত্য প্রবল প্রতাপ যজ্ঞেশ্বর। গৌড়রাজ্যের মুখ্য নিয়ামক হয়ে তুমি আজ সমস্ত ভুলে গিয়ে চুপ করে' বসে আছ! ওঃ, এই সেই যজ্ঞেশ্বর, হায় ভগবান!

অবাক্ বিস্ময়ে নিরুত্তর হয়ে রইলুম। তিনি পূর্ব্ববৎ বলেই চল্লেন।

বল্লেন, যজ্ঞেশ্বর, তুমি ভুলে গেছো, কিন্তু আমার মনে আছে, যেদিন তুমি স্বর্ণচূড় বণিকের সুসজ্জিত 'হেমমুখ নৌকা'য় সাধারণ দাস হয়ে দক্ষিণের সমুদ্রে যাত্রা করেছিলে। সেদিন তোমার জীবনের ওপর তিলমাত্রও মায়া ছিল না। নিঃস্ব অসহায় যুবক তুমি আমার কাছে আশীর্ব্বাদের জন্য গিয়েছিলে। আমি তোমার লক্ষণ দেখে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলুম প্রাণ খুলে। তারপর দিন যায়, তোমার কথা দেশবাসীরা ক্রমে সবই ভুলে গেল, কিন্তু আমি ভুলি নি। শেষে তুমি ফিরে এলে, প্রায় দশ বৎসর পরে ফিরে এলে এক যবনীকে বিবাহ করে তারই যবন-যানে। সেদিন আমিই তোমাদের আদর করে' ঘরে তুলে নিয়েছিলুম। যবনীর জন্য দু'-একজন সামান্য আপত্তিও করেছিল কিন্তু সে আমলে হিন্দুর প্রাণ ছিল, তারা পরকে আপন করে নিতে পার্‌তো। অনন্তকালের সঙ্গিনীর উপস্থিত কোন্ ঘরে জন্ম হয়েছে, জন্মের সেই আকস্মিক ঘটনাকে বড় করে তারা ব্যাপ্তির অপমান কর্‌তো না। অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে তুমি তোমার নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হ'লে। তারপর সে কত সব কাহিনী, কত ঘটনা। বৈদেশিকদের রাজসভায় আগমন। নানাভাষাবিদ্ বলে রাজা তোমায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন, তোমার মূল্য বুঝ্‌লেন, পূর্ব্ববঙ্গ অভিযানে তোমায় নিয়ামক করে প্রেরণ করা হলো। সেনাপতি মহাশক্তিকে তোমার সঙ্গে দেওয়া হলো। তুমি জয়ী হয়ে ফিরে এলে। রাজা তোমায় উত্তর বিভাগের দণ্ডধর করে দিলেন। তারপর তুমি অমাত্য হলে, পরে মহামাত্য। যজ্ঞেশ্বর, এ সব কি তোমার কিছুই মনে পড়ে না ?

নরেশ তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিল। আচার্য্য-মহাশয়কে আমার একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু সংস্কৃত জানি না বলে মনের কথা মনেই চেপেই রাখ্‌লুম। আমার দিকে ফিরে চেয়ে আচার্য্য বল্লেন,

হ্যাঁ, আমিই সেই। আমি পাপী, সেই জন্য জীবনের দেনা-পাওনা সমস্ত চুকিয়ে দেওয়া সত্বেও আশাস্ত্রীয় বিধানের ছিদ্রকে উপলক্ষ করে জননীর স্নেহ আমায় এম্‌নি করেই শূন্যপথে কল্পকাল ধরে বেঁধে রেখেছে।

আশ্চর্য্য হলুম। মনে মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তিনি সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন।

পুনরায় মনে মনে প্রশ্ন এল। তারও তিনি উত্তর দিলেন। বল্লেন, একটু অন্যায় হয়েছিল। বার্দ্ধক্যে এসে যখন যজ্ঞেশ্বর তার সম্পত্তি সমস্তই বিলিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আমিই তাকে উপদেশ দিয়েছিলুম, কিছু অর্থ বংশধরের জন্য রাখ্‌তে এবং সেটা যক্ষের অধীন করে দিতে। সে তখনি সম্মত হলো এবং সেইদিনই যক্ষের জন্য নিকষ-কৃষ্ণ পঞ্চমবর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালক অন্বেষণ করতে দিগেদশে চর প্রেরণ কর্‌লে। শেষে আমাদের রাজবাটীর নিকটস্থ এক বাটীতেই অনুরূপ বালকের সন্ধান মিল্‌লো। শাস্ত্রীয় নিয়ম হচ্ছে, প্রার্থনার অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে বালককে ক্রয় করে আনা। কিন্তু বিধবার একমাত্র সন্তান, কোন মূল্যেই সে ওই ছেলেটিকে বিক্রয় করতে সম্মত হলো না। অথচ, দিন যায়, কাজ করতেই হবে। তখন আমি নূতন বিধান দিয়ে সেই বালকটিকে অপহরণপূর্ব্বক উপযুক্ত মূল্য অগ্নি-দেবতাকে অর্পণ করে যজ্ঞের কাজ সুরু করি। কিন্তু যজ্ঞের সময় সেই বিধবার কানে ওই খবর পৌছায়। নিদারুণ ভয়ে তার দিন কাট্‌ছিল। পাগলের মতো হয়ে সে ছুটে এল রাজবাটীর দিকে, যজ্ঞের মধ্যে প্রবেশ করে যক্ষাসন থেকে তার ছেলেকে তুলে নিয়ে যাবে। এদিকে তখন তার ছেলেকে ভাঙে বিভোর করে আমাদের কাজ বহুদূর এগিয়ে পড়েছে। সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হতে পারে না, তাই যজ্ঞ-রক্ষীকে যজ্ঞেশ্বর হুকুম দিলে, ওই বিধবাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু সে তখন উন্মাদিনী। তার ছেলের নাম ছিল গর্গ। বিকট চীৎকারে ছেলের নাম ধরে ডাক্‌তে ডাক্‌তে কাঁদ্‌তে

কাঁদতে সে যজ্ঞস্থলে ঢুক্‌ছে। প্রহরীরা ধরলে, পথ বন্ধ কর্‌লে কিন্তু, তাকে আট্‌কান যায় না। শেষে দ্বারপাল ও কয়েকজন প্রহরী তাকে জোর করে বার করে' দিতে গেল। বিধবার বয়স হয়েছিল, গর্গ তার অষ্টম গর্ভের সন্তান। গর্গের পিতা মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেছিল। অন্যান্য ছেলেমেয়েগুলি পূর্ব্বেই মারা যায়। বৃদ্ধার শরীর ছিল নিতান্তই ক্ষীণ, দ্বারপালের আঘাত সহ্য কর্‌তে না পেরে সেইখানেই সে মারা পড়্‌লো।

নরেশ এতক্ষণ একাগ্রমনে শুন্‌ছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ তুলে বাংলায় বল্লে, আচার্য্য-মশায়, ধনীর ধন রক্ষার জন্য সেকালে দরিদ্রকে কি এম্‌নি ভাবেই নির্য্যাতন ভোগ কর্‌তে হতো !

আচার্য্য হেসে বল্লেন, এটা কালের দোষ নয় যজ্ঞেশ্বর, এটা এই পৃথিবীরই দোষ। এই পৃথিবীটাই আমাদের এমনি ভাবে তৈরী যে, এখানে প্রবলের প্রাণ বাঁচাতে দুর্ব্বলকে মরতে হয়। মনুর কথা কি মনে নেই—

'চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
সহস্তাশ্চ অহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ॥'

নরেশ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, আছে না কি মনুতে! এ ত একেবারে 'স্যারভাইভ্যাল্ অফ্ দি ফিটেষ্ট' নীতি।

তিনি বল্লেন, ভাষা যাই হোক্, জিনিষটা একই। তোমার বাঁচবার জন্য শত শত উদ্ভিদ, লক্ষ লক্ষ পরমাণুকে যে অহরহ মরতে হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর। একটু থেমে বল্লেন, তা' যাক্, যা' বল্‌ছিলাম। এম্‌নি করেই গর্গের মা যজ্ঞশালার দ্বারে আত্মবিসর্জ্জন দিলে, যজ্ঞ সম্পন্ন হলো। ছেলেটিকে মন্ত্রপূত বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত করে তার ওপর মাটী চাপা দিয়ে আমরা

হোমের অনুলেপন নিয়ে চলে এলুম। কিন্তু তারপর থেকে প্রতি রাত্রে আমরা প্রেতিনীর মর্ম্মন্তুদ্ চীৎকার শুন্‌তে পেতুম। তা'কে কোন মতে নিবারণ করা গেল না। সে দিন দিন দুর্ব্বার হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো এবং আত্মঘাতিনীর প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে দণ্ডধরের জীবন বিষময় হয়ে উঠ্‌ল। এর কিছুদিন পরেই যজ্ঞেশ্বরের সে জন্মের মৃত্যু হয়, তারপর আমার। যজ্ঞেশ্বর ছিল ভোগী, তার ভোগের সহস্র পথ ছিল খোলা। সে জন্ম থেকে জন্মান্তরে চলে গেল। কিন্তু আমার পথ ছিল উর্দ্ধগামী—উর্দ্ধের পথে সূক্ষ্ম বাধাও বিশাল হয়ে দাঁড়ায়। অগ্নিকে মূল্যদানস্বরূপ অশাস্ত্রীয় বিধান দেওয়ার ফলে অত্যাচরিত জননীর ব্যর্থ স্নেহ এসে আমার উর্দ্ধপথে বাধা দিলে। যতদিন না জননীর সঙ্গে পুত্রের মিলন হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমার গত্যন্তর নেই, অনিশ্চিতভাবে অপেক্ষা আমায় করতেই হবে। কিন্তু ছেলের সঙ্গে মায়ের মিলন হওযাও অসম্ভব কারণ, ছেলে আছে যক্ষ-লোকে, মা আছে প্রেতলোকে। দু'জনের মধ্যে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নেই। কালক্রমে এই শোকের উপশম হওয়ারও সম্ভাবনা নেই কারণ, প্রেতিনীর প্রেতত্বলাভ হয়েছে শোকেরই জন্য, আপ্রেতযোনীত্ব ওই শোক তার সমানভাবেই জাগরুক থাক্‌বে। যজ্ঞেশ্বর, আমি আজ অসহায়, গতিহীন, ক্রিয়াশূন্য অবস্থায় মহাশূন্যে সহস্র বৎসর ধরে' ভেসে বেড়াচ্ছি!

আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আচার্য্যদেব চেয়ে রইলেন। শেষে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটি লাল ফুল নরেশের হাতে দিয়ে বল্লেন, সাবধান, এইটিকে সব সময় কাছে রাখ্‌বে এবং যখনি তোমার দরকার হবে, তখনি আমায় স্মরণ কর্‌বে, আমি আসব।

নরেশের মধ্যে কেমন যেন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর্‌ছিলুম! সে মুখে কোন উত্তর না দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে ওই আচার্য্যকে। সঙ্গে

সঙ্গে আমিও। প্রণাম করে পদধূলি নিতে গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই!

নির্ম্মল নীল আকাশের কোলে তখন আধখানা চাঁদ ও অসংখ্য তারার মেলা বসেছে। আশপাশে বড় বড় অন্ধকার গাছ রাত্রির কালোকে আরও নিবিড় করে তোলে। স্তব্ধ রাত্রির অবিরাম নিশ্বাস হৃদয়ের মর্ম্মে গিয়ে কেমন যেন অজানা শঙ্কার সৃষ্টি করে।

সাত

নরেশকে ডাকলুম। বল্লুম, ঘরে চলো।

সে উঠ্‌লো না, তেমনি বসেই রইলো।

বল্লুম, ভাব্‌ছো কি ?

সে আমার দিকে চোখ তুলে দেখ্‌লে, তা'তে অশ্রুরেখা। বল্লে, ভাবছি আমি গর্গের মায়ের কথা। হাজার বৎসর ধরে' প্রেতিনী হয়ে সে পঞ্চমবর্ষীয় সন্তানের শোক এখনও ভুল্‌তে পারছে না ! ওঃ, টাকাটা কি শত্রুর কাজই না করেছে ! ওই টাকার মায়াতেই আমি আজ হাজার বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু মর্‌তে পাচ্ছি না এবং ওই টাকাকে উপলক্ষ করেই গর্গ, গর্গের মা, আচার্য্য সকলেই জড়িয়ে পড়ে আছেন। এই জন্যই শাস্ত্রকার বলেন, বিষপান করে শিব হয়েছেন নীলকণ্ঠ এবং পৃথিবীর যাবতীয় রত্নকে উদরে ধারণ করে সমুদ্র হয়েছেন নীলাম্বু। বিষ—বিষ—অর্থই বিষ !

বল্লুম, নরেশ, তুমিও যদি এই রকম পাগল হও, তা' হলে আজ সর্পাঘাত অবশ্যম্ভাবী ! যদি ভালো চাও ত ঘরে চলো। দেখ্‌ছো না, এই উঠানে কি জঙ্গল !

—চলো।

আমরা দু'জনে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় কেমন যেন ভূমিকম্পের মত হলো। খড়ের ঘর ও চালগুলো থরথর করে কেঁপে উঠলো, বড় বড় গাছগুলো আশেপাশে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগ্‌লো, হাওয়া উঠলো প্রবল বেগে, উঠানের শুক্‌নো পাতাগুলো ঝড়ের মুখে পাগল হয়ে গেল। অকস্মাৎ সে বেগকে সাম্‌লাতে না পেরে একটা প্রকাণ্ড কাল পেঁচা বিকট

চীৎকার করে’ আমাদের ঠিক্ ওপর থেকে খড়ের ছাঁচ দিয়ে ঝট্পট করে’ উঠানের ওপর রকের ধারে এসে গড়িয়ে পড়্ল, তারপর দু-একবার পা দুটো নাড়িয়ে স্থির হয়ে গেল। এ আবার কি বিভীষিকা!

রোমাঞ্চিত দেহে নরেশকে টেনে নিয়ে উঠানের ফাঁকায় লাফিয়ে পড়বো কি না ঠিক্ করতে পার্ছি না, এমন সময় কালবৈশাখীর বিদ্যুতের মত আকাশভেদী তীক্ষ্ণ একটা কর্কশ শব্দ সারা পৃথিবীকে যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ করে’ হঠাৎ থেমে গেল। শব্দটা শুন্‌লুম, কিন্তু তার মর্ম্মার্থ কিছুমাত্র গ্রহণ করতে পাল্লুম না।

ওই রকম শব্দ হলো একবার, আর একবার, তারপর আরও একবার। নরেশ ও আমি দু’জনে চতুর্দ্দিকই দেখ্ছি, কিন্তু কিছুই নজরে পড়্ছে না। এমন সময় চাঁদের আলোয় উঠানের মধ্যে এক ভয়ঙ্করী নারীমূর্ত্তি আমরা দেখ্তে পেলুম। ছোট বড় নানারূপ আগাছায় পূর্ণ উঠানের মাঝখানে কঙ্কালসার একজন প্রৌঢ়া গ্রাম্য স্ত্রীলোক—এলোচুল তার আকাশে গিয়ে উঠেছে, ঘন নীল শিরাবহুল মুখের মাঝখানে দু’টি বিস্ফারিত রক্তবর্ণ চক্ষু, অনাবৃত পাংশুবর্ণ কঙ্কালসার বক্ষের উপর লোল স্তনদ্বয়, শীর্ণ বিশাল আভরণহীন মুষ্টিবদ্ধ বাহুদ্বয় দুইদিকে প্রসারিত। ভয়ঙ্করী উন্মাদিনীর বেশে গর্গের অত্যাচরিত জননী কি মধ্য রাত্রে আমাদের সম্মুখে এইভাবেই আত্ম-প্রকাশ কর্‌লে?

চিন্তা ও ভাষার অতীত হয়ে আমরা দু’জনে পরস্পরকে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি। ওই নারীমূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

নরেশের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে’ ওই নারী তার পরুষকণ্ঠে বাংলা হিন্দি মিশ্রিত অদ্ভুত ভাষায় কি যেন জিজ্ঞাসা কল্লে।

নরেশের কানে মুখ দিয়ে বল্লুম, ও বলে কি? কিছু বুঝ্ছো?

নরেশ তার দিকে দৃষ্টি রেখে অনুচ্চকণ্ঠে উত্তর দিলে বল্লে, ঠিক্ বুঝ্ছি

না, তবে ভাষাটা খুব সম্ভব অপভ্রংশ মাগধী বলেই মনে হচ্ছে, ও যেন সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করেছে।

আমাদের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে ওই উন্মাদিনী অকস্মাৎ হেসে উঠ্‌লো। সে কি এক ভয়ানক হাসি! তার কণ্ঠের তীক্ষ্ণ তীব্র হাস্যচ্ছটা স্তব্ধ প্রকৃতিকে ভেদ করে যেন স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধদিকে উঠ্‌তে লাগ্‌লো এবং সেই ভয়াবহ প্রেতশরীরে সে যেন আর আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস ধরে রাখ্‌তে পারছে না, এমনি ধারা ভাব প্রকাশিত হলো। আতঙ্কে আমাদের সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌ল।

তার সেই হাসি থাম্‌তে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট সময় লেগেছিল। তারপর তার প্রতিধ্বনি এল বহু দূর থেকে। মনে হলো, দিগন্তের নিবিড়তম তরু তিমিরের মধ্যে ওই উন্মাদিনীর কোন এক সহচরী আছে, সে তার সঙ্গিনীর আনন্দে আনন্দিত হয়ে নিজের উল্লাসটাও ততোধিক তীব্রতায় প্রকটিত কর্‌তে লাগ্‌লো। দৃশ্যমান জগতের মধ্যে আমরা দুই বিংশ শতাব্দীর অসহায় যুবক, আমাদের চতুর্দ্দিকে নৈশ পল্লীর স্তব্ধ প্রকৃতি এবং তার মধ্যে এই অজ্ঞাত শক্তির অব্যক্ত ক্রীড়া!

আট

হাসি ও তার প্রতিধ্বনি দুটোই ক্রমে থেমে গেল। তখন ওই নারী-মূর্ত্তি নরেশের দিক্ থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকালে, তারপর এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিকট চীৎকার করে' উঠ্‌লো গর্গ, গর্গ! পরে আবার একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বল্‌তে লাগ্‌লো গর্গ, গর্গ, গর্গ! তারপর আরও যেন কি সব বল্‌তে লাগ্‌লো, ঠিক্ বুঝ্‌লুম না। পরে যা' বল্লে, তার কতক যেন বুঝি, কতক বুঝি না। তারপর আমার দিকে চেয়ে সে কি যেন বল্লে। এবার স্পষ্ট বুঝ্‌লুম সে বল্‌ছে, হ্যাঁ গো, তোমরা কেউ জান কি, যখ্ কেমন করে করে? বল্‌তে বল্‌তে সে কেঁদে ফেল্লে। বল্লে, আর কি দুনিয়ায় ছেলে নেই! একটু থেমে বল্লে, ওঃ, জীয়ন্ত মাটীতে বসিয়ে না কি তার ওপর মাটী চাপা দেওয়া হয়। এই তোমাদের শাস্তর, এই তোমাদের ধর্ম্ম! আর ওরা এই করেছে, এই করেছে, এই! হঠাৎ সে হাত দুটো যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে তীব্র-বেগে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার তীক্ষ্ণ ও কর্কশ কণ্ঠ আমাদের কানে যেন তীরের মত বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল। চীৎকার করে' সে তার ছেলেকে ডাক্‌ছে। বল্‌ছে, ওরে গর্গ, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়—ওখানে যাস্ নে, যাস্ নে!

নরেশ ও আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলুম। এ কে? এ কি জীবিতা না প্রেতিনী? এই কষ্ট কি হাজার বছর ধরেই ও সমানে ভোগ করে' আস্‌ছে?

নিমেষের মধ্যে সে পুনরায় ছুটে এসে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কল্লে। এবার যেন সে আমাদের হত্যা কর্‌তে বদ্ধপরিকর। তীর বেগে এগিয়ে

এল আমাদের দিকে। সেই সঙ্কীর্ণ রোয়াকের ওপর আমরা প্রাণভয়ে যথাসম্ভব পেছিয়ে এলুম।

তার শীর্ণ কঙ্কালসার হাত দিয়ে সে নরেশকে ধর্‌তে এলো, কিন্তু কি এক অসহ্য ব্যথায় ছিটকে পেছিয়ে গিয়ে পড়্‌লো উঠানের প্রান্তে এবং তারপর হঠাৎ যেন সেইখানেই অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু একটা তীব্র আর্ত্তনাদ তার অদৃশ্য হওয়ার পর পর্য্যন্ত সেইখানে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লো।

নরেশের হাত ধরে' টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লুম। দরজাটা বন্ধ করে মশারীর মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, কি হলো নরেশ ?

সে বল্লে, কি জানি, আমি যেন কেমন একটা স্পর্শ পেলুম আমার পায়ের ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ওই মূর্ত্তিটা ওই ভাবে ছিট্‌কে চলে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য, তারপরই আমার জামার পকেটে আচার্য্যের দেওয়া ফুলটি তেতে যেন আগুন হয়ে উঠেছে।

হাত দিয়ে আমিও সেটির উষ্ণতা অনুভব কর্‌লুম।

মশারীর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন বল্লে, যজ্ঞেশ্বর, তুমি কালই এখান থেকে চলে যেও।

—কে ?

'টর্চে'র আলো ফেল্লুম, কিন্তু কা'কেও দেখ্‌তে পেলুম না।

শূন্য থেকে উত্তর এল, আমি আচার্য্য। তারপর তিনি সেইরূপ অদৃশ্যভাবেই বল্‌তে লাগ্‌লেন। বল্লেন, দোষ যখন আমাদেরই রয়েছে, তখন আমাদের শক্তি নেই ওই দুষ্ট আত্মাকে শাসন কর্‌বার। ও যদি নিজে মুক্তিকামী না হয়, তা' হলে কোন ক্রিয়ার দ্বারাই ওকে নিবারণ করা সম্ভব নয়। তোমরা এখানে থেকে কিছুই কর্‌তে পারবে না। শুধু শুধু নিজেদের বিপন্ন করে' কোন লাভ নেই, তোমরা কালই চলে যেও।

ওই দুষ্ট আত্মা ওর নিজের মৃত্যুস্থান ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারবে না (Earth bound spirit), কাজেই অন্যত্র গিয়ে ও তোমাদের কোন অনিষ্টই করতে পারবে না। অতএব তোমরা চলে' যাও, এখানে আর এসো না। কিন্তু সাবধান—যতক্ষণ এখানে থাক্‌বে, খুবই সাবধানে থেকো, বেশী করে' যজ্ঞেশ্বর, তোমাকেই লক্ষ্য করে এ কথাগুলো আমি বল্লুম।

নয়

রাত্রে কখন যে ঘুমিয়েছি, কিছুই মনে নেই। প্রত্যুষে বিকট এক হাসির ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পরও আমার জ্ঞান আস্‌তে অনেকটা সময় লেগেছিল। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝ্‌খানেই হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে দেখি, নরেশ বিছানায় নেই।

—নরেশ! নরেশ!

কোন উত্তর নেই।

হ্যারিকেনের আলোটা তেম্‌নি জ্বল্‌ছিল! ভাল করে' চোখ চেয়ে দেখি, নরেশের মাথার বালিশের ওপর তার হাতকাটা সার্ট্‌টা পড়ে আছে। এ সময় জামা খুলে রেখে সে গেল কোথায়?

দরজাটা খোলাই ছিল। তাড়াতাড়ি লাঠি ও 'টর্চ'টা নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়্‌লুম।

আবার ডাক্‌লুম, নরেশ, নরেশ!

—হাঃ হাঃ হাঃ!

আমার চীৎকারের উত্তরে পুনরায় সেই বিকট হাসি! হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার উপক্রম হলো।

উষার ম্লান আলোয় কার যেন অস্পষ্ট ছায়া দেখ্‌লুম। প্রাঙ্গণের মাঝখানে কে যেন হাওয়ার তালে তালে পা ফেলে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে সে আমায় ইঙ্গিতে ডাক্‌লে! তার সঙ্গে যাওয়া যে কতদূর বিপজ্জনক তা' আমি স্পষ্টই বুঝ্‌লুম, কিন্তু কিছুতেই আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারলুম না। চুম্বুকের আকর্ষণে লোহা যেমন ছুটে যায়, তেম্‌নি ভাবেই আমায় যেতে হলো, অজ্ঞাত শক্তির প্রাবল্যে। আমি আজ কত দুর্ব্বল—আমি যেন সম্মোহিত।

দশ

বাড়ী থেকে বেরিয়ে সেই মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চল্‌লো। পায়ে-চলা পথের কোন চিহ্নও সেখানে নেই। বড় বড় বটগাছের ছায়ায় স্থানটি নিবিড় অন্ধকার ও উঁচু নীচু। শুক্‌নো পাতার ওপর ছোট ছোট জন্তুর চলাফেরার শব্দ, গাছের কোটর থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার তীব্র একতান শব্দে কানে যেন তালা লাগে। যাওয়ার পথে ঠিক দক্ষিণেই কোন একটা পাখীকে বোধ হয় যেন হিংস্র জন্তুতে ধরেছে—সেই পাখীটা প্রাণপণে চীৎকার করে' উঠলো! কিন্তু এ সবের দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না, সম্মুখের তরল অন্ধকার ভেদ করে যে শ্বেতকায় অনিশ্চিত ছায়া শুধু সরে যাচ্ছিল, তারই মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আমি এগিয়ে চলেছিলুম—কোথায়, জানি না!

কতক্ষণ এম্‌নিভাবে কেটেছে, কিছুই মনে নেই। হঠাৎ যেন জঙ্গলটা তরল হয়ে এল। তারপরই চেয়ে দেখি, সাম্‌নে সেই পুরাতন পুকুর। কাল বিকেলে নরেশ ও আমি দু'জনে এসে একে দেখে গেছি, এরই নাম মহীপাল দীঘি।

শ্বেতবর্ণ ছায়া কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর সে তার সরু লম্বা একখানা হাত বাড়িয়ে দূরে আমায় একটি স্থান নির্দ্দেশ করে দেখিয়ে দিলে। সেই হাত থেকে আরও অস্বাভাবিক সরু এবং অতি দীর্ঘ এক কঙ্কালের তর্জ্জনী এগিয়ে গিয়ে পুকুরের চড়ার মধ্যে যেখানে লম্বা লম্বা ঘাস হয়ে আছে, সেইখানে একটা সদ্যখনিত মাটীর দিকে দেখিয়ে দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। একা স্তব্ধ হয়ে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম!

তখনও প্রভাতের অনেক দেরী। যেটাকে আমি উষার আলো বলে সন্দেহ করেছিলুম, সেটা হলো চাঁদের কিরণ সেই সঙ্গে হয় ত সেই অজ্ঞাতের মায়াও কিছু ছিল।

পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি যে, সেখানকার সদ্য-খোঁড়া মাটীটা কেমন যেন অল্প অল্প দুল্‌ছে, মাটী যে নড়ে, তা' আমার ধারণাই ছিল না।

কৌতূহলী হয়ে সেখানে বসে' আমি বেশ করে' সেটাকে লক্ষ্য করছিলুম। হঠাৎ মনে হলো, নরেশ কোথায় ? আমি যে তারই সন্ধানে বেরিয়েছি। এই শীতের মধ্যে সে যে একলা খালি গায়ে চলে এসেছে অথচ, এখনও পর্য্যন্ত আমি তার কোন উদ্দেশই ত পাই নি।

সদ্য-খোঁড়া মাটীর দিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনটা যেন কেমন হয়ে উঠ্‌লো ; শীতের রাত্রেও আমার কপাল দিয়ে ঘাম ঝর্‌তে লাগ্‌লো। হাতের লাঠিটা দিয়ে তাড়াতাড়ি আল্‌গা মাটীগুলো ঠেলে ঠেলে অনেক সরিয়ে ফেল্‌লুম। মাটী যতই সরিয়ে দিচ্ছি, ততই যেন উন্মাদ হয়ে উঠ্‌ছি, ধমনীর রক্তস্রোত ততই যেন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে। এমনি করে খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে গর্ত্তটা বেশ বড় হয়ে উঠ্‌লো।

তারপর—তারপর, হাতে করে খানিকটা মাটী উঠিয়ে ফেলে দিলুম। আরও, আরও এবং—এ কি, এ যে মানুষের মাথা !

কি রকম করে' মনে নেই, সমস্ত মাটীটাই সরিয়ে ফেলেছিলুম। চন্দ্রালোকে, আর একবার 'টর্চে'র আলোয় বেশ ভাল করে' মুখখানা দেখ্‌লুম—বুঝ্‌তে আর একটুও বাকী রইলো না। এই-ই আমার পরমতম বন্ধু, অনন্ত সাহসী নরেশ ! বীরাসনে সে মৃত্তিকা গর্ভে বসে' আছে, আর তার সেই সুন্দর পবিত্র দেহ নিস্পন্দ, প্রাণহীন !

নরেশ, নরেশ !

—হাঃ হাঃ হাঃ !

আবার সেই বিকট হাস্যধ্বনি।

নরেশের মৃতদেহকে পুকুর পাড়ে শুইয়ে ফেলে আমি যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে' আছি, পেছন থেকে সেই গম্ভীর শান্ত কণ্ঠ আবার শুন্‌তে পেলুম, আমার নাম ধরে কে যেন ডাক্‌ছে।

আমি তখন দ্বিধাভয়ের অতীত। পেছন দিকে চেয়ে কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হলো না। তবুও বুঝ্‌লুম, আচার্য্যের পবিত্র আত্মা এই বিপদে আমায় উপদেশ দিতে এসেছেন। তিনি আমায় লক্ষ্য করে' অনেক সান্ত্বনা দিলেন। বল্লেন, এতে তোমার দুঃখের কিছুই নেই বৎস! যুগযুগান্তর ধরে জন্ম-মৃত্যুর এই রকম লুকোচুরী খেলা যে কতই দেখে আস্‌ছি! এ কিছুই নয়, তোমাদের যেমন স্থান পরিবর্ত্তন, আমাদের কাছে কায়া পরিবর্ত্তনও ঠিক্ তেম্‌নি। তারপর এ যে হবে, এ আমি জানতুমই এবং সেই জন্যই আমি তোমাদের সাবধান করেছিলুম। কিন্তু দুর্ব্বার নিয়তিকে রোধ করার শক্তি যে কারও নেই! আমার দেওয়া রক্ষাকুসুম যজ্ঞেশ্বর আপন আংরাখার মধ্যে রেখেছিল কিন্তু শীতের রাত্রেও ওর এত গরম হলো যে, তাকে খুলে ফেল্‌তে বাধ্য হলো। তারপর ও তোমাকে না জানিয়ে ফুলের কথা ভুলে গিয়ে একা বাইরে চলে' এল। পরে তুমি যেমন ভাবে এসেছো, ও-ও ঠিক তেমনি করেই মায়ার আকর্ষণে এইখানে এসে বস্‌লো কেন, তা' সে ও নিজেও জানে না! তারপর মাটী যেন আপনিই ওকে চাপা দিলে। একটু চুপ করে' আচার্য্য আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, আজ থেকে ন' শ' নিরানব্বুই বছর পূর্ব্বে এম্‌নি এক অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে কৃত্তিকা নক্ষত্রে আমরা যক্ষকরণ-যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলুম। ওই প্রেতিনীর গর্গ নামক ছেলেটিকে এইখানে এই বেদীতেই বসিয়ে মাটী চাপিয়ে দিই। নেশায় বিভোর হয়ে থাক্‌লেও পাঁচ বছরের সরল ও নিষ্পাপ শিশুর যখন প্রথম নিশ্বাস বন্ধ হয় তখন সে দু' হাত ঊর্দ্ধে তুলে

দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেই চেষ্টা করেছিল কিন্তু নূতন পট্টবস্ত্রে আগাগোড়া বাঁধা থাকায় নড়্‌তে পারে নি এবং ঠিক্ তার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই প্রহরীর আঘাতে গর্গের মাতার মৃত্যু হয়েছিল।

তিনি চুপ করলেন, বোধ হয় সেই পুরাতন স্মৃতি তাঁর মনে পড়্‌ছিল। কিছুক্ষণ পরে স্থিরকণ্ঠে আচার্য্য পুনরায় বল্লেন বৎস, তোমারও অনেক— অনেক বিপদ আমি দেখ্‌ছি, কিন্তু সে সমস্তই তুমি কাটিয়ে উঠ্‌বে, জীবনে তুমি সফল হবে।

এর পরে বিপদ আমার কম হয় নি। গ্রামবাসী ও পুলিস সবাই এক হয়ে আমাকে নিয়ে পড়্‌লো, অথচ আমার পক্ষে লড়্‌বার উপযুক্ত লোক নেই, পর্য্যাপ্ত টাকা নেই। কিন্তু সে সব কথা আমার আর মনে পড়ে না, শুধু মনে আছে সে সময়ের জনরব। লোকের বিশ্বাস, আমিই না কি নরেশকে খুন করেছি। সেদিন রাত্রের কাহিনী কেউই বিশ্বাস করে নি,— সকলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

এগার

ফাঁসী যে কেন হোল না, তা আমি নিজে ঠিক জানি না, আইনজ্ঞরা সে বিষয়টি ভালো করে বোঝাতে পারবেন, তবে আমি শুধু এইটুকুই বুঝলুম যে, আমার ওপোর দশবৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হোল'। আইনের হিসাবে দুনিয়ার মানুষগুলো বন্ধুহীন, একা। তাই অপরাধীর অপরাধে তাঁকে যথেচ্ছ শাস্তি দেওয়া হয়, ফাঁসী, দ্বীপান্তর, যা খুসি। কেউ একবার ভাবেও না যে তারই ঘরে তারই ওপোর নির্ভর করে কেউ আছে কি না, এবং শাস্তি হ'লে সেই সব নিরপরাধীদের গতি কি হবে। আমার বেলাতেও সেই অবস্থা! আমার মায়ের যে কি হোল', জেলে আসার পর থেকে আমি তার কিছুই জানি না, কেবল রাত্রিকালে 'সেলে'র গভীর অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে শ্রেণিহীন সংস্রবশূন্য কত সব অবান্তর চিন্তাই মনে আসে।

সেদিন শুয়ে শুয়ে কত কথাই ভাবছি। হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন যেন নিতান্তই উদগ্র হয়ে উঠলো। আপন মনেই বলে ফেল্লুম, ভগবান, নিরপরাধী আমার ওপোর বিনা কারণে এ তোমার কি শাস্তি প্রভু?

ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য্য হলুম। এ কি! মনের কথায় ধূয়ো ধরে কে আজ আমার জবাব দিলে? বল্লে, বিনা কারণে কোন কাজ হয় না সুরেন, বিনা কারণে কিছুই হয় না। একেবারে আমার পাশে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো কে যেন বল্লে!'

ছোট্ট ঘরের মধ্যে একা রয়েছি; মাথার ওপোর একটুকরো গবাক্ষ, তা'তে লোহার চৌপল গরাদে, সাম্নে লোহার দরজায় তালা বন্ধ, বারাণ্ডায় 'বেয়নেট' নিয়ে প্রহরী ঘুরছে, এর মধ্যে কে আবার পাশে আসবে কথা কইতে? নিদারুণ অবজ্ঞায় পাশ ফিরে শুলুম!

—তুমি আমায় চিন্‌লে না বৎস, আমি আচার্য্য।

—আচার্য্য ?

—হ্যাঁ।

একবৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়লো। বৎসরের অসহ্য দুঃখে একবারও আচার্য্যের দর্শন মেলে নি, কিন্তু আজ সেই পরিচিত পুরাতন স্বর।

কিন্তু এই আহ্বানে আমার মনে কোন চাঞ্চল্যই আসে নি। সারা বছরের অহৈতুক অত্যাচারে আমি এমনই পাষাণ হয়ে গিয়েছিলুম যে, আমার মধ্যে আশা ও বিস্ময়ের গতিবিধি আর ছিলই না; সেদিন আমি স্পষ্টই বুঝ্‌লুম যে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে ভয়ের ব্যবধান অনাদি কাল থেকে আজও পর্য্যন্ত মানব-মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে এসেছে, এক বছরের আত্মানুশীলনে আমার অন্তরের সেই সহজাত, স্বাভাবিক বিভীষিকা সম্পূর্ণ ই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। জেলখানার শক্ত বালিসে মাথা দিয়ে তেমনি ভাবেই চোখ বুজে শুয়ে রইলুম, কেবল ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব উপলব্ধি ক'রে অভ্যাসমত মুখে বল্লুম, প্রণাম!

পুনরায় সেই বাণী আমার কাণে এল। পূর্ব্বে ওঁর কথা যখন শুনেছিলুম, তখন আমার মনে আছে, উনি সংস্কৃতে বলেছিলেন, নরেশ সংস্কৃত জান্‌তো, সে ওঁর কথা বুঝে উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু এখন উনি আমার সঙ্গে বাংলায় বল্লেন বলে মনে হোল। মোটের ওপোর ভাষা বুঝতে কোন কষ্টই হলো না। তিনি বল্লেন, সুরেন, তুমি কি তোমার অদৃষ্টের জন্য বিশেষ দুঃখিত হয়েছ।

হাসি এল! এই কি ওঁর এতদিন পরের প্রশ্ন! বিনা অপরাধে দশ বৎসর কারাদণ্ড পেলে কেউ কি কখনও সুখী হয়? প্রাচীন লোকগুলোর এই কি বুদ্ধি!

কোন রকম বাচনিক উত্তর না পেয়ে তিনি যেন আমার মাথার কাছে

বস্‌লেন। একবার চোখ খুলে দেখ্‌লুম, কিছুই দেখা যায় না, যৎসামান্য আলোর রেশ লোহার রেলিংয়ের মধ্য দিয়ে আমার 'সেলে'র মেঝেয় এসে পড়েছে; বুটের নিয়মিত শব্দ করে চলমান প্রহরীর লম্বা ছায়াটি এক একবার সেই আলোর ওপোর দিয়ে আমারই সম্মুখে ধূমকেতুর মতন আসে এবং যায়।

মাথার চুলে আমার জট পড়েছে, মুখের দাড়িগুলো বিশ্রী এবং জটিল। তৈলহীন, রুক্ষ দেহের ওপোর স্নেহের স্পর্শ আমি বহুদিন পাই নি,—পরপারের মধু-কোমল হিমানীর বরাভয় আজ অনুভব করলুম আমার সেই কর্কশ চুলের মধ্যে, আমার সেই শিরাবহুল প্রকটাস্থি ললাটে। আচার্য্যদেব সমবেদনায় পরিপূর্ণ!

কোথা দিয়ে কেমন ক'রে চোখের জল পড়ে তা' আমি ভুলেই গিয়েছিলুম, আজ আমার সেই চোখ যেন উপ্‌ছে এল! হাজার বছরের ওপার থেকে কে তুমি আমার এই বন্দীশালায় সান্ত্বনার অমৃত এনে সিঞ্চন করলে প্রভু—এ কি স্বপ্ন, না বাস্তব!

আচার্য্যের স্থির কণ্ঠ আমার কাণে এলো। তিনি বল্লেন, বৎস! তোমার এই বন্ধন ক্লেশ অহেতুক নয়, বিনা কারণে তোমার এই দশ বৎসরব্যাপী নির্য্যাতনের আয়োজন হয় নি, বহুকালের সঞ্চিত পাপ আজ তোমার মধ্য দিয়েই স্খালিত হবে; শাস্তির অন্তে যখন পৃথিবীর মধ্যে তুমি পুনরায় আস্‌বে, তখন তুমি নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হবে। তোমার মধ্যে কোন রকম গ্লানি থাক্‌লে যে চল্‌বে না সুরেন! তোমার কাজ অসীম, অনন্ত!

—আমার কাজ অসীম, অনন্তব্যাপী আমার কর্ত্তব্য! কেন প্রভু! কি কাজ আমায় কর্‌তে হবে? আর কি এমন পাপই বা আমি করেছি, যার জন্যে এত বড় প্রায়শ্চিত্তের বিধান হলো দেব!

তিনি বল্লেন, পাপ তুমি একা কর নি সুরেন্দ্র, তোমার একার

প্রায়শ্চিত্ত এত কঠোর নয়! পিতৃপুরুষের পুঞ্জীভূত পাপ আজ তোমার মধ্য দিয়েই তৃপ্তি চায়, তোমার জীবনের ওপোর নৈঋতির* সমস্ত লীলাকেই যে শেষ করতে হবে সুরেন্দ্র!

বল্লুম, এই কি নীতি প্রভু? পিতৃপিতামহের পাপের শাস্তি পুত্র পৌত্রকে ভোগ করতে হবে? এ কেমন নিয়ম দেব!

তিনি বল্লেন, এ যে মর্ত্ত্যলোকের নিয়ম সুরেন, একে ত অস্বীকার কর্ত্তে পারো না। পিতৃপিতামহের দুষ্ট ব্যাধি এসে তোমার দেহকে যে কারণে আক্রমণ করে, যে কারণে তুমি পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত অর্থের অধিকারী হও, ঠিক সেই কারণেই তোমায় পূর্ব্বপুরুষের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করতে হয়, এই যে এখানকার ধারা।

এই কি ধারা?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলুম। বাইরে রাত তখন ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। মনে তখন কোনরূপ চিন্তার লেশও আমার নেই। শূন্য হৃদয় নিয়ে প্রশ্নের অতীত হয়ে নিস্পন্দ দেহে শুয়ে রইলুম। সময় জ্ঞাপক যন্ত্রের মতন প্রহরীর পদশব্দ বাইরের বারাণ্ডায় অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছিল।

* নৈঋতি=শয়তান। বৈদিক যুগের নৈঋতি, বৌদ্ধ যুগের 'মার' ও আধুনিক যুগের শয়তান একই ভাবের সূচনা করে।

আচার্য্যের হাত আমার মাথার ওপোর তখনও রয়েছে। আমি চোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে আছি। তিনি যেন অনেক আশা ক'রে আমায় বল্লেন, বৎস, এটা তুমি স্থির জেনো যে, তোমার ওপোর আমাদের সকলের মুক্তি নির্ভর করছে।

হতাশ হয়ে উত্তর দিলুম, প্রভু, রাজার নির্ম্মম কারায় যে বিনা কারণে বন্দী হয়ে পড়ে আছে, তার ওপোর কি অপরের মুক্তির কোন রকম আশা করাও সঙ্গত? নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত বন্দী আমি, আমি যে প্রাণহীন!

আচার্য্যের গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠ সেই পাষাণ কক্ষের দিকে দিকে প্রতিরণিত হোল, না সুরেন, না, তুমি মহাপ্রাণ, তুমি অপরিমেয়, তুমি চিরমুক্ত। দণ্ডধর মহামাত্য যজ্ঞেশ্বরের বংশধর তুমি, পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তোমার জন্য যুগান্তর ধরে প্রতীক্ষা কর্‌ছে, তোমার এই প্রশস্ত ললাটের ওপোর দিগ্বিজয়ীর জয়টীকা রয়েছে প্রচ্ছন্ন অবস্থায়,—তুমি ছোট নও, তুমি হীন নও, তুমি মহান্।

ধ্বনির একটা শক্তি আছে, অসহায়ের মনেও সে দাঢ্য আনে; বাহ্যতঃ তেম্‌নিভাবেই শুয়ে রইলুম বটে, কিন্তু অন্তরে আমার কেমন একটা পরিবর্ত্তন এল। আমার মানসিক ক্রিয়া যেন সতেজ হয়ে উঠ্‌লো।

আচার্য্য বল্লেন, সুরেন্দ্র! তুমি নিজের মধ্যে নিজেকে খর্ব্ব করো না। সব সময় নিজেকে সজাগ করে রাখ্‌বে। তুমি মনে করো, তোমার মধ্যে একটি কঠিন রোগ ছিল এবং এটা কারাগার নয়, এটা সেই রোগের চিকিৎসাগার। ন'বৎসর পরে তুমি রোগমুক্ত হলে বৈদ্যেরা তোমাকে

ছেড়ে দেবে এবং সেই সময় আমরা আসবো তোমাকে অভিনন্দন করে তুলে নিতে। দণ্ডধর মহামাত্য যজ্ঞেশ্বরের কুমার তুমি, তুমি মনে কর, তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে শুধু সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করবার ক্ষমতাটুকু অর্জ্জন করার জন্যই এইখানে এসেছো, এটা কারাগার নয়, এ শিক্ষাগার। এক বৎসর যাবৎ যে শিক্ষা তুমি পেয়েছ, ন' বৎসর পরে তোমার সেই শিক্ষার শেষ হবে। শিক্ষান্তে তুমি তোমার রাজত্বে ফিরে যাবে। তখন আমরা তোমায় সিংহাসনে অভিষিক্ত করে অবসর নেব। তুমি একা নও, তুমি নির্ব্বান্ধব নও, হাজার হাজার প্রাণীর মুক্তি আজ তোমার ওপোর নির্ভর কর্চ্ছে। তুমি নিঃস্ব রিক্ত নও, যে পরিমাণ ধনরত্ন আজ পার্থিব লোকের করায়ত্তে আছে, তুমি তার কোটী গুণ অর্থের অধিকারী। সারা পৃথিবীর মধ্যে যে শক্তি আছে নিহিত, যার কণামাত্রও আজ অবধি আবিষ্কৃত হয় নি, তুমি সেই শক্তির সর্ব্বময় নিয়ন্তা। হে সুরেন্দ্র, তুমি অপার, তুমি অতুলনীয়, তুমি শ্রেষ্ঠ। একটু চুপ্ করে আচার্য্য বল্লেন, দেখ্বে, দেখ্তে চাও তোমার সেই বিপুল ঐশ্বর্য্য, তবে আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় দেখিয়ে দেবো।

হায় রে, আমি যে বন্দী!

—বন্দী তোমার দেহ, দেহাতীত মন তোমার সম্পূর্ণ মুক্ত আছে, তুমি এসো!

আশ্চর্য্য! আমি অশরীরী হয়ে গেলুম! সমস্ত ভার আমার মুক্ত হয়ে গেল! যেন অত্যন্ত লঘু হয়ে আমি সেই ঘরের বায়ুস্তরে ইতস্ততঃ ভাস্তে লাগ্লুম।* আমার বোধ, আমার সংজ্ঞা সব ঠিকই রইলো, কিন্তু আমার বাধা বলে আর কিছুই রইলো না!

---

* ইংরাজিতে ইহাকে wanderings of soul বলে।

বন্দী আমি, তৎসত্ত্বেও কারাগৃহের লৌহ দ্বারের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলুম ; জেলশালার সুউচ্চ প্রাচীর ভেদ করে অন্ধকার জনপদ ও অরণ্যের ওপোর দিয়ে দিগ্দেশ পার হয়ে নিমেষ মধ্যে আচার্য্যের সঙ্গে একত্রে এসে উপস্থিত হলুম প্রকাণ্ড এক দীঘির কূলে। দীঘির একধারে নিবিড় ঘন জঙ্গল, সম্মুখে বিশাল পুষ্করিণী, মাথার ওপোর অনন্ত নীল চন্দ্রমাশূন্য আকাশ অগণ্য তারকায় সুশোভিত, মৃদুমন্দ বায়ু এই দেহহীনকে স্পর্শ করে' নির্জীব প্রাণের মধ্যে পূর্ব্বের সেই অনন্ত আশাকে আবার জাগিয়ে দিলে। তখন আমি স্পষ্ট বুঝলুম, বন্দী অবস্থায় আমার যে বৈরাগ্য এসেছিল সেটা কৃত্রিম, অসহায়ের অলীক অভিমান,—সুযোগ এবং সুবিধা পেলে সমস্ত বৈরাগ্যই লুপ্ত হয়ে দৃপ্ত যৌবন পূর্ব্বের মতই ফিরে আসে, তার সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ নিয়ে।

১৩

জলের ধারে দাঁড়িয়ে আচার্য্য বল্লেন, সুরেন্দ্র ! মনে পড়ে কিছুকাল পূর্ব্বে তুমি সদ্যমৃত নরেশের মৃতদেহ নিয়ে গভীর রাত্রে এইখানেই হতাশ হয়ে একা বসেছিলে এবং আমি এসে তোমায় সান্ত্বনা দিয়েছিলুম।

বল্লুম, পড়ে ; সে আজ চোদ্দ মাস পূর্ব্বের কথা।

আচার্য্য বল্লেন, হ্যাঁ। পূর্ব্ব সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে নরেশ এই অর্থকে উদ্ধার করে তার বংশধর তোমাকে তাই দান করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। এই জলের মধ্যেই যে সমস্ত অর্থ সঞ্চিত আছে, তার তেমন কোন স্থির প্রমাণ বা স্মৃতি না থাকৃলেও সে শুধু কেবল সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়েই ছুটে এসেছিল, তারপর এই সাগরের কূলেই তার কাল হয়। সরসীর স্থির জলে দৃষ্টিক্ষেপ করে আচার্য্য যেন অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, এসো।

তাঁর সঙ্গে চল্লুম। উপলময় ভূমিতে আমার দেহহীন চরণের কোন স্পর্শ ই আমি পাচ্ছি না, কেবল চক্ষুহীন দৃষ্টি দিয়ে এইটুকু দেখছি যে, আমি ক্রমে ক্রমে জলের ধারে এসে উপস্থিত হলুম।

জলের কূলে দাঁড়িয়ে আচার্য্য বল্লেন, হে অপ্‌দেব, তুমি পথ দাও। তারপর আরও সব কি বল্লেন। অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লুম, পুকুরের স্থির জল দু' ধারে সরে গিয়ে জলের মধ্যে ছোট এক সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হোল। মনে হোল', এ বুঝি কি এক অসম্ভব যাদুবিদ্যা !

পেছন ফিরে আমার দিকে চেয়ে আচার্য্য বল্লেন, অসম্ভব নয় সুরেন,

অসম্ভব নয়! এর নাম জলস্তম্ভন,* পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে স্তম্ভন বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল; দ্বৈপায়ন হ্রদ স্তম্ভন করে দুর্য্যোধন তার মধ্যে আত্ম-গোপন করেছিলেন, মহারাজ শতনেমি সমুদ্রকে স্তম্ভন করে তার মধ্যে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে স্থাপন করেছিলেন এবং আমাদের প্রাক্তন প্রতিবেশী মোজেস্ তাঁর যাদুদণ্ডের সাহায্যে উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্য দিয়ে মনুষ্য গমনের উপযুক্ত পথ করে নিয়েছিলেন। পূরাকালের কেউ কেউ এই সমস্ত শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন, তবে প্রচারের অভাবে তাঁদের এই আবিষ্কৃত বিদ্যা তাঁদেরই সঙ্গে লুপ্ত হয়েছিল। এখনও এ বিদ্যা আমাদের মধ্যে অনেকেই জানে!

জলের মধ্যে প্রবেশ করলুম, কিন্তু কোনরকম আর্দ্রতাই সেখানে নেই। দু'পাশের সরে যাওয়া পুকুরের জলগুলি আমাদের ওপর চাপা পড়লো, কিন্তু কোনরকম শ্বাসকষ্টই বোধ করলুম না। দেহের জন্যই বোধ হয় প্রশ্বাসের আবশ্যকতা, সেই দেহই যখন নেই, তখন আর শ্বাস-প্রশ্বাসের আবশ্যকতা কি?

জলের মধ্যে এগিয়ে চলেছি। জলের মাছের সঙ্গে আমাদের আর কোন প্রভেদই নেই। পায়ের তলায় মাটী ও নানারূপ আগাছা ঠেক্‌ছে, সাম্‌নে আমায় পথ দেখিয়ে চলেছেন হাজার বছরের প্রাচীন এক চলমান ছায়া!

পুকুরের তলায় মাটীর ওপর দাঁড়িয়ে আচার্য্য বল্লেন, অয়ি দ্যাব্যা-পৃথিবীর অন্যতমে দেবি ধরণি! তুমি পথ দাও। তারপর তিনি কি সব মন্ত্র পড়্‌লেন। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লুম, জলের তলার বালি এবং কাদা সব ধীরে ধীরে সরে গিয়ে মধ্যে এক সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হোল। আচার্য্য

* জলস্তম্ভন অর্থে জলকে তাহার স্বাভাবিক গুণ বর্জ্জিত করা। এখানে যে নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রথম দুইটি মহাভারতে এবং তৃতীয়টি Old Testamentএ পাওয়া যায়।

আমায় ডাক্‌লেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করে তার মধ্যে প্রবেশ করলুম। আমরা তখন ভূগর্ভের যাত্রী, সামনের মাটী সরে গিয়ে আমাদের পথ দেয়, পেছনের মাটী চাপা দিয়ে আমাদের আবৃত করে।

কঠিন নীরবতার মহাশূন্যকে অতিক্রম করে আমরা গিয়ে হাজির হলুম এক দূরাগত কোলাহলের মধ্যে। যেন অসংখ্য মনুষ্যের সমবেত কণ্ঠ থেকে কেমন একটা চাপা শব্দ আস্‌ছে। ধরণীর কোল থেকে এতখানি নিম্নে এখানেও মানুষের কণ্ঠ শুনে আশ্চর্য্য হলুম। মানুষ কি এ দেশেও আস্‌তে পারে না কি ?

আচার্য্য আমায় ডেকে বল্লেন, সুরেন্দ্র! এটি কারাগার।

—কারাগার—জেলখানা ? আচার্য্যদেব, আমি এইখানেই রইলুম, আর আমি একটুও যাব না।

তিনি একটু হেসে বল্লেন, এসো, ভয় নেই, এ হোল' যক্ষলোকের বন্দীশালা—এবং এই সমস্ত বন্দীদের মুক্তি কেবল তোমারই আদেশের ওপরে নির্ভর কর্‌ছে!

—আমার ওপর! স্খলিত পদে আচার্য্যের সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ সাম্‌নে দেখি ছোট একটি কালো রংয়ের গেট, ধাতু কি প্রস্তর কিছুই বুঝ্‌লুম না, তবে দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ।

দরজার সাম্‌নে এসে আচার্য্যদেব দাঁড়ালেন। বল্লুম, প্রভু! এ ঘরটি কার ?

বল্লেন, যক্ষশালা। শিবানুচর কুবের যেমন শিবের সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে রক্ষা করেন, ব্রাহ্মণকুমার গর্গও তেম্‌নি যক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়ে এইখানেই তোমার বিপুল ধনরাশি রক্ষা কর্‌ছে। এই যক্ষশালার অধিনায়ক যক্ষরাজ গর্গ। দরজাটি ভেতর থেকে খুলে গেল, সাম্‌নে এক অন্ধকার পথ এবং সেই অন্ধকারের দক্ষিণ থেকে ভেসে আস্‌ছে বিপুল কোলাহল, বন্দীদের সমবেত আর্ত্তনাদ!

১৪

আচার্য্যের সঙ্গে সম্মুখে ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছি। অনেকখানি পথ অতিবাহিত করার পর এক প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ী দেখলুম!

সেই না কি যক্ষের ভাণ্ডার!

হৃদয়ের ধ্বনি যেন অনেকখানি বেড়ে গেল! আমি যে অশরীরী হয়ে ঘুরছি, সেটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দু' হাতে বুকটাকে চেপে ধরলুম। এই কোষাগারের মধ্যে না জানি কত কি সঞ্চিত আছে! ন্যায়সঙ্গত আমি এর অধিকারী এবং যেদিন এর বাস্তব অধিকার আমার করায়ত্ত হবে, সেদিন সারা পৃথিবীতে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হবে। রক্‌ফেলার, এড্‌সেল্ ফোর্ড সেদিন আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। পৃথিবীর বড় বড় রাজন্যমণ্ডলী আমার কৃপাকণার প্রয়াসী হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌বে। আমি—আমি এই সুরেন্দ্রকুমার, এই হতভাগ্য রাজবন্দী সুরেন,—দেহহীন শরীর আমার ঘর্ম্মে যেন পরিপ্লুত।

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবেই কোষাগারের দ্বার মুক্ত হোল। ম্লান আলোয় আমার নজরে পড়্‌ল একটি সরু পথ। পথের দু' ধারে তৃণাস্তরণের ওপরে বৃহদাকার কুক্কুর বাহনে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ যক্ষ প্রহরী পাষাণমূর্ত্তিবৎ নির্ম্মম, নিশ্চল। তৃণাস্তরণের সম্মুখে আমাদের সংকীর্ণ পথের অপর প্রান্তে নিকষের নিশ্চল প্রাণহীন প্রাসাদ—শব্দহীন, রন্ধ্রহীন, এমন কি জীবনের চিহ্ন মাত্র শূন্য এই মৃত্যুপুরী কি অনাদি অনন্ত কাল ধরেই ভূগর্ভে এম্‌নি সমাহিত হয়ে আছে?

প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালুম! পাথরের দেওয়ালের ওপর আচার্য্য তাঁর করস্থাপন কল্লেন,—দেওয়ালের খানিকটা অংশ সরে গেল।

তিনি বল্লেন, এসো।

প্রবেশ কল্লুম। অল্প আলো আছে, কিন্তু আলো যে কোন্ পথে আস্ছে তার কোন স্থিরতা নেই। তারপর একটী ছোট দরজা, সেটির প্রস্থ এবং উচ্চতা দুইই নিদারুণ ছোট। দেহহীন শরীরকে কোন রকমে ছোট করে সেই রন্ধ্ররূপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ কল্লুম। এখানে অন্ধকার আরও একটু গাঢ়, কোন রকমে এগিয়ে চল্লুম, সামান্য কয়েক পা যাওয়ার পর আচার্য্য স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন, এই তোমার কোষাগারের প্রারম্ভ।

আচার্য্যের কণ্ঠস্বর সমস্ত ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্লো। মনে হল, যেন যুগান্তরের বুভুক্ষিত স্তব্ধতা এই স্বরের আলোড়নে ক্রুদ্ধ হয়ে বিকট হুঙ্কার দিলে।

ধীরে ধীরে সামনের ছোট একটি দরজা খুলে গেল, তার মধ্য থেকে মধুর গন্ধ এসে আমাদের তৃপ্ত কর্‌লে, অপূর্ব্ব শ্রুতিমধুর শব্দ আস্ছে, ম্লান আলোয় সারা ঘরখানা যেন ভিজে উঠেছে, ঘরের মধ্যে ভাস্ছে যেন কার একটা কোমল স্পর্শ। অনুপম মাধুর্য্য রসের আস্বাদনে আমার ক্ষুব্ধ বিকল পঞ্চেন্দ্রিয় মূহূর্ত্তে যেন এলায়িত হয়ে পড়লো।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আচার্য্য বল্লেন, এই তোমার কোষাগারের প্রথম ঘর, এর মধ্যে সঞ্চিত আছে পৃথিবীর যাবতীয় অনুভূতি। সভ্যতার প্রথম সোপানই এই অনুভূতি। এই অনুভূতির জন্য পার্থিব জীবের ক্ষুধা ওঠে জেগে, তারপর মানুষ তার উচ্চ বুদ্ধি দিয়ে সেই ক্ষুধার নিরাকরণ করে।

কিন্তু ঠিক মতন বুঝ্‌লুম না, মনে হোল এ আবার কি ঐশ্বর্য্য, এ অনুভূতি ত সকলেরই আছে।

মানসিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন আচার্য্য। তিনি বল্লেন, আছে, কিন্তু

মানুষের একস্তর নিম্নে যে জীব আছে, তার সঙ্গে তুলনা করলে এই হোল' মানুষের প্রথম ঐশ্বর্য্য। এই ঐশ্বর্য্য তোমার জন্যে প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত আছে। তোমার ইন্দ্রিয়গুলি সাধারণের তুলনায়—বহু গুণ শক্তিশালী। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, হতাশ হোয়ো না সুরেন, এগিয়ে এস, এর চেয়েও অনেক দামী জিনিষ তোমার কোষাগারে আছে।

যে দিক্ দিয়ে এই ঘরে প্রবেশ করেছি, তার সাম্‌নে দিকে দু'জনে এগিয়ে গেলুম। আমাদের প্রবেশ-পথের সাম্‌নাসাম্‌নি আর একটি দরজা খুলে গেল।

নব-প্রকাশিত ঘরের চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখি, বড় গোছের পাথরের ঘরখানি সোনায় সোনায় পূর্ণ। সোনার বড় বড় থান স্তরে স্তরে মেঝে থেকে আরম্ভ করে স্তূপে স্তূপে সাজান আছে। তাদের মধ্য দিয়ে এমন এক অপূর্ব্ব স্বর্ণ-লাবণ্য আস্‌ছে যে, তা'তে করে সাধারণ মানুষকে পাগল করে দেয়। ঘরের চারপাশের নীচ থেকে ওপোর পর্য্যন্ত পরিস্কৃত উজ্জ্বল হেমখণ্ডের গণনাতীত শ্রেণীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আচার্য্য আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্মিতমুখে বললেন, কেমন, তৃপ্ত হয়েছ ?

এবার আমি সত্যই আনন্দিত হয়েছিলুম। স্নেহকণ্ঠে আচার্য্য বললেন, মূর্খ! ওই অনুভূতি প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে যদি এই ঘরের জাগতিক সভ্যতারূপ প্রবেশ-পথ না থাক্‌তো, তা' হলে এই সোনার আনন্দকে তুমি উপলব্ধি করতে পারতে কি ? সুর বদলে বললেন, কিন্তু এই যত সোনা দেখছো, এই সমস্তই তোমার! যদি এই বিপুল স্বর্ণভার তুমি উত্তোলন করে পৃথিবীর ওপোর নিয়ে যেতে পারো, তা' হলে সারা ধরণীতে এমন একটা প্রকাণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে যে, তা'তে অনেক বড় বড় দেশ, বড় বড় রাজত্ব যাবে তলিয়ে। বিদ্রোহ, রক্তপাত, প্রাণীহিংসার অবধি আর থাকবে না। হয় ত এই পৃথিবী থেকে সোনার দামই

চিরতরে লুপ্ত হবে। সুরেন, এই স্বর্ণভারের গুরু দায়ীত্ব তোমায় বহন কর্ত্তে হবে, সে জন্য তৈরী হও। ক্ষণকাল চুপ করে বল্লেন, পৃথিবীতে যে পরিমাণ সোনা এখন মানুষের হাতে হাতে ঘোরে, এখানে এই একটি ঘরের মধ্যে তার শত গুণ অধিক স্বর্ণ আছে সঞ্চিত। এই স্বর্ণের অধিকারী এখন একমাত্র তুমি, এবার বলো এই বিপুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে তুমি কি করবে ?'

আমাকে নিরুত্তর দেখে তিনি বললেন, আরও শোন, এই ঘরে একত্রে যত সোনা দেখ্ছো, এর চেয়েও বহু বহু গুণ মূল্যবান জিনিষ তোমার এই কোষাগারেই সঞ্চিত আছে। তাদের তুলনায় এই স্বর্ণভার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

সামনের আর একটি দরজা খুলে গেল, স্তিমিত শ্বেত আলোকের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি আমায় ডাক্লেন, বল্লেন, দেখো।

সেই ঘরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর গাত্রে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত রক্ষণীর ওপর অসংখ্য মুক্তা ও প্রবাল সজ্জিত দেখ্লুম। প্রথমটিকে তুলে নিয়ে আচার্য্য বললেন, দেখ্ছো, এ সব চেনো কি ?

বললুম, না।

তিনি বললেন, কম লোকই এখন এ গুলিকে চিন্বে। এ গুলি হচ্ছে মুক্তা ও প্রবাল, এক কথায় এ গুলিকে সামুদ্রিক রত্ন বলা যায়। এর এক একটির মূল্য ছিল সেকালের আমলে 'লক্ষ দাম' * কিন্তু তখন এ সব পাওয়া যেত ; এখন এ সব বড় একটা মেলেই না। এই যাবতীয় মুক্তাবলী তোমার এবং এর প্রত্যেকটি মুক্তার পেছনে আছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সেকালে মূল্যবান মুক্তা ও প্রবালাদি কেনা-বেচার সময়

---

* দাম = দ্রম্য, গ্রীক দেশীয় ড্রাক্মা = সোনার টাকা।

বিক্রেতার কাছে মুক্তার ইতিবৃত্ত বলতে হোত। এখানকার প্রত্যেকটি মুক্তার কাহিনী তোমার কোষাগারে লিপিবদ্ধ আছে।

বললুম, এই অগাধ মুক্তা নিয়ে আমি কি করবো?

তিনি বললেন, সেইটিই তোমায় বাকী ন' বছর ধরে শিখ্‌তে হবে, কি করবে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে। এই ঘরের যে কোন দশটি মুক্তা বা প্রবালের দাম ওই সম্পূর্ণ স্বর্ণ-গৃহের তুলনায় অনেক বেশী।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তিনি বললেন, সুরেন্দ্র, তুমি এই মুক্তা-গৃহে এসেই আশ্চর্য্য হলে, কিন্তু এও শোনো যে, তোমার এমন জিনিষ আছে, যার তুলনায় এই সমগ্র মুক্তাগুলি একত্রেও অতি তুচ্ছ। সাম্‌নের আর একটি দ্বার মুক্ত হোল, তার মধ্য দিয়ে আচার্য্য অপর একটি গর্ভগৃহে প্রবেশ কল্লেন।

বল্লেন, এটি রত্নগৃহ। দিগন্তবিস্তৃত বালিয়াড়ীর সমগ্র বালুকণাকে এক একটি করে বেছে সারা জীবনে হয় ত অভিজ্ঞ সন্ধানী একটি রত্নই আবিষ্কার করতে পারে। অভ্রস্পর্শী পাহাড়কে ভেঙে ভেঙে সেই পাহাড়ের তলা থেকে হয় ত এমনি একটারই খোঁজ মেলে, কিন্তু সেই রত্ন তোমার এই কোষাগারে—

দেখলুম, অসংখ্য। প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে এক এক রকম আলোর মধুর রেশ আস্‌ছে। সারা ঘরখানা রত্নের আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে!

বল্‌লুম, প্রভু! এই সব রত্নের মূল্য কি?

তিনি বল্‌লেন, মূল্য? মূল্য নেই। এদের মূল্য কি দিয়ে নির্দ্ধারিত হবে? সোনা দিয়ে ত এদের দাম কষা যাবে না। তুমি হয় ত এদের নাম শুনেছো, কিন্তু সে সব পৌরাণিক নাম কি তোমরা বিশ্বাস করো! একটি নীল বর্ণের রত্নকে হাতে নিয়ে বল্‌লেন, এটির নাম নীলকান্ত মণি, ওই যে পাশে দেখছো, ওর নাম চন্দ্রকান্ত মণি, ওধারেরটির নাম হোল'

অয়স্কান্ত মণি! এদের প্রত্যেকের অসীম গুণ আছে। নীলকান্ত মণি কণ্ঠে ধারণ কর্লে মানুষ ব্যাধিরহিত হয়, চন্দ্রকান্ত মণিতে মনুষ্য দেহের চন্দ্রকান্তি কোনদিন ম্লান হয় না, অয়স্কান্ত মণি যে ধারণ করে, তার সকল বাসনা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির পূরণ হয়, অয়স্কান্ত মণি হোল' কল্পতরুর বীজ।

ক্ষণকাল চুপ করে হাস্‌তে হাস্‌তে আচার্য্য বল্‌লেন, কিন্তু সুরেন্দ্র, এতে তোমার আশ্চর্য্য হলে ত চল্‌বে না, এর থেকেও বহু বহু মূল্যবান রত্ন তোমার এই কোষাগারেই আছে, যার বিনিময়ে এই রকম সহস্র রত্নগৃহও তুচ্ছ করে ফেলে দেওয়া যায়।

—সে কি প্রভু ?

—এসো।

সাম্‌নের অপর এক দরজা গেল খুলে ! সেই ঘরের মধ্য থেকে উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি বিচ্ছুরিত হয়ে আস্‌ছিল। সেই স্বর্ণের রেণুতে আমরা দু'জনেই স্বর্ণময় হয়ে গেলুম।

তিনি বল্‌লেন, এর নাম মণিকক্ষ !

ঘরটি আগাগোড়া সোনা দিয়ে তৈরী, ঘরের মাঝখানে এক সোনার সিংহাসন, সেই সিংহাসনের ওপোর এক প্রকাণ্ড সোণার পদ্ম, সেই পদ্মের মাঝখানে একখানি বড় হীরকখণ্ড।

সেই হীরকের সাম্‌নে গিয়ে আচার্য্যদেব নতজানু হয়ে বস্‌লেন, আমিও তাঁর পাশে গিয়ে বস্‌লুম। সম্ভ্রম ও সঙ্কোচের সহিত তিনি আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, সুরেন্দ্র, চেয়ে দেখ এরই নাম স্পর্শমণি, যজ্ঞেশ্বরের বহু পূর্ব্বে এই স্পর্শমণিকে তার পিতৃপুরুষ সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু রাখ্‌তে পারেন নি, জীবিত অবস্থায় যজ্ঞেশ্বর এই রত্নকে কোনদিন দেখেও নি, তার মৃত্যুর বহু পরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যক্ষরাজ একে সংগ্রহ করে এইখানে এনে সঞ্চয় করে রেখেছে।

অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি, তিনি বল্‌লেন, এর ইতিবৃত্ত শুন্‌বে। এটি হোল' পার্থিব শক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। গন্ধর্ব্বরাজ শূরসেন যখন দেখ্‌লেন যে, সভ্য জগতের উন্নতির মূলে আছে একমাত্র সোনা, তখন তিনি সেই সোনা তৈরী করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। বহু বর্ষব্যাপী পরিশ্রম ও গবেষণার পরে তিনি এই স্পর্শমণিকে তৈরী করতে সমর্থ হলেন। এর এমনই গুণ যে, যে-কোন ধাতুতে এই মণির স্পর্শ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধাতু সেই পরিমাণ স্ুবর্ণে পরিণত হবে, এবং সেই সুবর্ণের সহিত খনিজ সুবর্ণের কোন রকম প্রভেদই থাকবে না।* যখন এই মণিটী সম্পূর্ণ হোল', তখন তিনি বৃদ্ধ। তাঁর তরবারির দ্বারা মণিটি স্পর্শ করতেই তরবারি সোণায় পরিণত হোল'। আনন্দে তিনি সেইখানেই দেহত্যাগ কল্লেন!

—আশ্চর্য্য! দেহত্যাগ কল্লেন।

—হ্যাঁ, দেহত্যাগ কল্লেন; তারপর এই মণি নিয়ে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ চল্‌তে লাগ্‌লো। শেষে গন্ধর্ব্বদের হাত থেকে এই মণি এল লিচ্ছবীদের হাতে। লিচ্ছবীরাজ বজ্রঘোষ ছিলেন তোমারই পূর্ব্বপুরুষ। যজ্ঞেশ্বরের দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি এই মণিটি জয় কল্লেন, রাখ্‌তে পারলেন না, বহু হাত ঘুরে ঘুরে এই মণি এল ষোড়শ শতাব্দীর সনাতন গোস্বামীর কাছে, বৃন্দাবনে। 'ভক্তমাল' নামক গ্রন্থে তার বিবরণ আছে। সনাতন এই মণিকে তুচ্ছ করে তাঁর জীবন নামক শিষ্যকে এটি দান করেছিলেন; সেই শিষ্য একে যমুনার জলে নিক্ষেপ করেন। সম্রাট আকবর যমুনার জলে লোহার বড় বড়

* বহুদিন যাবৎ জার্ম্মানী সোনা তৈরী করার জন্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত সফল হতে পারে নি।

শৃঙ্খল ফেলে পরীক্ষা করেছিলেন; তাঁর শৃঙ্খলগুলির মধ্যে একটি শেকল সোনায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তা' হলেও আকবর তার সন্ধান পান নি, শেষে যক্ষরাজ গর্গ এই মণিকে সন্ধান করে তোমার কোষাগারে এনে সাজিয়ে রেখেছে; কারণ, এ মণি তোমার পূর্ব্বপুরুষ বজ্রঘোষের সম্পত্তি এবং শুন্‌লে আরও আশ্চর্য্য হবে, এই লিচ্ছবীরাজ বজ্রঘোষই হলেন পূর্ব্বজন্মের গন্ধর্ব্বাধিপতি শূরসেন। শূরসেনের পুত্র চিত্রসেনই পরবর্ত্তীকালে তোমার পূর্ব্বপুরুষ যজ্ঞেশ্বর রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছি। মনে আমার অসীম শূন্যতা, চিন্তার অতীত অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছি। আচার্য্যদেব গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, ধারা, সুরেন্দ্র, ধারা। ধারাকে বাদ দিয়ে কেউ যেতে পারে না, অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগতের মধ্যে এম্‌নি এক সূক্ষ্ম তন্তু সকলেরই অলক্ষ্য পথে চির বিরাজমান, পিতৃপিতামহ এসে পুত্র পৌত্রের রূপ নিয়ে জন্মাচ্ছে—সহস্র বার সহস্র রূপ নিয়ে একই আত্মার বারবার অভিযান চলেছে একই পৃথিবীতে। এ ছাড়া, তার গতি আছে অনেক, একটা গ্রহের সমগ্র লীলা যখন শেষ হয়, তখন তা'কে যেতে হয় তারই উপগ্রহে, এমনি করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, সূর্য্য থেকে সূর্য্যান্তরে, এইরূপেই লক্ষ লক্ষ সৌর জগতের মধ্যে একই আত্মাকে চিরদিন ভ্রাম্যমান হয়েই থাকতে হয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বল্লেন, কিন্তু এটা মনে রেখো সুরেন, মণি গৃহের চাইতেও বহুগুণ মূল্যবান ঘর তোমার আছে।

বল্লুম, এবার যে আমার কল্পনারও বাইরে যাচ্ছে দেব।

সাম্‌নের একটা দরজা খুলে গেল। তিনি বল্লেন, এসো।

অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত এক শ্বেত প্রস্তরের কক্ষ। কক্ষের

মধ্যস্থলে দুগ্ধধবল, পাতময়, ক্ষুরধার প্রস্তর-চক্রের আণির ওপোর এক জ্বলন্ত অগ্নিকণা,—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই আচার্য্যদেব সেই জ্বলন্ত অগ্নিকণাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। আমিও আচার্য্যকে অনুসরণ করলুম।

তিনি বল্‌লেন, এই মণির নাম শুনেছ কি, এর নাম সূর্য্যকান্ত মণি। নিখিল বিশ্বের সমগ্র শক্তি এই মণির মধ্যেই নিহিত আছে। এই মণির তেজোরাশির কণামাত্র গ্রহণ করে আমাদের সূর্য্যের সৃষ্টি, বিশ্বের যাবতীয় মাধ্যাকর্ষণ এই মণির অনন্ত ক্ষমতার এক ক্ষুদ্র বিন্দু। তোমাদের পৌরাণিক স্যমন্তক মণি' এরই প্রভায় প্রভান্বিত, তোমাদের প্রতিবাসী ইরাণগণ যে অগ্নির উপাসনা করেন, সে অগ্নি আর কিছুই নয়, এই সূর্য্যকান্ত মণির প্রতীকমাত্র। তিনি আমায় গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে বল্লেন, সুরেন্দ্র, তুমি মনে রেখো, তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। কিন্তু সাবধান —এই সীমাহীন ঐশ্বর্য্যকে কোনদিন ক্ষুণ্ণ কোরো না, তুমি তোমার নিজের মর্য্যাদা করতে শেখো।

সূর্য্যকান্তের দীপ্ত তেজ আমার সহন-ক্ষমতারও অধিক! ওই মণির উগ্র আলোয় যখন নিজেকে বিব্রত বলে মনে করছি, তখন আচার্য্যদেব আমায় দক্ষিণ অনামিকার দ্বারা স্পর্শ কল্লেন। বল্লেন, ভয় নেই, এর চেয়েও বহু বহু গুণ মূল্যবান জিনিষ তোমার কোষাগারে বর্ত্তমান, যার তুলনায় সমগ্র সক্রিয় জগৎ একেবারেই অর্থহীন।

কণ্ঠে আমার স্বর নেই, শূন্য দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

তিনি বল্লেন, এসো।

সাম্‌নের এক বিশাল দ্বার মুক্ত হোল। আচার্য্যের সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ করে দেখ্‌লুম—এক প্রকাণ্ড বন্ধনহীন স্থান, প্রাচীরহীন কক্ষ,

ছাতের কোন চিহ্ন নেই, আলোর কোন আধার নেই অথচ, আলোয় পূর্ণ সেই ব্যাপ্তি; প্রকোষ্ঠের তল নেই অথচ, আচার্য্য এবং আমি দু'জনেই সেই হর্ম্ম্যতলে দণ্ডায়মান। বিশাল, বিরাট, শূন্য, প্রকোষ্ঠের মধ্যে আদ্যন্তহীন প্রণবের স্থির হুঙ্কার প্রতিরণিয়মান!

স্তিমিতনয়ন আচার্য্যদেব প্রণামটুকুও বিস্মৃত হয়ে নির্ব্বাক-নিস্পন্দে শুধুই দাঁড়িয়ে রইলেন।

১৮

অন্য পথ দিয়ে দু'জনেই বেরিয়ে এলুম। আচার্য্য বল্‌লেন, সুরেন্দ্র, এই সপ্তলোক দর্শন তোমার সফল হবে কি ?

বল্‌লুম, সপ্তলোক ? সাতটি ঘরের কি যেন সাতটি নাম আপনি বল্‌লেন না ?

মৃদু হেসে তিনি বল্‌লেন, মনে কর ভূলোক থেকে সুরু করে সত্যলোক পর্য্যন্ত তোমার গতি এখন হোল। কেন, সে কথা মনে কর্‌তে কি তোমার কোন আপত্তি আছে ?

উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই এক প্রকাণ্ড কোলাহল শ্রুতিগোচর হোল'। বল্‌লুম, প্রভু ! এ কিসের আর্ত্তনাদ ?

—এ যক্ষরাজের বন্দীশালা, আচার্য্যের উত্তর হোল'।

একটা প্রাচীরের ধারে এসে দু'জনে দাঁড়ালুম। প্রাচীরের খানিকটা স্থান মুক্ত হোল'। দূষিত উত্তপ্ত বাতাস সেই দ্বারপথে নির্গত হোল'। তিনি সেই পথের মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। আমি তাঁর অনুগমন কল্লু'ম।

হিংসা, ক্রোধ ও লোভের অনুর্ব্বরতায় পূর্ণ সেই প্রকাণ্ড কারাগার। আমাদেরই মতন অসংখ্য মানুষ—দেহ আছে বলেই মনে হোল' তারা অনেকে মিলে একত্র হয়ে একে অপরের ওপোর চেপে, একে অপরকে পরাজিত করে, পরস্পর পরস্পরকে রক্তাক্ত বিক্ষত করে তুল্‌ছে। সেই সঙ্গে এমন বিকট আর্ত্তনাদ ছাড়্‌ছে যে, তা'তে সাধারণের অন্তরাত্মাও ভয়ে শুকিয়ে যায়।

বল্লুম, আচার্য্যদেব, এদের এভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে কেন ?

তিনি বল্লেন, কারণ আছে। এরা সকলেই লোভ ক'রে যক্ষাগারের

সন্ধান নিয়ে এইখানে এসেছিল এই রত্নাদি অপহরণ করতে। যক্ষরাজ এদের প্রত্যেককে ধরে এইখানে আটক করে রেখেছেন।

—কেন, আটক করে রাখার উদ্দেশ্য ?

তিনি বল্লেন, উদ্দেশ্য ? উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এরা যেন ভবিষ্যতে কোন রকম বাধা না জন্মাতে পারে। পৃথিবীর লোকের কাছে অর্থের সন্ধান এতই মুগ্ধকর যে, তারা জন্মান্তরেও অর্থকে ভুল্‌তে পারে না। এই যক্ষাগারের সন্ধান যে একজন্মে পেয়েছে, সে প্রতি জন্মেই এই ভাণ্ডারের উদ্দেশে আস্‌বে। যক্ষরাজ গর্গ তার গচ্ছিত ঐশ্বর্য্যের নিরাপত্তার জন্য যে কোন কালে যে কেউ একে আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করেছে, তাকেই বন্দী ক'রে রেখেছে। লোভই এদের বন্ধনের একমাত্র কারণ—যে ছ' গাছা সূতোকে পাকিয়ে এই পৃথিবীতে বন্ধনরজ্জুর সৃষ্টি হয়, সেই রজ্জুর প্রথম তন্তুই হচ্ছে লোভ।

বল্লুম, গুরুদেব, গর্গের নাম ত বহুকাল ধরেই শুনে আস্‌ছি, কিন্তু তা'কে ত চাক্ষুষ আমি এত দিনেও দেখ্‌লুম না—

কিন্তু আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আর হোল' না। সমস্ত যক্ষপুরীকে কে যেন দু' হাতে ধরে নাড়া দিতে লাগ্‌লো। এ যেন যক্ষপুরীর ভূমিকম্প !

আচার্য্যদেব চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লেন। বিক্ষুব্ধ বিত্রস্ত পুরীর সমস্ত অধিবাসীরা বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইতস্ততঃ ছুটতে লাগ্‌লো। কারাগৃহের মধ্যে এক বিকটাকার হাস্যের রোল উঠ্‌লো, সেই সমবেত বন্দী-সঙ্ঘের উল্লসিত কলরোলে যক্ষপুরীর পাষাণ ভিত্তিও কম্পিত হয়ে উঠ্‌লো। আগুনের লেলিহান শিখা তার রক্তলোল রসনার সাহায্যে সমস্ত পুরীকে গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আস্‌ছে!

মুহূর্ত্তের মধ্যে আচার্য্যদেব নিজেকে সংযত করে নিলেন। ক্ষণকালের জন্য চোখ বুজলেন, তারপর আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্লেন, মহান্ বিপদ, যক্ষরাজ গর্গ আজ জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে!

—কেন?

আচার্য্য বল্লেন ,চলো, আমি যাব, যদি তাকে সাহায্য করতে পারি।

এ কি অগ্নিবৃষ্টি! সূচ্যগ্র আগুনের এক একটি তীব্র শিখা কোন্ অজ্ঞাত লোক থেকে এক একবার যক্ষপুরীর মধ্যে এসে প্রবেশ করছে! সেই শিখার বিদ্যুৎ-তেজে সকলকে আপন আপন কক্ষচ্যুত ক'রে আবার কোন্ মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। দিগন্তদীর্ণি বিদ্যুতের ন্যায় আগুনের শিখাগুলি একের পর এক, শ্রেণীর পর শ্রেণী প্লাবনের তরঙ্গের ন্যায় জ্বালাময়ী শিখা নিয়ে নিরন্তর আস্‌ছে সেই যক্ষলোকে, ছেদভেদহীন বিপদের ঘনায়িত কুজ্ঝটি!

আচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষপুর থেকে বেরিয়ে এলুম। মহাশূন্যে আবার করে নিজেদের বিস্তার করে দিলুম। কত শত নদ নদী অতিক্রম করে মানস রথে হোল আমাদের প্রয়াণ। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জ্ঞানশূন্য হয়ে উপনীত হলুম এক প্রকাণ্ড অরণ্যের ধারে।

বিশাল এক অশ্বত্থের তলায় বহুলোক একত্রিত হয়েছে। তারা শূন্যের ওপর নাচ্ছে, তারা খল্‌খল্ করে হাস্‌ছে, তারা মর্ম্মন্তুদ চীৎকারে সমস্ত আকাশটাকে ফাটিয়ে ফেল্‌ছে। তারা যেন অন্তরীক্ষের কক্ষ থেকে জ্বলন্ত নক্ষত্রকে উপ্‌ড়ে এনে পৃথিবীর বুকের ওপোর বহু খণ্ডে ভাঙ্‌ছে। তারা উন্মাদ—তারা দুর্ম্মদ!

সভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লুম, প্রভু, এ কি, এ কোথায় এসে পড়লুম!

আমার দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন, এটি মশান! বহুকাল ধরে অসংখ্য পাপীকে এই মশানে এনে অকথ্য যন্ত্রণায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। যুগান্তরের অগণিত অতৃপ্ত আত্মা এই মশানের আশেপাশে তাদের অত্যাচরিত জীবনের নিস্ফল রোষে এম্‌নি পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ বড় ভয়ানক স্থান, এ মশান।

সেই মশানের এক কোণে প্রকাণ্ড আগুন জ্বল্‌ছে। সেই আগুনের সাম্‌নে এক ত্রিশূল পোঁতা। ত্রিশূলের গলায় আভূমিস্পর্শী জবার মালা এবং রক্তের জমাট্ চাপ্। অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড যূপকাষ্ঠ। সেই যূপের ধারে তিনটি ছাগ, তিনটি মহিষ এবং একটী ব্রাহ্মণ কুমার ছিন্নশির হয়ে পড়ে আছে। রক্তে সমস্ত স্থানটা ভীষণ হয়ে উঠেছে।

—এ কি, কারা এরা?

অলক্ষ্যপথে আমরা গিয়ে তাদেরই মাথার ওপোর ভাসতে লাগ্‌লুম। আচার্য্য বল্লেন, এরা মানুষ, পাশে ওই যে লোকটি শুষ্ক মুখে বসে আছে, ওটি যজমান, আর যিনি যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন, উনি কাপালিক!

—এদের উদ্দেশ্য?

—এরা তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যক্ষরাজ গর্গকে তার যক্ষশালা থেকে আকর্ষণ ক'রে এইখানে এনে তা'কে অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করে ওই বিপুল

ঐশ্বর্য্যের অধিকার চায়। এদেরই মন্ত্রবল বিদ্যুতের রূপ নিয়ে যক্ষপুরে ভূমিকম্পের সূচনা করেছিল।

একটা ছায়া আমার সাম্‌নে এসে পড়লো। তীব্র দৃপ্তস্বরে সেই ছায়ার কণ্ঠ ধ্বনিত হোল। সে বল্লে, কাপালিক, তুমি নিবৃত্ত হও।

কাপালিক তার আসনের ওপোর উঠে দাঁড়ালো। সম্মুখের প্রজ্জ্বলিত হোমানলের লেলিহান শিখায় তার আসনটি এবার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলুম—কৃমিময় গলিত এক শব, তার মুখের মাংসগুলো পচে পচে খুলে পড়্‌ছে, পাঁজরার হাড়গুলো কতক বেরিয়ে এসেছে, কতক বা পচা মাংসের আবরণে তখনও ঢাকা আছে। সেই শবদেহ উলঙ্গ। তার ডান পায়ের হাঁটু থেকে নিম্নের বাকী অংশটুকু নেই। হয় ত কোন শবভুক্ জন্তু সেই অংশটাকে টেনে নিয়ে গেছে। কাপালিক বুকের ওপোর পা দিয়ে উঠে দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের চাপে শবের বুকের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে খুলে এল, সঙ্গে সঙ্গে কালো রঙের জলীয় দুর্গন্ধ একটু স্রাব। কিন্তু আশ্চর্য্য, শবের কঙ্কাল-মুখে সে কি এক খলখল অট্টহাস্য! সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত্রি। দিগন্তের কোলে ছিল অশেষ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে হোমানলের লাল শিখায় রক্তচক্ষু, ব্যেপমান কাপালিককে হিংস্র অমানুষ করে তুলেছিল। জুহু মুখের * মন্ত্রপুতঃ ঘৃত নিয়ে তিনি স্বাহা-স্বধা-বষট্‌কার যোগে অগ্নিতে অর্পণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সম্মুখের ছায়া সেই প্রত্যেক আহুতির সঙ্গে সঙ্গে অতি করুণ আর্ত্তনাদ ক'রে অল্পে অল্পে কাপালিকের কাছে আস্‌তে লাগলো। এদিকে সারা মশান জুড়ে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী প্রেতাত্মার তাণ্ডব নর্ত্তন চল্‌ছে। অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থায় আমি তখন আচার্য্যের পার্শ্বে শূন্যপথে দোলায়মান।

* আহুতি দিবার জন্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতা

ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বরে পুনরায় আমার সম্বিৎ ফিরে এল। চেয়ে দেখি,—ব্রাহ্মণকুলতিলক ছায়ারূপী আচার্য্যদেব বিপন্ন ব্যেপমান গর্গের মাথার ওপোর গিয়ে ভাসছেন এবং অনুষ্টুপ ছন্দে ত্রিস্বর সমন্বিত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ কর্‌ছেন—

অভিব্লগ্যা চিদদ্রিবঃ শীর্ষ্যা যাতুমতীনাং।
ছিংধি বটুরিনা পদা মহাবটুরিনা পদা॥
আবাসাং মঘবঞ্জহি শর্ধো যাতুমতীনাং।
বৈলস্থানকে অর্মকে মহাবৈলস্থে অর্মকে॥
যাসাং তিস্রঃ পংচাশতোঽভিব্লংগৈরপাবপঃ।
তৎসু তে মনায়তি তকৎসুতে মনায়তি॥

আচার্য্যের মন্ত্র যেন দিগন্ত থেকে প্রতিরণিত হয়ে সমস্ত আকাশকে প্লাবিত কর্‌লে, তারও চেয়ে উচ্চতর কণ্ঠে উঠ্‌ছে কাপালিকের স্বাহা ধ্বনি এবং অর্দ্ধমৃতপ্রায় ছায়ারূপী যক্ষ যেন ক্রমে ক্রমে অগ্নিকুণ্ডের ওপোরে এসে পড়্‌ছে। শেষ আহুতির সঙ্গে সঙ্গেই গর্গের যক্ষলীলা সেই অগ্নিকুণ্ডে সমাপ্ত হবে এবং কাপালিক হবে ওই বিপুল ধনরাশির অধিপতি।

বক্ষের উপর যুক্তকর স্থাপন ক'রে আচার্য্যদেব ঊর্দ্ধনেত্র হয়ে গায়ত্রী ছন্দে পাঠ কল্লেন—

'পিশংগভৃষ্টিমংভৃণং পিশাচিমিংদ্র সং মৃণ।
সর্বং রক্ষো নি বর্হয়॥ *

* এই ঋক্‌গুলি ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৩৩ সূক্ত হইতে গৃহীত। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি বিঘ্নকারী রাক্ষস নিবারণের জন্য ইন্দ্রের নিকট এই সূক্ত দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা সেই রাক্ষসদের নিবারণ করিয়া ঋষিকে বিপন্মুক্ত করিয়াছিলেন, এইরূপ আখ্যান সায়নাচার্য্যের ভাষ্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

সমস্ত আকাশ কম্পিত করে' বজ্রের তীব্র গর্জ্জন ধ্বনিত হোল। বিদ্যুতের বহ্নিপ্লাবনে সারা যজ্ঞকুণ্ডের সমস্ত মাটী যেন ধ্বস্ত ছিন্ন হয়ে গেল।

বজ্রনির্ঘোষ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুমূর্ষু'র শেষ চীৎকার হোল, হা—হা—হা!

অঙ্গারের দেহ নিয়ে হোমকুণ্ডের ওপোর আছাড় খেয়ে পড়ল ওই কাপালিক। তার পাশেই পড়ে আছে সেই লোভী যজমান, প্রচণ্ড বিকট তার মুখভঙ্গী। সমস্ত মশান প্রেতশূন্য। তখনও পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষের অনেকগুলি শিখাই ছিল প্রকট।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আচার্য্য বল্লেন, কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্যের জয়! তারপর আমার দিকে ফিরে বল্লেন, যাও, ন' বৎসর যাবৎ তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর।

তিনি অন্তর্হিত হলেন।

জেলখানার শক্ত বালিসে মাথা দিয়ে আমার দেহখানি অকাতরে নিদ্রিত। দূর থেকে দেখ্‌তে বড় মন্দ লাগ্‌ছিল না। একটা মশা আমার মুখে বসেছে, কিন্তু দেহ আমার নির্ব্বিকার—শূন্য থেকে আমাকেই আমি কেমন দেখ্‌ছি।

ম্লান হয়ে ধীরে ধীরে দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লুম। দেহটা যেন একটু সজাগ হলো।

ন' বৎসর—এখন ন' বৎসর!

১৭

সুদীর্ঘ দশ বছর পরে আজ মুক্তি পেয়েছি। দশ বছরের জেলের কয়েদীকে যখন ওরা মুক্তি দিলে, তখন যতটা আনন্দ তার পাওয়া উচিত, তার সবটাই কি সে পেয়েছিল ?

এ আমার নতুন এক অভিজ্ঞতা। প্রথম যেদিন জেলের হুকুম নিয়ে কারাগারে এসে প্রবেশ করি, সেদিন আমার যতটা কষ্ট হয়েছিল, আজ যেন তার চেয়েও অধিক কষ্ট আমার বোধ হ'ল। যাবই বা কোথায়, আর কর্‌বই বা কি ?

দুনিয়ার মধ্যে যে ছিল আমার আপন, সে আর আজ নেই ; যারা ছিল পর, তারা আজ একেবারেই অচেনা হয়ে গেছে। বেঁচে থাকার উপযুক্ত কোন উপকরণই আমার হাতের কাছে নেই, বেঁচে থাকার কোন আবশ্যকতাও আমি আর বোধ করতে পার্‌ছি না, কিন্তু—

গত দশ বছরের কথা আমার একে একে সবই মনে পড়লো। দিনাজপুর টাউন থেকে কারাবরণ করে ভারতের অনেকগুলো বিভিন্ন কারাগার ঘুরে ঘুরে দীর্ঘ দশ বছর কাটিয়ে আজ সকালে আবার দিনাজপুরেই ওরা আমায় ছেড়ে দিয়ে গেছে। শুষ্ক রুক্ষ দেহ নিয়ে আশ্রয়হীন আমি সুরেন্দ্রনাথ দিনাজপুর রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বিচারালয়ের মাঠে এসে বস্‌লুম।

পৃথিবীতে আজ আমার কিছু নেই, কেউ নেই !

কিন্তু কেউ কি নেই ? আছে, আছে আমার বিরাট ইতিহাস। আমি জানি, আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে। এক প্রাচীন জলাশয়ের নীচে

এই দিনাজপুরেই আছে আমার অগাধ অর্থ ; হাওয়ার মধ্যে ভেসে বেড়ায় এমন অনেক প্রাণী আছে—যারা আমার আপন, যারা সময় মত আমার কাছে আসে, উপদেশ দেয়, দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা ও আশা দিয়ে যারা আমায় বাঁচিয়ে রাখে, যারা আমায় সব সময় সকলের অলক্ষ্যে দেখতে থাকে, অথচ ভদ্র সমাজ যাদের কথা একেবারেই বিশ্বাস করে না। অশরীরী আত্মা—প্রেতাত্মা—আমার বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ আছেন আমার সহায়।

কিন্তু এঁরা যার সহায়, তার আবার দুর্গতি কেন? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও আমি আজ পথের কাঙাল কেন? আমার মন এত দুর্জ্জ্েয় কেন? নিজেকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে আমার মন কাঁদে একান্ত দারিদ্র্যের জন্য, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে আমি কিন্তু একেবারেই শান্তি পাই না, অথচ মধ্যবিত্তকে এমনই ঘৃণা করি যে, আমার অতি বড় শত্রুকেও মধ্যতার গ্লানির মধ্যে দেখতে আমার দয়া হয়। তাই আমার অন্তর্য্যামীকে ডেকে আমি আগে আগে বল্‌তুম, হে আমার সর্ব্বশক্তিমান, চিরাচরিতের বাঁধা পথ থেকে আমায় মুক্তি দিও, গতানুগতিকতার দারিদ্র্য যেন আমাকে না স্পর্শ করে।

একটি লোক আস্‌ছে। মাঠের ওপোর দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে আস্‌ছে আমারই দিকে। লোকটাকে দেখলে যেন চেনা বলে মনে হয়, ওর পায়ের চলন যেন আমারই মত,—দিনের আলোয় মাঠের ওপোর ঐ পথিক যদি একটার পর একটা করে পা ফেলে এধারে না আসতো, তা' হলে আমার স্থির মনে হোত ও আমার কল্পনার বিকার, কিন্তু একে ত আর সে কথা বলা যায় না। এ একটা জলজ্যান্ত মানুষ।

গাছের তলায় আমার পাশেই সে এসে দাঁড়ালো। চেনা লোকের দৃষ্টি নিয়ে সে বল্‌লে, তুমি—তুমি এখানে?

বল্লুম, হাঁ, তা আপনি আমায় চেনেন নাকি ?

সে বল্লে, হ্যাঁ চিনি বৈকি, তবে তোমার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাক্‌লেও আমি অনেকদিন তোমার কথা ভেবেছি, এতদিন পরে আজ তোমাকে দেখে তাই বড় আনন্দ হোল'।

—আমার কথা ভেবেছেন,—আপনি কে আমায় ঠিক করে বলুন ত ? আর আমিই বা কে, তাও আপনি বলুন দেখি, হয় ত আপনি আমায় ভুল করেছেন।

মৃদু মধুর হেসে ঐ বৃদ্ধ পথিক আমায় উত্তর দিলে, বল্লে, বয়েস আমার যতই হোক, ভুল আমার কখনও হয় না। তুমি সুরেন, তোমাকে আমি জানি। তোমাকে আমি বহুদিন বহুবার উপলব্ধি করেছি, বহুরূপে আমি তোমায় দেখেছি, তবে প্রত্যক্ষ তোমায় কখনও করি নি বটে, কিন্তু আজ তাই হোল'।

বড় দুঃখেও হাসি এল ! নিঃসঙ্গ মাঠের মধ্যে যদি বা মধ্যাহ্নের একাকীত্বকে লঘু করার জন্য দশবৎসর পরে আমি একজন মাত্র মানুষের সাক্ষাৎ পেলুম, তা সেও এক অদ্ভুত লোক, পাগল কি যাদুকর কে জানে ! কিন্তু সে যাই হোক্, সাধারণ সুখ দুঃখের কথা বলার বাইরে সে। সে আমায় কখনও দেখে নি, অথচ উপলব্ধি করেছে এবং বহুদিন বহুবার বহুরূপে সে আমায় অনুভব করেছে,—বড় দুঃখেও হাসি এল।

বৃদ্ধ আমার পাশেই এসে বস্‌লো। কাঁধে তার ছোট একটি পুঁটলী ছিল লাঠির আগায় বাঁধা,—সেটিকে সে নামিয়ে রেখে লাঠিটা পাশে ফেলে যেন অনেক কষ্টে পায়ের বেদনাকে প্রশমিত করে আমার পাশেই ধপ করে' বসে পড়্‌লো। তারপর আমার মুখের দিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরম আগ্রহে আমার একখানি হাত সে নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিলে।

বুড়ো যেন আপন-মনেই বলে চল্লো, বল্‌লে, জীবনের পথে তুমি অনেক দূর এগিয়ে গেছ সুরেন, অনেক দূর। তোমার সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে রেখে তুমি যেমন চলেছ, আমরা কিন্তু পূর্ব্বে ঠিক এতটা ভাব্‌তেই পারি নি। আজ তোমায় দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত হলুম, তোমার সন্ধানে যে আমি কতদিন থেকে ঘুর্‌ছি তা তুমি জান না, কিন্তু এতদিন পরে আমি তোমায় আবিষ্কার করেছি।

তখন যদি আর একজনও কেউ আমার কাছে থাক্‌তো, তা হ'লে প্রশ্ন করতুম, এ লোকটি কে ?

কিন্তু এই পাগল ছাড়া কাছাকাছি তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউই ছিল না। চট্ করে মাথায় এল একটা কথা, হয় ত এ সি-আই-ডির কোন লোক হবে।

মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বাস দৃঢ় হোল। এ আমায় বহুদিন, বহুবার, বহুরূপে উপলব্ধি করেছে অথচ প্রত্যক্ষ করে নি, অনেকদিন এ আমার সন্ধান করেছে এবং এতদিন পরে আমার সাক্ষাৎ পেলে, এ সব কথা এক সাধক তার ইষ্টদেবকে বল্‌তে পারে, আর এক সি-আই-ডির গোয়েন্দা তার শিকারকে উদ্দেশ করে এই কথাগুলো বল্‌তে পারে, তা ছাড়া আর কেউ ত এ রকম কথা বল্‌বে না। কিন্তু পুলিসের গোয়েন্দাই বা আমার পেছনে আস্‌বে কেন ? মাত্র আজ ত আমি জেল থেকে খালাস পেয়েছি।

বুড়ো একটু হাস্‌লে।

১৮

বুড়োর সঙ্গে আর কি কথা বল্‌বো ভাব্‌তে পার্‌ছি না, সূর্য্যের আলোয় দূর মাঠের ওপোর চেয়ে দেখি, কারা সব আস্‌ছে।

দিনাজপুরে আজ কোন উৎসব আছে কি না জানি না, নানারূপ চক্‌চকে পোষাকে মণ্ডিত হয়ে অনেকগুলি ঘোড়সওয়ার মাঠের ওধার থেকে টাউনের দিকে আস্‌ছিল।

সাম্‌নে আছে ঘোড়ার পিঠে বল্লমধারী এক যোদ্ধা, তার পেছনে আছে সুউচ্চ উষ্ণীষধারী মুক্ত কৃপাণকরে কতকগুলি অশ্বারোহী। তাদের পেছনে আছে দুই সারি সওয়ার, তাদের হাতে আছে নানাপ্রকার অস্ত্র, তাদের পেছনে আছে রূপার সাঁজোয়া মোড়া অনেকগুলি ঘোড়ার পিঠে অনেকগুলি বীর পুরুষ। মিছিল করে বোধ হয় যেন কোন এক রাজকুমার দিনাজপুর সহরে এসে প্রবেশ কর্‌লেন, হয় ত বা রাজা কিংবা রাজার অতিথি কেউ হবেন।

প্রকাণ্ড মিছিল ক্রমে ক্রমে আমাদেরই দিকে এগিয়ে এল। শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য বীর অশ্বারোহীদের মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড ঐরাবত তার স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারমণ্ডিত শুণ্ডকে অল্প অল্প আন্দোলন করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। ঐরাবতের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি কেতনধারী প্রহরী, ঐরাবতের পিঠের ওপর সম্রাটের আসন ও রাজছত্র এবং সেই আসনকে অলঙ্কৃত করে এক বিশালবক্ষ বীরপুরুষ মৃদু মৃদু হাস্‌ছেন। রাজকুমারের দৃষ্টির মধ্যে রাজোচিত দম্ভ কিন্তু নেই, তার মধ্যে কেমন যেন নির্লিপ্ত শান্তির

অনাবিলতাই কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে রয়েছে; যেন ঐ রাজ-ঐরাবতের ওপর তার কোন আগ্রহই নেই, সাম্রাজ্যের মোহ যেন তাকে স্পর্শ করতেই পারে নি। বিশাল আড়ম্বরের মধ্যে এইটাই শুধু পরিস্ফুট, আর একটা জিনিষ আমি আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য কর্‌লুম, ইতিপূর্ব্বে যত মিছিল আমি দেখেছি, সর্ব্বত্রই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখেছি বহুলভাবে, কিন্তু এই বিশাল বাহিনীর মধ্যে বাদ্যের কোন আয়োজন নেই। এদের পদধ্বনিও তেমন প্রখর নয়, নীরবে, নিঃশব্দে পরিক্রমণ করে এই প্রকাণ্ড বাহিনী মাঠের মাঝখান দিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এল।

সাম্‌নের সওয়ারগুলি আমাদের পাশ দিয়ে টাউনের দিকে চলে গেল, তার পেছনে যারা আস্‌ছিল, তারাও গেল, তার পেছনে—তার পেছনে ঐরাবত এল। ঐরাবতের পিঠ থেকে রাজা একবার আমাদের দিকে অপাঙ্গে দেখ্‌লেন, আমরা সেই গাছের তলাতেই বসেছিলুম। উঠে দাঁড়াবার প্রয়োজন আমি বোধ করি নি এবং আমার সেই বৃদ্ধ সঙ্গীর বোধ হয় দাঁড়াবার উপযুক্ত শারীরিক শক্তি ও উৎসাহের অভাব ছিল। যাই হোক্, রাজা আমাদের দেখ্‌লেন। একেবারে পাশে এসে আর একবার দেখ্‌লেন, এবার ভালো করেই দেখ্‌লেন। একটু এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে আর একবার দেখ্‌লেন। এবার তার কি হোল ঠিক জানি না, তিনি তাঁর পরিচ্ছদের প্রান্ত থেকে বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করে তাই দিয়ে চোখ মুছ্‌লেন। তারপর যতদূর দেখা যায় চেয়ে রইলুম, তিনি আর আমাদের দিকে দেখেন নি।

একে একে সমস্ত অশ্বারোহীই চলে গেল। কোর্টের ধার দিয়ে ষ্টেশনের পাশ দিয়ে বড় রাস্তা ধরে বোধ হয় রাজবাটীর দিকেই সমস্ত মিছিলটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ঐ বৃদ্ধ সঙ্গী আবার কথা কইলে। বল্‌লে, সুরেন,

ঐ রাজাকে দেখে আমার বড় হিংসা হয়, ঐ বা রাজা কেন, আর আমিই বা নিঃস্ব পথিক কেন? ওতে আমাতে কিসের প্রভেদ?

বললুম, তা ত বটে, কিন্তু ঐ রাজাও বোধ হয় আমাদের অবস্থাকে ঈর্ষা করছে। ওর মুখের মধ্যে আমি কিন্তু সেই রকম ভাবই লক্ষ্য করেছি। আমার মনে হয়, ও বোধ হয় ওর ঐরাবতকে ছেড়ে এই গাছের তলায় এসে বসতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে।

কথাটা ওর মনে হয় ত লাগ্‌লো না, আমার সেই পথিক বন্ধুটি গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লো।

দিনটা এম্‌নি করেই গড়িয়ে এল। পথিক বন্ধু আমার পাশে ঠিক চুপ করেই বসে ছিল। ঐ নিতান্ত অপরিচিতের নীরব সান্নিধ্য আমার পক্ষে কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠ্‌লো। মনে হলো, এখান থেকে উঠে কোথাও স্থানান্তরে যাই। সেই উদ্দেশ্যেই উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ গাছের পেছন দিকে নজর পড়তেই দেখি, এক সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী ত কতই দেখি, কিন্তু এ রকমটি ঠিক কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। পোষাক ও চেহারার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই, কিন্তু তবুও তিনি আমায় যেন কেমন আকর্ষণ কর্‌লেন। মনে হলো, আমার সঙ্গে এই সন্ন্যাসীর এইখানে সাক্ষাৎকারের মধ্যে কোন এক নিগূঢ় রহস্য আছে, যেন এই সময় এইখানে ওঁর দেখা আমায় পেতেই হবে এবং সেই জন্যই আমি যেন সারাদিন ধরে অনাহারে এইখানে অপেক্ষা কর্‌ছি।

সন্ন্যাসী আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। কোন কিছু না ভেবেই দ্রুতপদে এগিয়ে এলুম আমি ওঁকে প্রণাম কর্‌তে।

ব্যস্ত হয়ে তিনি গেলেন পেছিয়ে। সন্ন্যাসীর মুখ থেকে যে রকম ভাষা আমরা শুন্‌তে অভ্যস্ত, ঠিক সেই ভাষাতেই তিনি আমায় প্রণাম কর্‌তে নিষেধ কর্‌লেন, কিন্তু প্রণাম না করার কারণ যা দিলেন, তা অতি অভিনব, বল্‌লেন, তুমি আমার চেয়ে সব বিষয়েই বড়ো, অতএব তুমি আমার প্রণম্য, আমি তোমার নই।

এ কথা আমরা কখনও শুনি নি। সন্ন্যাসী বড়ই হোক্ আর ছোটই হোক্, ওদের দম্ভ ও আড়ম্বর চিরদিনই অপর্য্যাপ্ত। সেই লোককে এত বিনয়ী দেখে আমার বড় আশ্চর্য্য লাগ্‌লো। বিস্মিত হয়ে সেই প্রশ্নই তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম।

তিনি বল্‌লেন, আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু পতিত। সন্ন্যাসগ্রহণের পর অসংখ্য উত্থান ও পতনের তরঙ্গকে ভেদ করে আজ তোমার মধ্যে প্রকাশ হয়েছে আমার এই ব্যর্থ সত্ত্বা, তাই তুমি হলে আমাদের বড়ো, তুমি আমার নমস্য।

ঠিক বুঝলাম না, এ আবার কোন্ দেশীয় সন্ন্যাসী।

তিনি বলেই চল্‌লেন। বল্‌লেন, এই বিরাট্ বিশ্ব তার নিজের গতিপথে নিরন্তর এগিয়ে চলে, তার চলার বিরাম নেই। চলার প্রথম স্তরে যারা থাকে, তাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যায় দ্বিতীয় স্তরের লোক, আরও এগিয়ে যায় তৃতীয় স্তরের। ছোটরা ছোট নয়, তারাই বড়ো। বয়োজ্যেষ্ঠকে যে জ্ঞান আবিষ্কার কর্‌তে হয় বিশাল আবর্জ্জনার স্তূপ থেকে, বয়োকনিষ্ঠ শিশুর দল তাকেই শিক্ষা করে অবলীলায়, জ্যেষ্ঠের তুলনায় কনিষ্ঠ হোলো ধনী ; জ্যেষ্ঠের যা স্বপ্ন, কনিষ্ঠের তাই বাস্তব, জ্যেষ্ঠের যা স্বপ্নাতীত, কনিষ্ঠের তাই ভাববিলাস, ছোটরা ছোট নয়, জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে পরীক্ষা কর্‌লে ছোটরাই বড়ো। তাদের দৃষ্টি হোল বড়োদের চাইতেও ব্যাপক, আমি তাই ছোটদের প্রণাম গ্রহণ করি না, আমার মনে হয় ছোটরাই আমার নমস্য।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে আমার মনে এল নানারূপ প্রশ্ন। ইনি কে, কোন্ সম্প্রদায়ের মত্ এই সন্ন্যাসী আজ আমার কাছে ব্যক্ত কর্‌ছেন। সন্ন্যাসীর মধ্যে এ রকম উদারচিত্ততা আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নি। কিন্তু কোন প্রশ্নই তাঁকে কর্‌তে পার্‌লুম না।

তিনি আমায় সম্বোধন করে বল্‌লেন, পথিক, যে পথ দিয়ে তোমার যাত্রা হবে, সে পথ বড় দুর্গম। সেই পথের ওপোর চল্‌তে গিয়ে একাধিকবার পতন হয় এবং প্রথম পতনের নিদর্শন হলুম হতভাগ্য আমি।

আমার প্রতি সন্ন্যাসীর পক্ষপাতিত্ব দেখে পাশের বৃদ্ধটি বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছিল। সে এসে সন্ন্যাসীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্লে, ঠাকুর, আমায় জ্ঞান দাও।

তারপর তাঁকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম কর্‌লে।

ওর প্রণামে সন্ন্যাসী কোন প্রতিবাদ করলেন না। প্রণামের পর ওর মুখের দিকে চেয়ে অল্প হেসে বল্‌লেন, তুই ত মরা, তোকে আবার আশীর্ব্বাদ করবো কি?

এই কথার পরই বৃদ্ধের আবয়বিক পরিবর্ত্তন হতে সুরু হোল। শুষ্ক, শীর্ণ, কঙ্কালসার বৃদ্ধ তার বেপথু শরীর নিয়ে নিতান্ত শক্তিহীন হয়ে মাটীতে বসে পড়্‌লো। বৃদ্ধকে সাহায্য করবার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধর্‌তেই তার প্রাণহীন দেহটা ধূলায় লুটিয়ে পড়্‌লো। বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে নিতান্ত বিপন্নের মত সন্ন্যাসীর সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর দিকে চেয়ে দেখি, তিনি হাসছেন, বল্‌ছেন, গতস্য শোচনা নাস্তি!

কিন্তু পুরাতন ভয় আমায় চট্ করে ব্যাকুল করে—আবার কি খুনের দায়ে পড়্‌বো না কি?

সন্ন্যাসী বল্‌লেন, ভয় কিছু নেই, দেখ দেখি আর একবার চেয়ে।

মৃতের দেহটি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হয়ে ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

অপরাহ্ণের আলো তখন ম্লান হয়ে আস্ছে। গাছে পাছে পাখীদের সান্ধ্য-মিলনের উৎসব লেগেছে। দূরে দূরে ছেলেদের আনন্দ কোলাহল বহমান বায়ুস্রোতে ভেসে আস্ছে আমার কর্ণকুহরে। পার্শ্বে ঐ অদ্ভুত সন্ন্যাসী এবং আমারই সাম্‌নে দিনের আলোয় সদ্যমৃত বৃদ্ধের শবদেহের বিস্ময়কর অন্তর্ধ্যান। এ সন্ন্যাসী কি যাদুকর !

২০

মৃদু হেসে সন্ন্যাসী বললেন, সুরেন্দ্র, এ সব যাদু নয়, এ সব পুরাতনের স্মৃতি। দুনিয়ায় যদি এ সবের যাদুকর কেউ থাকে, তবে সে তুমিই। অতীত জীবনাবলীই আজ বাস্তবের মতো চাক্ষুষ হয়ে তোমার সাম্‌নে ফুটে উঠেছে। ['ফ্যান্‌টামিজম্‌']

কিন্তু এই কি আমার অতীত জীবন ? কই, এভাবে ত কখনও আমি ভ্রমণ করি নি।

সন্ন্যাসী একটু হাস্‌লেন, বল্‌লেন, তুমি ত জাতিস্মর নও, পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত কি তোমার মনে আছে ? পূর্ব্বে তোমার এমন এক জন্ম ছিল, যে জন্মে তুমি এই পথিক রূপে জন্ম নিয়েছিলে, তখন তুমি রাজ-ঐশ্বর্য্যকে হিংসা করেছিলে, ধনী হওয়ার জন্য প্রাণপণ বাসনা ছিল তোমার। তারপর তোমার মৃত্যু হয়, জন্ম-জন্মান্তরের শ্রেণী পার হয়ে ধনী বণিকের ঘরে তুমি জন্মাও, সেখানে অর্থের প্রাচুর্য্যেও তুমি তিলমাত্র শান্তি পাও নি। শক্তির জন্য তুমি লালায়িত হয়েছিলে, তাই তোমার জন্ম হয়েছিলো রাজবংশে। কিন্তু সিংহাসনের অধীশ্বর হয়ে যখন তুমি ঐরাবতে করে নিজের বিশাল সাম্রাজ্য পরিদর্শন করে বেড়িয়েছো, তখন আবার তোমার মন কেঁদেছে নিরাশ্রয় পথিকের পথচারণসুখের জন্য। তোমার রাজমূর্ত্তিই আজ তুমি দেখেছো—ঐরাবতে করে যে রাজকুমার এখান দিয়ে কিছু আগে চলে গেছে, সে তুমিই, সে তোমারই কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের রূপ।

কোন কিছু উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী বললেন, আরও শোন, হে আমার ভ্রান্ত-আমি, আরও শুনে নাও ; এই যে সন্ন্যাসী আজ তোমার

সামনে দাঁড়িয়ে এখানে কথা কইছে, এও তোমারই আর এক মূর্ত্তি, এও তুমি! আজ থেকে সাড়ে তিনশো বছর পূর্ব্বে এই নল্‌হোর্‌পার রূপে তুমি তিব্বতে জন্মগ্রহণ করেছিলে। তিব্বতীয় গুরু সংখপার* কাছে তুমি কামিনী ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারো নি। আমার এই দেহ-শত্রু সেবার তিস্রা বলে এক তিব্বতীয়া কুমারীর জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিল, তাই আমার পুনরায় পতন। সাড়ে তিনশো বছরের জন্মাবর্ত্তন পার হয়ে আজ সুরেন্দ্রনাথ যে দেহ ধারণ করেছে, সে দেহ তার একার নয়, অগণিত সহস্রাব্দীর অসংখ্য জন্মচক্রের স্বাভাবিক পরিণতিতে তোমার এই উপস্থিত মন এবং মনের আধার দেহ ঠিক সেই মনের অনুপাতেই গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক মানুষেরই দেহ-মনের ইতিহাস এম্‌নি বিস্ময়কর, এম্‌নি রহস্যময়।

সন্ধ্যার তখন বেশী আর দেরী নেই। প্রকাণ্ড প্রান্তরের প্রায় অন্ধকার তরুতলে মানবরূপী সন্ন্যাসী আমায় যে ভাবমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, তার সবটুকু হৃদয়ঙ্গম করার মত অবস্থা আমার ছিল না। প্রত্যেক মানুষের অলক্ষ্যে তার পিছনে এক অশেষ সর্পের মত বক্র কুটিল গতিতে যে ধারা প্রবাহিত হয়ে তার মধ্যে এসে ফুটেছে, সেই ধারার আদি কোথায়, পরিসমাপ্তিই বা কোথায়? 'অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত, অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা', এই অব্যক্তই যে কতক পরিমাণে আমার কাছে ব্যক্ত

* তিব্বতীয় ভাষায় সন্ন্যাসীকে নল্‌হোর্‌পা বলে।

উত্তর পূর্ব্ব তিব্বতের আম্‌দো নামক স্থানে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সংখপাদের জন্ম হয়। ইনি তিব্বতীয় গেলাগ্‌স্‌পা' [অর্থাৎ, আনুষ্ঠানিক] নামক ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করেন। এই ধর্ম্মচক্রের সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয় ও নানারূপ বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই শ্রেণীই এখন তিব্বতে প্রবল।

হয়েছে, এর সত্যতাই বা কতটুকু, এর প্রমাণই বা কি ? ঐ যে সন্ন্যাসী আমারই কাছে এক অভেদ্য রহস্যের জাল বয়ন করে চলেছে, ওই জাল ভেদ করার মত শক্তি আমার কোথায়, কিন্তু—

ছোট, বড়, কালো, ফর্সা নানা শ্রেণীর নানা রূপের অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে আলো-আঁধারির মধ্য দিয়ে প্রান্তরের ওপার থেকে আমাদেরই দিকে আস্ছে এগিয়ে। এরা আবার কারা ? এরা কি দেহধারী জীব না এরাও মায়া ?

পলক ফেল্‌তেই ওরা এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হোল'। সন্ন্যাসী আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, সুরেন্দ্র, এরাই তোমার পুরাতন রূপাবলী, এরা সকলেই তুমি। এদের ভালো করে দেখ দেখি চিন্‌তে পারো কি না।

প্রথম যিনি এলেন, তিনি অতি কদাকার পুরুষ, বৃহৎ হনু ও লোমশ দেহ, অর্দ্ধ উলঙ্গ দেহের কদর্য্য নগ্নতায় পশুত্বই প্রতিপন্ন হয়।

তিনি আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। সন্ন্যাসী বললেন, এই দেখ, ইনি তোমার প্রাচীন এক রূপ, কিন্তু এর আগের কথা আমরা কেউই জানিনা অতএব গীতার বাণীই সত্য, এর পূর্ব্বের কথা সবই অজ্ঞাত রইলো।

তারপর এলেন বহু লোক [ফ্যান্‌টাম্যাসগোরিয়া]। একের পর এক, শ্রেণীর পর শ্রেণী, তারপর এল ঐ পথিক যার সঙ্গে দুপুরে আজ কথা কয়েছি, তারপর আরও কত মার্জ্জিত রুচির পুরুষ, তারপর রাজকুমার যাকে আমি ঐরাবতে দেখেছি, তারপর ত্যাগী পুরুষ, তারপর যোগী, তারপর আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী গিয়ে এক সময় ঐ চলমান পান্থশ্রেণীর মধ্যে যোগদান করে হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে গেলেন, তারপর এলেন আবার একদল ভোগী, তারপর ত্যাগ ও ভোগের সংমিশ্রণ, তারপর এল এক

মানুষ,—সে আমারই প্রতীক, যেন আমি আমার বিম্ব দেখ্‌ছি মুকুরের মধ্যে, তারপরও লোক চলাচলের বিরাম নেই, কিন্তু পরের লোকগুলি অস্পষ্ট, ছায়ার ন্যায় ম্লান। ক্রমে সেই রূপহীন লোকেরা পথের ওপোর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে অদৃশ্য হয়ে গেল, শেষে শুধু পায়ে-চলার আভাষ, পরে তাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। মনে পড়লো গীতার সেই বাণী, অব্যক্ত নিধনান্যেব। শেষে কি হোল সেটা সম্পূর্ণ অব্যক্তই রয়ে গেল। চেয়ে দেখি প্রান্তরের অন্ধকারে দিক্‌ থেকে দিগন্তের সীমারেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে আমারই শ্রেণী চলেছে সারিবদ্ধভাবে,—সেই একমাত্র সর্পিল অহংশ্রেণীকে আবেষ্টন করেই বিশাল বিশ্ব; সৌর জগতের পথ হোল তারই চতুর্দ্দিকে, সেই অনন্তব্যাপী জনরেখার মধ্যবর্ত্তী আমিই যে সৃষ্টির মাধ্যাকর্ষণ, আমাকেই কেন্দ্র করে যেন এদের গতি ও স্থিতি—

আমাকে ছাড়িয়ে আমি অনেক—অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি, আমার চাইতে আমি তখন অনেক—অনেক বড়ো।

২১

কে ?

আজ্ঞে আমি, আমায় চিন্‌বেন না।

কে তুমি ?

ছোট একটি ছেলে। কুচকুচে কালো তার চেহারা। অন্ধকার মাঠের মধ্যে আমারই পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরে চেঁচামেচি করেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বল্লে, আমার নাম গর্গ, আমার কাছে বহু গচ্ছিত অর্থ আছে আপনার, সেগুলি গ্রহণ করে আপনি আমায় মুক্তি দিন।

গর্গ! মনে পড়লো গর্গের কথা। এই গর্গের কাছে আমার যে অগাধ অর্থ গচ্ছিত আছে তা ত আমি জানি, কিন্তু সেকথা আমার মনেই ছিল না, কারণ অর্থ যে ভোগ করবে, সে ত আর নেই।

যদুপতেঃ ক্কঃগতে মথুরাপুরি
রঘুপতেঃ ক্কঃগতোত্তরকোশলা—

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরিই বা কোথায়, রঘুপতি রামচন্দ্রের অযোধ্যাই বা কোথায় ; পরবর্ত্তী যুগের জগৎশেঠ, আধুনিক যুগের রথ-চাইল্ড, রক্‌ফেলার—

বল্লুম, অর্থে আমার স্পৃহা নেই গর্গ, অর্থ নিয়ে আমার কোন লাভ নেই, ও আমি তোমাকেই দান কল্লুম, ও নিয়ে তুমি যথেচ্ছ ভোগ কর।

কথাগুলো বলে যেন বিশেষ তৃপ্তি পেলুম, যেন প্রকাণ্ড একটা বোঝা আমার দেহ থেকে নেমে গেল। মৃত্যুর পর মানুষ যেমন নিজেকে লঘু

বলে মনে করে, আমিও এই অর্থভার থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে তেম্‌নি লঘু বলে বোধ কল্লুম।

কিন্তু আমার সামনের ঐ ক্ষুদ্র দেহধারী সহস্র বৎসরের শিশুমূর্ত্তি নিজেকে যেন ততোধিক বিপন্ন বলে বোধ করলে। সে বল্লে, প্রভু—

প্রভু? আমি কি তোমার প্রভু?

সে বল্লে, আজ্ঞা করুন, আপনি তাই, আপনার পূর্ব্বপুরুষের নিকট দাসত্বে আমি বদ্ধ। আপনার অর্থ আপনাকে প্রত্যর্পণ করে তবেই আমার মুক্তি। ঐ অর্থ আমায় দান করা অর্থে, চিরদিনের জন্য আমাকেই বদ্ধ করা। তার চেয়ে আপনি ওকে গ্রহণ করে আজ আমায় অব্যাহতি দিন। শুধু তাই নয়, ঐ অর্থের জন্য বহু সহস্র মানবাত্মাও বন্দী হয়ে আছে, আপনি ঐ অর্থ গ্রহণ কল্লে ওরা সকলেই মুক্তি পাবে।

কমনীয় নারী কণ্ঠে কে যেন আমার পাশে এসে বল্লে, আমি লক্ষ্মী, প্রিয়তম, তুমি আমার বরমাল্য গ্রহণ কর।

চেয়ে দেখি লক্ষ্মীর আশে পাশে অসংখ্য দেববালা স্রক্‌চন্দন হস্তে আমারই ইঙ্গিতের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। পৃথিবীর সমস্ত সুখ, অপার বিলাসিতা, বিশ্বব্যাপী যশ, উগ্র আনন্দ এ সমস্তই আমার ওপোর বর্ষিত হওয়ার অপেক্ষায় সজল মেঘের ঘনগম্ভীর ছায়া নিয়ে উন্মুখ, যেন শিবের জটা থেকে মুক্তি পেলেই স্বর্গের মন্দাকিনী এই জনাকীর্ণ পৃথিবীতে ভাগিরথীর রূপ নিয়ে অনাবিলতার উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে ধূলিমলিন ভূখণ্ডের সীমাহীন কর্দ্দমকে সংগ্রহ করে অন্তহীন ক্ষুব্ধ বদ্ধ সাগরের দিকে উদ্দাম হয়ে ছুটবে। যেন সেই বিপুল ঘূর্ণীর মোহময় চিরাবর্ত্তে—

কিন্তু আজ আমি নির্ভিক; অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কেমন একটা তরল হাসি যেন আপনা হতেই উৎসারিত হয়ে ফেটে পড়্‌লো! 'নির্ব্বান

দীপে কিমু তৈলদানম্', ভোগ যে করবে সে আজ বেঁচে নেই, মানবের যে দর্শন রূপ দিয়ে মুগ্ধ হয়, অসংখ্য তীক্ষ্ণ সায়কের প্রাণান্তকর আঘাত সেই দৃষ্টিকে যে পূর্ব্বেই অন্ধ করে দিয়েছে। সহাস্যমুখে ভোগের দেবী লক্ষ্মীর দিকে জোড়হাত করে বল্লুম, মা, তুমি যদি দশবছর পূর্ব্বে আস্‌তে তা'হলে আমি তোমায় গ্রহণ করতুম সানন্দে, কিন্তু এই দশবছরের নির্জ্জনতায় আমার মনের সেই ভোগী নারায়ণ যে শিব হয়ে ধ্যানস্থ হয়েছেন শ্মশানের চিতাভস্মে। লক্ষ্মী, তুমি যদি লক্ষ্মী হও, তবে আর লক্ষ্মীরূপে নয়, তুমি চিন্ময়ী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে, অবিনশ্বর জ্যোতিতে পূর্ণা হয়ে পার্থিবতার ধ্বংসস্তূপের অসংখ্য চিতামণ্ডলীর মধ্যে আর একবার দিগ্বসনারূপে পরামুক্তির আনন্দে নৃত্য কর মা! সেই বর্ণহীনা শ্যামার নিকষকৃষ্ণ মূর্ত্তি এই বর্ণবহুল কর্কশ চিত্রাবলীর শ্বেতনীল জ্বালা থেকে আমায় চিরতরে অব্যাহতি দিক্। পরম শান্তির ভূমাময়ী আসনে আমায় কালের অতীত করে প্রতিষ্ঠা কর মা। অতি ধীরে অলক্ষ্যপথে মায়াবীরা কেমন করে সরে গেল জানি না, বিষণ্ণবদন গর্গ দেখি উৎসুক হয়ে আমার দিকে তখনও চেয়ে আছে। দুঃখ হোল', তার দিকে চেয়ে বল্লুম, গর্গ, তুমি যাও, আমার অর্থ আমি গ্রহণ কল্লুম, আমি তোমায় মুক্তি দিলুম।

কিন্তু গর্গের দিকে চেয়ে দেখি, তখনও সে তৃপ্ত হয়নি। বল্লুম, গর্গ, ভয় নেই, তোমার কাজ তুমি ঠিকই করেছো। আমার অর্থ আমি তোমার থেকে গ্রহণ করে পৃথিবীকেই সেই অর্থ দান কল্লুম। ধরণীর গর্ভে থেকেই যে পাপ সহস্র আত্মাকে আকর্ষণ করে বন্দী করেছে, সেই ভয়ঙ্কর গরল পৃথিবীর বুকে তুলে আর কাজ নেই, সে ঐ মাটীর মধ্যেই চিরনির্ব্বাসিত হোক্—তুমি তোমার সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করে যথেচ্ছ গমন কর!

গগনের উদীচীমণ্ডল পুলকিত করে জ্বলে উঠ্‌লো এক আলোকের

শিখা। স্নিগ্ধ আনন্দের প্রবাহ থেকে পরিচিত এক কণ্ঠের ধ্বনি এল, সাধু, বৎস সাধু।

—গুরুদেব!

প্রান্তরের তরল অন্ধকারের মধ্যে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত আচার্য্যের ছায়া-মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হোল'। সুদীর্ঘ ক্ষীণ অঙ্গুলি প্রসারিত করে আলোক-উদ্ভাষিত উত্তরের দিকে তিনি যেন কি এক ইঙ্গিত করে আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন।

দেহভার লঘু হোল'। সুখ দুঃখের বিরাট্‌ পৃথিবীকে বিস্মৃত হয়ে নৈশ অন্ধকারেই অনুসরণ করে চলেছি ঐ ছায়াকে—

আমার এই চলার শেষ কোথায়? কোথায়—কত দূরে?

তিথি-পূজা

খণ্ডগিরি পাহাড় থেকে নেমে আসছি, হঠাৎ একটা পাথরের ওপোর পা পিছ্‌লে সেইখানেই বসে পড়্‌লুম। আঘাত সামান্য, কিন্তু এতেই কোমরে একটা দারুণ ব্যথা পেলুম। মনে হোল', ওই ব্যথাতেই বুঝি জীবনটা বেরিয়ে যাবে।

সন্ধ্যার বেশী দেরী নেই, কাছাকাছি কোথাও লোকালয়ও নেই। ভুবনেশ্বর প্রায় সাত মাইল দূর, অথচ এখানে কোনরকম যান-বাহনও মেলে না। কি কুক্ষণেই যে ভুবনেশ্বর থেকে সাইকেল ভাড়া করে বেরিয়েছিলুম!

সঙ্গের সন্ন্যাসী 'গাইড' বল্লে, কি হোল বাবু, এখানে বস্‌বেন না কি?

বল্লুম, না বাবা, সখ্‌ করে কি আর কেউ এখানে এমন সময় বসে, কিন্তু কি করবো, আমি যে কিছুতেই আর উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

কোমরের দরদের কথা সন্ন্যাসীকে বল্লুম। ভাবলুম, কোন রকম দেশী দাওয়াই দিয়ে সে হয় ত কিছু কর্‌তে পারে, কিন্তু বুঝ্‌লুম যে, সন্ন্যাসী আমারই মত পণ্ডিত, সেদিক দিয়ে কোন রকম আশাই নেই।

একটু বস্‌তেই সন্ধ্যা যেন এগিয়ে এল। খণ্ডগিরি পাহাড়টা নীচু বলেও বটে এবং আশেপাশে ছোট বড় গাছ থাকার দরুণ এখানে সন্ধ্যার অন্ধকার কিছু আগেই এসে পড়ে।

সন্ন্যাসী বল্‌লে, বাবু, বেশী দেরী করবেন না, এখানে না কি—

অর্থাৎ, বাঘের ভয় !

তার হাত ধরে কোনমতে উঠে দাঁড়ালুম। তখন বেশ পাতলা গোছের অন্ধকার পথের নীচেটাকে কতকাংশে জমিয়ে দিয়েছে, তবে মাথার ওপোর সূর্য্যের সোণালী আলোয় আশার চিহ্ন তখনও লেগেছিল। আলো-আঁধারির মাঝখানে ভুবনেশ্বরে ফিরে যাওয়ার আশা ও নিরাশায় কোন-রকমে সন্ন্যাসীর হাত ধরে খাড়া হয়ে উঠ্লুম।

মাথায় যে কি ভূত চেপেছিল তা' জানি না, হঠাৎ অফিস থেকে ক'দিন ছুটী নিয়ে 'উইক এণ্ডে' পুরী যাব বলে কাল বেরিয়েছিলুম। আজ সকালে এসে ভুবনেশ্বরে নেবে দুপুরে সাইকেল ভাড়া ক'রে এলুম উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখ্তে। ফেরার পথে এই বিপদ !

কোনরকমে ধীরে ধীরে পাথরের ধাপ্গুলো এক এক করে নেমে এলুম। পায়ের তলায় শুক্‌নো পাতার আওয়াজ, আশেপাশে ঘরে-ফেরা পাখীদের হাসি ও গল্প, সঙ্গে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত অর্দ্ধ উলঙ্গ সন্ন্যাসী আমার একমাত্র সহায়, তার ওপোর শরীর হোল একান্ত অপটু। অন্ধ-কারের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত গহ্বর থেকে বাঘ আসার সম্ভাবনা !

পাহাড়ের নীচেই ওই সাধুটির আস্তানা। সেখানে ওর একটি মাত্র ছোট কুঁড়ে আছে। কুঁড়ের মধ্যে সাজানো আছে অনেকগুলি খড়ম। পাহাড়ে ওঠবার পূর্ব্বেই আমায় খড়মগুলি দেখিয়ে সন্ন্যাসী কিছু প্রণামী আদায় করেছিল। ওই সব খড়ম না কি পরলোকস্থ পূজ্যপাদ সন্ন্যাসীদের পুণ্যময় স্মৃতি।

ওর কুঁড়ে ঘরের কোলে ছোট একটি রোয়াক আছে; কোন রকমে সেই রোয়াকে এসে বসে পড়লুম কিন্তু বসাও আর চলে না, একেবারে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে হতাশ হয়ে শুতে হোল।

ফিক্-ব্যথা মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু ঠিক্ এ রকম অবস্থা ইতিপূর্ব্বে

কখনও হয় নি। সাধুর কাছে খাবার জল চাইলুম, সে লোকটি যেন বিরক্ত হয়ে একটি পেতলের ঘটি করে এক ঘটি জল এনে দিলে।

চাবি লাগান সাইকেল্‌টা কাছেই রয়েছে, আমার দক্ষিণ দিকে লাল কাঁকর দিয়ে বাঁধানো সন্ত পরিচিত রাস্তাটি সোজা ভুবনেশ্বরের দিকে চলে গিয়েছে। এখানে একটু অন্ধকার হলেও উদয়গিরি পাহাড়ের মাথার ওপোর জনহীন ব্রাহ্ম-সমাজের চূড়ায় তখনও সূর্য্যের পড়ন্ত আলো! যদি কোন রকমে একবার উঠ্‌তে পারি তাহলে মাঠের মধ্যে যেটুকু আলো আছে তাতেই আমার 'বাইকে' ভুবনেশ্বরে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু—হা ভগবান!

দুই

শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, নিতান্ত ভয়ে ভয়ে, বল্লুম, ঠাকুর, রাত্রে কি এ রাস্তায় যাওয়া যায় ?

সে বল্লে, যায়, তবে আপনি কি পার্‌বেন, পথে অনেক বিপদ আছে।

—তবে কি করা যায় বলো ত ?

—আমার এইখানে থাক্‌তে পারেন, তবে আজ মাঝ-রাত্রে আমার তিথি-পূজা আছে, সেই সময় কতক্ষণের জন্য আপনাকে একটু বাইরে থাক্‌তে হবে !

—সর্ব্বনাশ ! তার মানে ?

মানে আজকের তিথি বড় ভাল। শাস্ত্রীয় মতে আজ মহাপুরুষেরা মর্ত্ত্যলোকে আসেন ; সেই সময় আমি ওই ঘরের মধ্যে পূজাদি কর্‌বো। ওই সময়টা অপর কেউ ঘরে থাক্‌লে আমার চল্‌বে না।

বল্লুম, বাবা, অশক্ত অতিথি—

সে বল্লে, আচ্ছা একটু শুয়ে থাকুন, নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।

চোখ বুজে শুয়ে রইলুম, তবে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি, ভয়ে ভয়ে। আকাশ অন্ধকার হয়ে এল। নির্জ্জন পাহাড়ী জায়গায় দূরে দূরে অদ্ভুত অপরিচিত শব্দ হতে সুরু হোল'। গাছের মাথার ওপোর পাতায় পাতায় ঘষাঘষি হয়ে বীভৎস আলাপ চল্‌তে লাগ্‌লো। পাহাড়ের পেছন দিকে বোধ হয় শৃগালেরা যেন প্রথম প্রহর হাঁক্‌লে।

সন্ন্যাসীঠাকুর সেই যে চলে গেছে, তার আর কোন পাত্তাই নেই। একএকবার নিজেনিজেই ওঠ্‌বার চেষ্টা করছি, পারছি না, শুধু অসহ্য ব্যথাই পাচ্ছি কোমরে। যদি কোনরকমে সেঁক দেওয়ার বন্দোবস্ত কর্‌তে

পার্তুম, তা হলে হয় ত একটু কম্‌তো, কিন্তু সে সব যোগাড়ই নেই। অদৃষ্টের অদৃশ্য খাঁচায় নিরুপায় হয়ে পড়ে আছি। জ্ঞান আমায় ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিচ্ছে, সাম্‌নে বিপদ!

এ সন্ন্যাসী কি 'কপালকুণ্ডলা'র কাপালিক না কি!

কপাল দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝর্‌তে লাগ্‌লো। স্পষ্ট মনে হোল, আমার এই ব্যথার সৃষ্টি ওই সন্ন্যাসীর দ্বারাই হয়েছে। কোনরকম দুরভিসন্ধি নিয়ে ওই আমায় একেবারে পঙ্গু করে এইভাবে ওর খপ্পরে বন্দী করেছে।

আর একবার বস্‌তে চেষ্টা কল্লুম্‌। পাল্লুম না! কেউ কোথাও নেই। যদি কোনরকমে কেউ আমায় সাইকেল্‌টায় চড়িয়ে দেয়। রাস্তায় বাঘ বা ডাকাতের হাতে পড়্‌ব কি না জানি না। তা' সে যাই হোক্‌, এখন ত রক্ষা পাই। কিন্তু—নিরুপায়! যন্ত্রণায় পা দুটো অসাড় পঙ্গু হয়ে গেছে, আমি যেন পক্ষাঘাতের রোগী।

নিদারুণ বিপদে সেদিন দুনিয়ার সমস্ত দেবতাকে ডেকে বলেছিলুম্‌, ঈশ্বর, তুমি যদি থাকো ত আমায় উদ্ধার কর! আর নাই যদি উদ্ধার কর, তবে আমায় অজ্ঞান করে দাও! সজ্ঞানে এই শঙ্কা আর ভোগ করতে পারি না!

তিন

সন্ধ্যার কতকটা পরে সন্ন্যাসী ঠাকুর ফিরে এল। এক হাতে কতকগুলি ফুল, লতা ও ফল, অপর হাতে জ্বলন্ত এক মশাল। দেখেই আমার মনে হোল, বীভৎস তার চেহারা! গলায় যেন কিসের সব মালা, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, মশালের আলোয় ওর চোখ দুটো হিংস্র বাঘের মত জ্বল্‌ছিল।

গম্ভীরভাবে আমার কাছে এসে সে জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি এখন উঠতে পার্‌বো কি না।

এটা ওর নিছক তামাসা! ও নিজেই ত বেশ বোঝে আমার অবস্থা ঠিক্ কি রকম আছে। সাধ্য থাক্‌লে আমি ওর সন্ন্যাসী-জীবন তখনি শেষ করে দিতুম, কিন্তু কি কর্‌বো নিরুপায়! শ্লেষ যেন আপনি বেরিয়ে এল। দাঁত খিচিয়ে উত্তর দিলুম, তুমি কি আর জানো না ঠাকুর। মনে মনে বল্‌লুম, শয়তান, ভণ্ড, বেটা সাধুগিরি কর্‌তে এসেছো।

উত্তর শুনে সে আর কোন কথা কইলে না। পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বোধ হয় তার হাতের জিনিষগুলো রাখ্‌লে। তারপর বেরিয়ে এসে আমায় জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি কিছু খাবো কি না?

ফাঁসীর পূর্ব্বে ঘাতকেরাও এমনি করে বধ্যকে জিজ্ঞাসা করে। বিরক্তিভরে আমি এর কোন উত্তরই দিলুম না। সে আবার আমায় জিজ্ঞাসা কল্লে, আমি তার ঘরের মধ্যে যাব কি না?

দ্বিতীয় প্রস্তাবটা নেহাৎ যেন মন্দ নয়।

রাত্রি ক্রমশঃই ঘনিয়ে আসছে। গাছ এবং পাহাড়ের তলায় তখন নিবিড় অন্ধকার। মাঝে মাঝে জোনাকীর আলো। শুক্‌নো পাতার

ওপোর সরীসৃপদের গতিবিধির শব্দ। কীট পতঙ্গের কণ্ঠ ও পক্ষনিঃসৃত শব্দও এদিক ওদিক থেকে কানে আসছে। বড় বড় গাছের গহন শিখরগুলিও হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে, মাঝে মাঝে শুক্‌নো পাতা সব ঝরে পড়্‌ছে। অল্প উঁচু রোয়াকের ধূলোর ওপোর শুয়ে আছি। পাথরের রোয়াঁকের মাঝে মাঝে বড় বড় ফাটলও রয়েছে; ওর মধ্যে বিছা বা সাপ না থাকাই অসম্ভব—অথচ, উঠে বসবার শক্তিটুকুও আমার নেই।

বোধ হয় ঘরের মধ্যে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই সে আমার হাত ধরলে। তার শুক্‌নো হাতটা আমার যেন ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগ্‌লো। ওই স্পর্শের মধ্যে কেমন একটা জিঘাংসার ভাব যেন স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। শিউরে উঠলুম। অজ্ঞাতসারেই বলে উঠলুম, ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।

মশালের আলোয় তার মুখখানা দেখ্‌তে পেলুম, সে মুখ যেন অল্প হাস্‌ছে। বল্লে, বাইরেই থাকবেন না কি?

বল্‌লুম, হ্যাঁ, তুমি চলে যাও, তোমায় আর আমার কোন দরকার নেই।

একটুখানি হেসে সে আলোটা হাতে করে ঘরের মধ্যে চলে গেল, যাবার সময় ঘটিটাও নিয়ে গেল।

উপস্থিতের জন্য বাঁচলুম। জামা এবং কাপড় ঘামে দুইই ভিজে গেছে। সর্ব্বশরীর থরথর করে কাঁপছে। অথচ, উঠে বস্‌তেও পাচ্ছি না। কোনরকমে পকেট থেকে 'টর্চে'র আলোটি বার কর্‌লুম।

এধার ওধার একবার দেখে নিয়ে আলোটি নিবিয়ে রাখ্‌লুম। ছোট 'ব্যাটারী'র ওপোর একটুও বিশ্বাস নেই, কখন সে 'টুপ্‌' করে ফুরিয়ে যাবে।

একটু পরেই সন্ন্যাসী-ঠাকুর ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এল। হাতে তার বড় একটা তমালের পাতা; তা'তে যেন কি একটু আছে; আর একহাতে ঘটি করে জল।

'কাঠ' হয়ে পড়ে পড়ে দেখ্‌ছি। সে আমার কাছে এসে ওইগুলি নামিয়ে রেখে যা' বল্‌লে, তার ভাবার্থ এই যে, রাত্রে উপবাসী থাকতে নেই; বিশেষ করে অতিথি উপবাসী থাকলে দেবতা অসন্তুষ্ট হন্‌। অতএব সে তার সাধ্যমত আমাকে দিয়ে গেল। আমি যেন আহার করতে কোন রকম দ্বিধা না করি।

কথার মধ্যে কাপালিকত্বের কোনরকম আভাষই পেলুম না। খাবার ও জল রেখে সন্ন্যাসী কোনরকম প্রত্যুত্তর না নিয়েই ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটি ভেতর থেকে বন্ধ হোল'। হাঁসকলে বহুদিন তেল পড়ে নি, বিকটাকার শব্দে বুঝ্‌লুম, পুরানো হলেও দরজাটা মজবুত আছে।

অন্ধকার নির্জ্জন রাত্রিতে অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্যে মনুষ্যরূপধারী একমাত্র প্রাণী যে আমার ভাষার কতকাংশ বুঝ্‌তো, সেও তার দ্বার রুদ্ধ করে আমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কর্‌লে।

চার

পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। একমাত্র ভাই আছে। আশা ছিল তাকে কোনরকমে মানুষ করে একটা কাজ করে বিয়ে দিতে পারলে হয় ত আমার পিতৃবংশের ধারাটা বজায় থাক্‌তো। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আমার দ্বারা কিছু হয়ও নি, হোল'ও না।

আমার মত নিঃসহায় চিন্তাহীন লোকের এই রকম বিপদ হবে না ত হবে কার? খেয়ালের বসে একা একাই ঘুরি। কারণ, দুনিয়ার সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধ নেই, তার পক্ষে একা ছাড়া উপায় কি? অবশ্য এ রকম বিপদে কখনও পড়ি নি এবং আশাও করি নি যে, এই ভাবেই প্রাণটা হারাতে হবে।

এই সেই কবিদের বিশ্বপ্রকৃতি। আরণ্য প্রকৃতির এই ত নগ্নমূর্ত্তি। এই রাক্ষসীমূর্ত্তিকে নিয়েই কি কবিদের এত উচ্ছ্বসিত কল্পনা! ও কি!

'টর্চ'টা জ্বেলে নিয়ে অন্ধকারের এধারওধার, নিকট এবং দূর ভাল করে দেখে নিয়ে আবার নিবিয়ে দিলুম। স্পষ্ট বুঝলুম, মৃত্যু যখন এগিয়ে আসে, তখন মানুষের মধ্যে দুটো ভাব ফুটে উঠে, একটা চকিত সতর্কতা, আর একটা মধুর স্বপ্নাবেশ!

দূরে যেন কার পায়ের শব্দ হোল'। আলো ফেলে দেখ্‌লুম, একটী মানুষ পাহাড় থেকে ধাপে ধাপে নেমে আস্‌ছে।

আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব চল্‌ছিল। কে ও, মানুষ, ডাকাত, ভূত, না কে? আগে আমি কখনই ভূত বিশ্বাস করতুম না, আজকে এখানে এসে ভূতের ভয়ও কিছু কিছু হচ্ছে।

পায়ে চলার পথ ধরে লোকটি নেবে আমারই দিকে আস্‌তে লাগ্‌লো। তার এক হাতে লাঠি, অপর হাতে ছোট একটি লণ্ঠন। লণ্ঠন থেকে কেমন একটা চাপা আলো বেরুচ্ছে। পরণে একখানি গেরুয়া কাপড়, খালি পা, কাছে আসতে মনে হলো, মাথাটা কামানো। মুখটা ক্রমে আরও কাছে এগিয়ে এল। ও কে, যেন চেনা-চেনা মত ঠেকছে, কোথায় যেন—

বয়স বোধ হয় আমারই মত হবে ; লোকটি তখন একেবারে সাম্‌নে এসে পড়েছে। বল্লে, কে অনিল, তুমি এখানে শুয়ে আছ ?

আমারই নাম ধরে ডাকলে ত! আনন্দে ও বিস্ময়ে কোমরের ব্যথা ভুলে গিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলুম, আপনি, তুমি—

—চিন্‌তে পাচ্ছো না ?

মনের ভেতর থেকে জোর করে বল্‌তে ইচ্ছে হোল', পাচ্ছি—পাচ্ছি —চিনি তোমাকে—তুমি যে—কিন্তু কে ?

লাঠিটা রোয়াকের ধারে ঠেস্‌ দিয়ে সে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্লে, ভাল করে দেখো ত, চিন্‌তে পাচ্ছো কি না ?

তার এই সুদর্শন সৌম্য চেহারার সবটাই আমার মনে আছে। তার ওই হাসি-হাসি মুখ, উজ্জ্বল চোখ, সরল চাউনি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য—

—আমি দেবদত্ত!

—দেবদত্ত ? দেব ? ও তুমি দেবু, তাই বলো। তারপর ভাল ত ?

—ভাল।

—এখানে, এ রকম সময় আমি তোমায় মোটেই আশা কর্‌তে পারি নি।

হাস্‌তে হাস্‌তে দেবু বল্লে, আমি কিন্তু এই সময় এইখানেই তোমাকে আশা করেছি। তা' যাক্‌, তুমি এই জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছ কেন, আমার সঙ্গে এসো।

মনে হোল' তাকে আমি সব কথা বলি, কিন্তু বলার অবকাশ আর পেলুম, না, কেমন এক মোহের বশে বিনা দ্বিধায় আমি তার সঙ্গে চল্‌তে সুরু কল্লুম। এমন কি, মনে হোল' যে, আমি যেন এতক্ষণ ওই দেবুর আশাতেই এখানে শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা কর্‌ছিলুম।

পাহাড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে কেমন একটা অসাধারণ আনন্দ হোল'। অন্ধকার রাত্রিতে নির্জ্জন শ্বাপদসঙ্কুল পাহাড়ে উঠ্‌তে কোন রকম সংকোচ মনেই এল না।

নতুন সঙ্গীটীকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কল্লুম, দেবু, তোমরা এখানে আছ কোথায় ?

সে বল্লে, এইখানেই। আচ্ছা অনিল, তুমি কি খণ্ড-গিরিতে এই প্রথম এলে ?

বল্লুম, হ্যাঁ ভাই, এই আমার প্রথম।

সে একটু হাস্‌লে। বল্লে, আমরা কিন্তু বহুকাল ধরেই এইখানে থাকি।

কথা কইতে কইতে দু'জনেই পাহাড়ে উঠতে লাগ্‌লুম। পাহাড়ী পথটা নেহাৎ সরু বলে পাশাপাশি চলা যায় না। সে আগে আগে আলো নিয়ে চল্লো, আমি পেছনে পেছনে চল্লুম। দেবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা সমস্তই কইছি বটে, কিন্তু মনে মনে দারুণ চেষ্টা করছি ওর সমস্ত কথা মনে করার জন্য। ওকে দেখে আমি বেশ বুঝেছি, ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা খুবই ছিল। কিন্তু কবে এবং কোথায় যে সেই ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা' আমার কিছুতেই মনে আস্‌ছে না।

পেছন থেকে বল্লুম, দেবু, তোমার পরণে সব গেরুয়া দেখ্‌ছি—ব্যাপার কি, তুমি কি রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে ঢুকেছো না কি ?

সে একটু হাস্‌লে, কোন উত্তর দিলে না।

খণ্ডগিরি পাহাড়ের ওপোর অনেকগুলি গুহা বা গুম্ফা আছে। এগুলি পাহাড় থেকে কুরে কুরে মানুষের হাতে কাটা গর্ত্ত বিশেষ। এই গর্ত্তের মুখগুলো একএকটি গুহার একএকরকম এবং এই গুহামুখের আকৃতি থেকেই ওদের নামকরণ হয়েছে। পাহাড়ে উঠে প্রথমেই পড়ে বাঘ গুম্ফা, অর্থাৎ, ওই গুহার মুখটা ঠিক্ যেন একটা হাঁ-করা বাঘের মুখের মত।

এই সমস্ত গুহা বোধ হয় দু'হাজার বছরেরও আগে তৈরী হয়েছিল। এখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও শ্রমণেরা বাস করতেন। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। কর্ম্মকর্ত্তার দেহান্তে উৎসবগৃহের অবস্থা যেমন হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গুহার ঐশ্বর্য্যও তেমনি লুপ্ত হয়ে গেছে। এরা এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থাতেই পড়ে আছে। দুপুরবেলা সন্ন্যাসী 'গাইডে'র সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সমস্ত গুহাই আমি দেখেছিলুম।

গভীর রাত্রি। গাছের পাতায় মৃদুমন্দ হাওয়া বইছিল। পাহাড় এবং পাহাড়ী পথ সবই অন্ধকার, কেবল দেবুর হাতে মৃদু একটি আলো ও আমার হাতে ছিল টর্চ লাইট'। এই অজ্ঞাত, অপরিচিত লোকটির সঙ্গে কোথায় এবং কেন যাচ্ছি, সে প্রশ্ন কিন্তু আদৌ মনেও হয় নি।

বাঘগুম্ফা পার হয়ে আর একটু ওপোরে উঠে আমরা হাতীগুম্ফার কাছে এলুম। দেবু একবার পেছন ফিরে আমার দিকে দেখ্‌লে, তারপর একটু দাঁড়িয়ে আমায় পাশে ডেকে নিলে। এখানকার সিঁড়িগুলো প্রশস্ত, দুজনে পাশাপাশি চল্‌তে লাগ্‌লুম।

দেবু বল্লে, অনিল, বল্‌তে পারো তুমি, ওই গুহার ওপোরে কি সব লেখা আছে?

দুপুরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এসে আমি হাতীগুম্ফার গিরিলিপি দেখে গিয়েছিলুম। দেবুকে বল্‌লুম, হ্যাঁ যতদূর শুনেছি, ঐতিহাসিকেরা ওই লেখাটাকে 'খারবেল বা হাতীগুম্ফার গিরিলিপি' বলে থাকেন। ওটা না

কি রাজকুমার খারবেল খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্রাহ্মী অক্ষরে ওইখানে লিখিয়েছিলেন।

দেবু একটু হাস্‌লে। বল্লে, ওতে কি লেখা আছে জানো?

বল্লুম, জানি না। তবে যতদূর শুনেছি, ওতে না কি এই লেখা আছে যে কুমার খারবেল এই পাহাড়ের গুহাগুলি শ্রমণদের থাক্‌বার জন্য দান কর্‌লেন।

কথা কইতে কইতে দেবু ও আমি দু'জনে ওই হাতীগুম্ফার মধ্যেই প্রবেশ করলুম।

সারা পাহাড়খানা যেমন অন্ধকার, এ গুহা ঠিক্‌ সে রকমটা নয়। গুহার অপর মুখে একটা স্থালীর মধ্যে তেল ন্যাকড়া জ্বালিয়ে বেশ বড় একটা আলো জ্বালা হয়েছে।

আলো দেখে একটু আশ্চর্য্য হলুম। বল্‌লুম, কি হে, এখানে আলো!

দেবু বল্লে, আজ যে আমাদের উৎসব। চলো না, অনেকেই এসেছেন, দেখা হবে।

এখানে! অনেকেই এসেছেন!

সে একটু হাস্‌লে।

পাঁচ

মশালের আলো পার হয়ে আমরা ছোট একটা গেট পেলুম। গেটের দু'ধারে দু'টি মঙ্গল কলস বসান আছে। গেটের মাঝখানে ছোট একটা মালসায় করে জ্বলন্ত তেল ন্যাকড়া ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারই আলো এবং ধোঁয়ায় সেই চলন-পথটি ছেয়ে আছে; তবে ধোঁয়াটা নেহাৎ কষ্টকর নয়, তা'তে বোধ হয় যেন চন্দন বা অগুরু এই রকম কিছু একটা দেওয়া আছে। দরজার গড়ন যেন গরুর গাড়ীর একখানা চাকা।

চলন-পথ পার হয়ে একটা চত্বরে এসে পড়লুম। এই চত্বরের দু'পাশে দেওয়ালের গায়ে অনেক সব লতাপাতা, মানুষের মূর্ত্তি ইত্যাদি আঁকা দেখ্‌লুম। মনে হোল, দুপুরবেলা আমার এ সব দেখা হয় নি। দেবুকে সেই কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে সে বল্‌লে, চুপ, আর কোন কথা বলো না।

চত্বরের সবটা একসঙ্গে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, তবে অপর প্রান্তে মনে হোল' যেন কতকগুলি লোক নিঃশব্দে বসে আছে। আলো খুব ভাল রকম নেই, কাছে এসে দেখি নানারূপ পরিচ্ছদের নানারূপ মানুষ দু'ধারে সারি বেঁধে মেঝের ওপোরে বসে আছে। সেই মানুষের সারির পরে একটু উঁচু দুই সারি বেদী আছে, সেই বেদীর শেষে দেওয়ালের গায়ে বেশ উঁচু একটা সিংহাসন। সিংহাসনে কেউই ছিলেন না। দেবু ও আমি দু'জনে গিয়ে ওই মানুষের সারির পাশে সামান্য উঁচু একটা বেদীতে বস্‌লুম।

লোক আছে অনেকগুলি, কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না। সকলের দিকেই দেখ্‌তে লাগ্‌লুম, তারাও আমাদের দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। কেউ কোন শব্দ কর্‌লে না। মনে মনে কেমন একটা ভয় হোল, কারা এরা,

কি এদের উদ্দেশ্য? এরা কি ডাকাতের দল? তবে কি দেবু এসে 'চট' করে মাথায় এল, না, এই বোধ হয় 'টেরোরিষ্টে'র সংঘ। দেবু হয় ত বোমার দলের লোক এবং হয় ত আমাকেও এদের দলে নেবার জন্যে—

কথাও কইতে পারছি না এবং এখান থেকে পালানও সম্ভব নয়। কিন্তু বোমার কথা মনে হতেই দারুণ আতঙ্ক হোল'। নিরীহ লোক, গভর্ণমেণ্টের অফিসে কেরাণীগিরি করি, ইচ্ছে আছে ধরে-করে ছোট ভাইকেও অফিসে ঢোকাবো, এমন সময় বোমার দলে ঢোকা, যদি পুলিস একবার টের পায় যে—

দেবুর দিকে চাইতেই সে তার ঠোঁটের ওপোর আঙুল দিলে। ইঙ্গিত হোল, চুপ।

নিতান্ত বিপদে পড়ে নীরবেই রইলুম।

আমাদের মত আরও কয়েকটি লোক এল। তেমনি নিঃশব্দেই এসে ওরা এক একটা জায়গা নিয়ে বস্‌লো।

দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট কুলুঙ্গী ছিল। একটা লোক একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে করে নিয়ে এসে ওই সব কুলুঙ্গীতে একবার করে ঠেকিয়ে দিলে। কুলুঙ্গীতে বোধ হয় মশাল ছিল, সেগুলো সমস্তই জ্বলে উঠ্‌লো। ঘরের মধ্যে প্রচুর আলো হোল'।

এবার ঘরখানা ভালো করে দেখলুম। প্রকাণ্ড ঘর, ঘরের মেঝেয় অসংখ্য লোক বসে আছে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও ঘরের মাঝখানে বেশ প্রশস্ত স্থান। সিংহাসনের দু'পাশেই বেদী। বাঁ পাশের বেদীতে আমরা বসে আছি। আমাদের সাম্‌নের বেদীতে চাকচিক্যময় ভূষণে অনেকগুলি লোক বসেছিল। সিংহাসন খালি। সিংহাসনের দু'পাশে দু'টি সামান্য উঁচু ছোট ছোট আসনও খালি ছিল।

ভয় ও ভাবনায় 'কাঠ' হয়ে গিয়েছি। এরা কারা, কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তার কোন আভাষই এখনও পর্য্যন্ত পেলুম না।

হঠাৎ যেন ঘরের সমস্ত লোকগুলি উদ্বেল হয়ে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। প্রবেশপথের ওপোরে এক অদ্ভুত বাজ্‌না সুরু হোল। জয়বাদ্যের মাঝখানে কতকগুলি লোক এসে ওই ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লেন।

প্রথমেই যিনি আস্‌ছিলেন, তাঁর বিরাট্ শরীর, মাথাটি আগাগোড়া কামানো, অলঙ্কারশূন্য দেহ, কিন্তু কানে বড় বড় কুণ্ডল আছে, পরণে গেরুয়া রংয়ের ধুতি। মনে হোল', লোকটি যেন পাথরে আঁকা বুদ্ধমূর্ত্তিকে অনুকরণ করে তাঁর নিজের শরীরখানি গড়ে তুলেছেন।

তার দু'পাশে আসছেন দুই সৌখীন পুরুষ। একজন বয়স্ক, অপর জন অল্প বয়সী। তাঁদের দেহ অনাবৃত হলেও আভরণের আড়ম্বর যথেষ্টই ছিল। মাথায় মুকুট এবং কোমরে তরোয়াল দেখে মনে হোল, তারা বোধ হয় কোন রাজা হবেন। কিন্তু সকলেরই চেহারার মধ্যে মধুর একটা জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য ছিল।

ধীরে ধীরে সকলেই এগিয়ে এলেন। তোরণের বাজনা তখনও তেম্‌নিই বাজ্‌ছিল। ঘরের সমস্ত জনতাই দাঁড়িয়ে ছিল, আমিও দাঁড়িয়ে ছিলুম, সকলেই ঘাড় হেঁট করলে, আমি ঘাড় হেঁট কল্লুম। সাম্‌নের বিরাট্ পুরুষ ধীরপদে সিংহাসনে গিয়ে বস্‌লেন। দু'পাশে দু'জন রাজপুরুষ এবং সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা আশেপাশে বোধ হয় যেন নির্দ্দিষ্ট আসনেই বসে পড়্‌লেন।

তাঁদের বসার সঙ্গেসঙ্গেই সমস্ত ঘর থেকে মধুর এক রোল উঠ্‌লো। অতি ধীর ও মৃদুকণ্ঠে সমস্ত লোক যেন একসঙ্গে গাইতে লাগ্‌লো—

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

গানের সুর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়ে ঘরের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌লো এবং সেই প্রতিশব্দ বন্ধ হবার পূর্ব্বেই সেই জনসংঘ আর একটু উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠ্‌লো—

দুতিয়ং চ বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

এবং তারপর বল্লে, ততীয়ং চ বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি ইত্যাদি। তারপর সকলেই ধীরে ধীরে বস্‌লো।

অবাক্ হয়ে ওদের ক্রিয়াকলাপ দেখছি। দেখি, তিনটি মেয়ে মাথার চুলগুলো এলো করে বাঁধা, বুকে কাঁচুলি, কোমরে নীবিবন্ধ, চন্দ্রহার, কণ্ঠে বলয়, হাতে নানারূপ গহনা, পায়ে নূপুর, নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলনপথ দিয়ে সিংহাসনের সাম্‌নে এগিয়ে আস্‌ছে। মাঝখানের মেয়েটি সব চেয়ে লম্বা, দু'পাশের দু'টি তার কাঁধের সমান। আধা সংস্কৃত ভাষায় কি যেন গান গাইতে লাগ্‌লো। আর সেই সঙ্গে নাচ। উদয়শঙ্করের নাচও আমি কল্‌কাতায় দেখেছিলুম, কিন্তু এ নাচের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। ঘরের মাঝখানে ওরা তিনজনে নাচ্‌তে লাগলো, কোথা থেকে মৃদঙ্গ এবং তারের যন্ত্রাদি ওদের নাচের সঙ্গে সঙ্গত করতে লাগ্‌লো। ওদের গানের অর্থ বোধ হয় সিংহাসনের মহাপুরুষকে প্রণতি দেওয়া। নাচের ভঙ্গীতেও ওরা ওই প্রণামটাকে বেশ করে ফুটিয়ে তুল্‌ছিল।

গভীর রাত্রিতে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে এই বিরাট আয়োজন যে কাদের, কি ব্যাপার, কিছুই বুঝ্‌লুম না। অথচ, পাশের লোকেদের জিজ্ঞাসা করারও উপায় নেই। অবাক্ হয়ে বসে বসে দেখা ছাড়া কোনই গত্যন্তর ছিল না।

দলে দলে এম্‌নিধারা মেয়েরা এসে প্রণাম জানিয়ে গেল। তারপর আমাদেরই লাইনে ওই মহাপুরুষের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট এক গেরুয়াধারী প্রৌঢ় উঠে এগিয়ে এলেন মহাপুরুষের সাম্‌নে। মনে হোল, তিনি যেন কিছু বলতে চান্‌। বল্লেনও বটে। প্রথমেই তিনি সিংহাসনের লোকটিকে নমস্কার কল্লেন। তারপর আধা-সংস্কৃত ভাষায় সুন্দর সুললিত কণ্ঠে বক্তৃতা করতে আরম্ভ কল্লেন। কি যে বল্লেন, ঠিক্‌ বোঝা গেল না, কিন্তু বড় মধুর লাগ্‌লো তাঁর বলবার ভঙ্গী ও উচ্চারণ।

তন্ময় হয়ে শুন্‌ছি, এমন সময় সাম্‌নে নজর পড়ে গেল,—দেখি আমার ছোট ভাই সুনীল একটা আসনে অপর সকলের মাঝখানে গম্ভীর হয়ে বসে আছে!

সু—

আর একটু হ'লই চীৎকার করে উঠেছিলুম। কি পাজী ছেলে! পরীক্ষা আছে বলে আমি ওকে আমার সঙ্গে আন্‌লুম না, আর লেখাপড়া ছেড়ে আমার কথা অমান্য করে—

নিস্ফল ক্রোধে মনে মনে গর্জ্জন করা ছাড়া কোন উপায় নেই। গভর্ণমণ্টের অফিসে আমি ওর জন্যে চেষ্টা কর্‌ছি, আর ও কি না এই সব সংঘে এসে ঘোরে! এইটুকু বয়সেই ও কি না এই সমস্ত 'প্রাইভেট সোসাইটি'র 'নাইট ক্লাবে'র সভ্য হয়ে উঠেছে! এক সপ্তাহ পরে যার পরীক্ষা, সে কি না—যাক, যা' হবার তাই হবে! কতক্ষণ যে এইভাবে বসেছিলুম, জানি না। হঠাৎ একটা অত্যন্ত গম্ভীর স্বর এসে আমার কানে লাগ্‌লো। মানুষের কণ্ঠে যে এরূপ মাধুর্য্যপূর্ণ স্বর সম্ভব, তা' আমার কোনদিন ধারণাই ছিল না।

চেয়ে দেখি, সিংহাসনের ওপোর থেকে মহাপুরুষ আমাদেরই লক্ষ্য করে বলছেন। তাঁর স্থির নিস্পন্দ শরীর, মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল দীপ্তি, কণ্ঠ-

নিঃসৃত অভূতপূর্ব্ব বাণী এই তিনের সমন্বয়ে যেন এক লোকাতীত মহিমার প্লাবনে আমার মত স্বার্থপরের মধ্যেও অপৌরুষেয়ত্ব এনে দিয়েছিল।

উদাত্ত কণ্ঠের বাণী এল, "পাণাতিপাতা বেরমণি"।*

মনে হোল, যেন আমার অস্থি-মজ্জায় অহিংসার শীতল স্পর্শ এসে অননুভূত শান্তিতে আমার হৃদয় পূর্ণ করে দিলে। মন্ত্রের প্রভাব যে এতদূর হতে পারে, তা' আমি ইতিপূর্ব্বে ভাব্‌তেই পারি নি।

প্রথম শীলের সুরটি ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে মিশিয়ে গেল। শ্রোতৃবর্গের মনের মধ্যে ওই সুরের ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি পুরোপুরি মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই মহাপুরুষের কণ্ঠ থেকে দ্বিতীয় শীল নিসৃত হোল, "অদিন্নদানা বেরমণি।"

মহাপুরুষের স্বর-লহরী এমনি করেই সেদিন উপভোগ করেছিলুম।

দশশীল দানের পর দেখ্‌লুম, ঘরের শেষ দিক্ থেকে সকলেই একে একে উঠ্‌তে সুরু করেছে। তারা সবাই গিয়ে ওই মহাপুরুষকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে পেছনের কোনো একটা অজ্ঞাত দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে আমার পাশের লোকেরা দল বেঁধে চলে গেল, তারপর দেবু আমায় ইঙ্গিত কর্‌লে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে উঠ্‌লুম এবং সিংহাসনের ধারে গিযে প্রণাম করলুম।

মহাপুরুষ আমার মাথার ওপোরে একটি হাত দিলেন; যেন আমার শরীরের সমস্ত ভার কেটে গেল।

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, প্রশান্ত বদন। সম্ভ্রমে দৃষ্টি নত

* বৌদ্ধধর্ম্মে এইরূপ দশটী শীল আছে; তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি সকলেরই পালনীয়। একত্রে দশটিই কেবলমাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য।

হোল'। কানে এল তাঁর বল্লেন, দশশীল তোমায় আয়ত্ব হউক।

পাশের সিংহাসন থেকে অল্পবয়স্ক রাজা আমার দিকে চেয়ে দেখে একটু হাসলেন। অপর পার্শ্বের প্রৌঢ় রাজা আমার দিকে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। মনে হোল, তাঁর চোখের কোণে বুঝি অশ্রুবিন্দু জমে রয়েছে। তিনি কিন্তু আমায় স্পর্শও কল্লেন না, কোনও কথাও বল্‌লেন না।

ছয়

দেবু ও আমি দু'জনেই বেরিয়ে এলুম। ভাই আমার তখনও ওই ঘরের মধ্যেই ছিল, কিন্তু তার কথা সে সময় মনেও পড়্‌লো না। ভয় ও বিস্ময়ে, এমন কি আত্মচিন্তারও অতীত হয়ে ঠিক্ কোন্ পথ দিয়ে মনে নেই ছোট একটি গর্ভ-গৃহের মধ্যে এসে প্রবেশ কর্‌লুম। দেবু আমার সঙ্গেই ছিল।

দেবুর সেই ঘরখানির একধারে ছোট একটী বেদী। তার ওপোর একখানি গাছের ছাল, সেই ছালের ওপোর একখানি পরিষ্কার গেরুয়া কাপড় পাতা ছিল, দেখ্‌লেই মনে হয় ওটি সন্ন্যাসীর শোবার বিছানা।

দেবু এসে ওই বিছানার ওপোর বস্‌লো। আমিও ওই বিছানায় বস্‌তে যাবো, সে তখন বাধা দিলে, বল্লে, এই শয্যাটা আমার নিজস্ব, এটা তোমার ছোঁয়া উচিত নয়, তুমি ওই ও-পাশে বসো।

পাশেই একটা টুলের মত বড় পাথর ছিল। তার ওপোরেই আমি বস্‌লুম।

আমার দিকে চেয়ে দেখে দেবু বল্লে, অনিল, কি দেখ্‌লে ?

বল্‌লুম, জানি না।

—জানো না, তবে শোনো। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ো না, স্বপ্ন বলে মনে করো না। ওই মহাপুরুষ যাঁকে তুমি মাঝখানে দেখ্‌লে, উনি হলেন গুরু, তথাগত, আর ওই মহাপুরুষের দু'পাশে যে দু'জন পুরুষ ছিলেন ওঁদের মধ্যে প্রৌঢ় যিনি, তিনি হলেন মহারাজ ইন্দ্রসেন, যিনি নিজের অর্থ এবং আয়োজনে ভুবনেশ্বর শহর নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন, আর একজন কুমার খারবেল, যিনি ওই হাতীগুম্ফায় গিরিলিপি লিখিয়েছিলেন।

নিদারুণ বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেলুম! এ কি বিশ্বাসজনক কথা? বল্‌লুম, বলো কি হে, তাঁরা ত বহুকাল পূর্ব্বেই গতাসু হয়েছেন!

—গতাসু হতে পারেন, কিন্তু সাধনা ত কখনও লুপ্ত হয় না; তাই তাঁরা প্রতি বৎসর নির্দ্ধারিত তিথিতে একবার করে এসে এখানকার ধর্ম্মচক্রকে অক্ষুণ্ণ রাখেন।

বল্‌লুম, অসম্ভব! আর এও অসম্ভব যে, সমস্ত ঐতিহাসিক লোকগুলো একসঙ্গে এসে মিলিত হবে। খারবেল খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক, আর ইন্দ্রসেন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর—

দেবু একটু হাস্‌লে। বল্লে, মৃত্যুর পর স্থানের কোন ব্যবধানই থাকে না। দেহমুক্ত আত্মা যে কোন স্থানেই ইচ্ছামত যেতে পারে। তারপর সেই আত্মা যখন উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, তখন তার কালের ব্যবধানও ঘুচে যায়। যে কোন যুগের আত্মা যে কোন যুগের মধ্যেই তখন ইচ্ছামত যেতে পারে; তারপর যখন সে নির্ব্বাণ লাভ করে, তখন তার পাত্রাপাত্র জ্ঞানও আর থাকে না। স্থান, কাল ও পাত্র এই যে তিনের সমন্বয়ে মানুষ, নির্ব্বাণের পরে ওই তিনই লুপ্ত হয়ে যায়। এখানে এই ধর্ম্মচক্রে যাঁরা আসার উপযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই স্থান ও কালের অতীত।

বল্‌লুম, তাই না কি, তবে যে আমি এসেছি!

দেবদত্ত হেসে উঠলো। বল্লে, তুমি এসেছ কুমার খারবেল ও মহারাজ ইন্দ্রসেনের অনুরোধে। মনে নেই, তুমি ছিলে কুমার খারবেলের প্রধান বন্ধু। খারবেলের গিরিলিপি কে লিখেছিল, সে ত তুমি।

—আমি! হাতীগুম্ফার বিখ্যাত গিরিলিপি আমারই হাতে খোদাই হয়েছে! সেই জন্যই কি তুমি ওই গিরিলিপির কথাটা আমাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলে?

—না। তোমার হাতে খোদাই এটা নয়, তবে তুমি ওই ভাষাটা

রচনা করে দিয়েছিলে। তুমি তখন এখানকার পুথি-রক্ষক ছিলে। সে বিষয়ে তোমার কিছু মনে আছে কি না জান্‌বার জন্যেই তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তুমি এ পাহাড়ে আজ প্রথম আস্‌ছো কি না ?

দেবদত্তের প্রত্যেক কথার মধ্যে রহস্য আছে। সে আবার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, আচ্ছা, ভেবে দেখো দেখি, ইন্দ্রসেনকে এর আগে কখনও দেখেছো বলে মনে হয় কি ?

জোর করে কিছুই বল্‌তে পারি না, বল্লুম, কি জানি, এখন আমার ভাব্‌বার মত অবস্থা একেবারেই নেই।

আবিষ্টের মত দেবদত্ত বল্‌তে লাগ্‌লো, বল্লে, তুমি বহুবার বহুজন্ম এই পৃথিবীতে এসেছ ; তোমার অনেক জন্মের সঙ্গে এই পাহাড়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। তোমার ভাই অনেকবারই তোমার আত্মীয় বা বন্ধু হয়ে জন্মেছে। তোমার কাছে এ পৃথিবী পুরাতন, তোমার এই আসা-যাওয়া পুরাতন, তোমার চিন্তা এবং ধারণা পর্য্যন্ত সেই পুরাতন প্রণালীতেই অব্যাহত রয়েছে। ইন্দ্রসেন তোমার এক জন্মের পিতা।

—পিতা ! কই, আমার ত সেই পিতৃস্নেহ স্মরণ নেই ?

—স্নেহ নীচগামী। তোমার মনে নেই, কিন্তু ইন্দ্রসেন তোমার স্বপ্নমূর্ত্তি দেখে খুসী হবেন না বলেই দেহধারী তোমাকে এখানে এনে যে অভিনব উপায়ে আটক করে রাখা হয়েছিল, সে শুধু ইন্দ্রসেনের দেখার জন্য।

মহারাজ ইন্দ্রসেন যার পিতা, কুমার খারবেল যার বন্ধু, সে হোল' অফিসের হতভাগ্য কেরানী ! হায় রে !

কিন্তু শুন্‌তে বড় ভাল লাগ্‌লো, বল্লুম, দেবু, ব্যাপারটা একটু খুলে বলো না ভাই, শুনি।

সে বল্লে, অনিল, আজ আমার আর সময় নেই ভাই ; আচ্ছা, আর একদিন এ বিষয় বল্‌বো, কেমন ?

—আর একদিন, আবার কি কখনও দেখা আমাদের হবে ?

—নিশ্চয়ই।

বললুম, আচ্ছা, আমার ভাই সুনীলকে যে সভায় দেখ্‌লুম। সে কি করে এখানে এল ?

—সে ত দেহ নিয়ে এখানে আসে নি। তার নিদ্রামগ্ন অচৈতন্য দেহখানা তোমার কল্‌কাতার বাড়ীতে যথাস্থানেই পড়ে আছে। কেবল মিলনের তিথি বলে আত্মা আর স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে নি। তথাগতের আকর্ষণে সে এই মিলন-বাসরে ছুটে এসেছিল। আশীর্ব্বাদ নিয়ে সে এতক্ষণে দেহের মধ্যেই ফিরে গেছে। তোমাদের ভাষায় এ হোল এক রকম স্বপ্ন।

—তাই না কি! তবে কি স্বপ্ন সত্য ? এ সব কি তার মনে থাকবে ?

—স্বপ্নের সবগুলো সত্য না হলেও কতকগুলো যে সত্য, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই,—তবে মনে থাক্‌বে কি না বল্‌তে পারি না। সেটা তার এ জন্মের মস্তিষ্ক নামক যন্ত্রের গ্রহণ ও ধারণা শক্তির ওপর নির্ভর করে। তার মস্তিষ্ক যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হ'লে আত্মার কাছ থেকে সে এই ছায়াটুকু যথাযথ গ্রহণ ক'রে নিদ্রাভঙ্গের পরেও দর্পণের মত ছায়াটিকে হুবহু দেখ্‌তে পাবে, না হয় ত সামান্য আভাষ মাত্র মনে থাক্‌বে। সম্ভবতঃ, সে বল্‌বে কত কি স্বপ্ন দেখ্‌লুম, কিছুই মনে নেই।

বল্লুম, দেবু, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি-করি করেও কর্ত্তে পাচ্ছি না, বলবে কি ?

সে বল্লে, বলবো। আমার সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল, এই ত জান্‌তে চাও ? শোনো। তোমার সঙ্গে আমার এইখানেই আলাপ। তুমি এবং আমি বহুবার বহুজন্ম এই গুহায় একসঙ্গে কাটিয়েছি। তুমি যেবার এখানে শিষ্য ছিলে, সেবার আমি ছিলুম

তোমারই গুরুভাই। তুমি যেবার পুথিশালার রক্ষক ছিলে, সেবার আমি ছিলুম তোমারই অধীনস্থ পুথিলেখক, তুমি যেবার বৌদ্ধভিক্ষু হয়ে জন্মেছিলে, সেবার আমি ছিলুম এখানকার শ্রমণ; এইভাবে তুমি ও আমি বহুদিন একসঙ্গেই ছিলুম। তবে আমি এই ধর্ম্মচক্রের বাইরে কখনও জন্মগ্রহণ করি নি; তুমি অনেকবার অনেক জায়গায় জন্ম নিয়েছে। কারণ, তোমার মধ্যে কর্ম্মপ্রবণতা আছে, তোমার মধ্যে রাজসিকতার মাত্রা বেশী, কিন্তু আমার মধ্যে সেইটে একেবারেই নেই।

মনে মনে আমার এই রাজসিকতার ওপোর এত রাগ হোল! কি আমরা রাজসিক কাজটা কচ্ছি রে! সারা জীবন ওপরওয়ালার খোঁচা খেয়ে খেয়ে প্রাণটা গেল, বলে কি না তোমার রাজসিক গুণ আছে!

ইচ্ছা করে নয়, দীর্ঘনিশ্বাস আপনা হতেই বেরিয়ে এল, বল্লুম, যাক্ গে, এখন তুমি আছ কোথায় বলো, করই বা কি?

সে বল্লে, আমার ত কোন কাজ নেই, এখন আমার ছুটী।

—আছ কোথায়?

—এইখানেই থাকি। পরে আমার দিকে চেয়ে দেখে অল্প হেসে বল্লে, আচ্ছা ভাই, এখন তবে এস; আমার ত কাজের সময় ফুরিয়ে গেছে, এবার আবার বিশ্রাম করি। তারপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্‌লে, ওই তোমার দরজা। ওইখান দিয়ে সন্ন্যাসীর কুটীরে তুমি চলে যাও। কাল সকালে 'বাইকে' করে ফিরে যেও।

বড় দুঃখ হোল। তথাগতের দর্শন পেয়েও আবার সেই অফিসের চেয়ারটাতে ফিরে যেতে হবে!

সে বল্লে, ভয় নেই। বছরে একবার করে তোমার সঙ্গে আমাদের এইভাবে দেখা হবে এবং তের বৎসর পরে আমরা সবাই মিলে গিয়ে তোমায় যত্ন করে নিয়ে আসবো। আচ্ছা ভাই, এস।

শয্যার ওপোর দেবদত্ত স্থির হয়ে শুয়ে পড়লো। তার লণ্ঠনের আলোটা ক্রমে ম্লান হয়ে এল, সেও যেন ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে পাণ্ডুর হয়ে শয্যার সঙ্গে মিশিয়ে যেতে লাগ্‌লো।

চারিদিকের কঠিন স্তব্ধতা, ম্লান হতে ম্লানতর হচ্ছে দেবদত্তের ওই আলো। 'চট্' করে আমি আমার 'টর্চ'টা জ্বাল্‌লুম, দেবু, দেবদত্ত!

কোন উত্তর নেই, পাথরের ছোট ঘরের মধ্যে আমারই কণ্ঠস্বর চতুর্দ্দিকে আহত হয়ে গর্জ্জন করে উঠ্‌লো।

দেবুর দেহে আর মাংস বা চাম্‌ড়া বলে কিছুই নেই। কালো পাথরের ওপোর কীটবহুল জীর্ণ এক মানুষের কঙ্কাল। দু' মিনিট আগে যে আমার সঙ্গে কথা কইছিল, সে একটা বীভৎস ভয়াবহ মূর্ত্তি!

আশেপাশে চেয়ে দেখ্‌লুম। গলা থেকে ঠোঁট অবধি সমস্ত শুকিয়ে 'কাঠ' হয়ে গেল। ক্ষুদ্র সমাধির মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়াবারও উপায় নেই। কঠিন পাথরের গুহার মধ্যে নির্ম্মম স্তব্ধতায় বহু শতাব্দীর সঞ্চিত মৃত্যু যেন অন্ধকারে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। পেশীতে আমার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পাথরের দেওয়ালে হয় ত মাথা ঠুকেই মরতে হতো, হঠাৎ যেন কোথা থেকে কে আমায় সাহায্য কর্‌লে। ছোট একটা গহ্বর আমার সাম্‌নে দেখ্‌তে পেলুম। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কি করে যে সেটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, তা' আমার একেবারেই মনে নেই। বাইরে এসে ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে আমি যেন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হলুম।

চারিদিকে অসংখ্য পাথর পড়ে আছে। মাথার ওপর নক্ষত্রবহুল নীল আকাশ। অমাবস্যার রাত্রি হলেও অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার দরুণ কিছু কিছু আলো আমার চোখে লাগ্‌ছিল।

দূরে আর একটি মানুষ দেখ্‌লুম, সন্ন্যাসী। সে আমার কাছে এসে

বিস্মিত হয়ে বল্লে, এ কি বাবু, শ্রমণদের সমাধি-স্থানে এই রাত্রে আপনি এসে ঘুরছেন কেন?

তাকে আর কি উত্তরই বা দেব? বল্লুম, তোমার তিথি-পূজা হোল?

সে বল্লে, হ্যাঁ। পূজা শেষ করেই মনে হোল, আপনি বাইরে একা আছেন, আপনাকে ঘরে নিয়ে যাই। বেরিয়ে আপনাকে দেখ্‌তে না পেয়ে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এইখানে এসেছি। চলুন।

চলো।

মূর্ত্ত-স্মৃতি

এখানকার কোন লোকের সঙ্গেই আমার বনে' না।

এ মানুষগুলো যেন কি একরকম! খনির কাজই এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, নেশা করাই কেবল এদের একমাত্র আনন্দ, সাঁওতালী ও বেহারী মেয়ে নিয়েই এদের যত কিছু উৎসাহ। জীবনটাকে এই তিনটে ভাগে ভাগ করে প্রাত্যহিক বাঁধা কাজ এবং বাঁধা রসিকতার মধ্য দিয়েই এরা বছরের সব ক'টা দিন কাটিয়ে দেয়।

এখানকার চাটুয্যে একজন সেকালের আমলের মজ্‌লিসী লোক। প্রথম যখন এই খনিটার কাজ সুরু হয়, তখন সে এখানে চাকরী নিয়ে আসে, তারপর এই খনির সাহেব মালিক মারা যাওয়ার পর খনিও যেমন হাত বদ্‌লেছে, চাটুয্যেও তেমনি নতুন নতুন মনিবের কাছে চাকরী করেছে! গোড়া থেকে কেবল সেই একমাত্র এই যায়গাটায় টিঁকে আছে।

ক'মাস পূর্ব্বে আমি যেদিন গিরিডির অভ্রের খনিতে চাক্‌রী নিয়ে আসি, সেদিন আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় এই চাটুয্যের। কল্‌কাতার অনেক বড় বড় লোকের নাম সে জানে। সেখানে জন্মে এত বড় হওয়ার পরও আমি কলকাতায় কারও সঙ্গে কোন রকম আলাপ জমাতে পারি নি শুনে চাটুয্যে আমার সম্বন্ধে কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়্‌ল। শেষে শিশুজ্ঞানে হঠাৎ আমার সঙ্গে 'তুমি' বলে কথা কইতে সুরু করে দিলে।

আমার অবশ্য এখানকার আবহাওয়া একেবারেই ভাল লাগে না। কিন্তু কলকাতায় ফিরে যেতেও আর ইচ্ছে করে না। সেখানে আমার দম্ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল বলেই ত আমি সেখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই খনিতে অজ্ঞাত-বাস কর্‌তে এসেছি।

দুই

গিরিডি থেকে যে রাস্তাটা বরাবর পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তার ধারে গোটাকয়েক অভ্রের খনি আছে। তারই একটাতে আমার চাক্‌রী। আমার কাজ খনিতে এবং বাইরেও কিছু কিছু আছে। কোম্পানী আমায় একটা ছোট মোটর গাড়ী দিয়েছে, আর একটা 'কোয়াটার্স' দেবার কথা আছে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তা' দিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। বিপত্নীক চাটুয্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তারই 'কোয়াটার্সে'র একটা অংশে আমি এখন বাস কর্‌ছি।

খনিতে যখন কাজ থাকে, তখন করি, তা' ছাড়া দিন আর আমার কাট্‌তেই চায় না। কি যে করি, কিছুই ঠিক পাই না। আমার সঙ্গে একটা 'বাইনাকুলার' আছে। অবসর সময়ে সেইটাতেই চোখ দিয়ে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকি। অসমতল বিরাট প্রান্তর আমার দৃষ্টির সাম্‌নে, মাঠের শেষে সব ছাই-রংয়ের ছোট ছোট পাহাড়। পৃথিবী যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে সেখানে আপনাকে এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে। আমার মনে হয়,আমি এই পল্লী-প্রকৃতিকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি। আবার কিন্তু সময় সময় দারুণ বিরক্তি এসে আমার এই জীবনটাকে হতাশায় ভরে তোলে।

তবে এখানে ওই ছোট গাড়ীটা আছে আমার সহায়। একদিন গেলুম আমি এখান থেকে উশ্রী দেখ্‌তে। সুন্দর ঝর্‌ণা। এর আগে আমি অনেক ঝর্‌ণাই দেখেছি, কিন্তু উশ্রীর প্রান্ত থেকে বিসর্পিত নদীর উপলময় শয্যার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করলুম, তখন মনে একটা প্রকৃত আনন্দ পেলুম। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বল্‌তে হয়, 'কাননকুন্তলা' কুমারী ধরণীর

নির্ম্মল সিঁথির মত এই উশ্রী নদীর গতিপথ দিগন্ত-প্রসারি অরণ্যের মাঝখান দিয়ে সরল রেখায় নেমে এসেছে, হাস্যময়ী বালিকার ন্যায় মুখর ও উচ্ছল হয়ে।

সেখানে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের অনাবিল বায়ুঃস্রোত ও পতনশীল বারিরাশির একতান শব্দে জনসমাগমশূন্য উশ্রী আমার বড়ই ভাল লাগ্‌ল।

কিন্তু প্রথম দিন আমি যেমন আনন্দ পেলুম, দ্বিতীয় দিন আর সে রকম পাই নি, এবং তারপর দিন উশ্রী যাওয়ার কোন উৎসাহই আর রইল না। গিরিডি থেকে উশ্রী মাত্র ন' মাইল। মোটর বলে জিনিষ যদি আমার হাতের কাছে না থাক্‌তো, যদি উশ্রী দেখার জন্য আঠার মাইল পথ আমায় পায়ে হেঁটেই যেতে আস্‌তে হতো, তা' হলে হয় ত তার প্রতি আকর্ষণ আমার আরও কিছুদিন স্থায়ী হতে পারতো, হয় ত তাকে আমি আরও কিছুদিন একাদিক্রমে ভালবাস্‌তেও পার্‌তুম!

তিন

রোজই মনে হয় নতুন কিছু দেখ্‌তে যাবো, কিন্তু যাই কোথায় ?

চাটুয্যে বল্লে, বিজয়, তুমি কি কখনও পরেশনাথ পাহাড় দেখেছো ?

বল্‌লুম, না, দেখি নি।

বল্লে, যাও না একদিন। আমাদের এই 'কোয়াটার্সে'র সাম্‌নে দিয়ে যে পথটা বরাবর ওইদিকে চলে গেছে, ওটা ধরে প্রায় বাইশ মাইল গেলে পরেশনাথ পাহাড়ের গোড়ায় পৌছুবে। আর যদি হাজারীবাগ যেতে চাও, তা' হলে ওই রাস্তায় যেতে যেতে দেখ্‌বে ডান হাতে অন্য একটা পথ গেছে, সেইটে ধরে যেতে পারো। তবে হাজারীবাগ যাবার চেষ্টা করো না; কারণ পাহাড়ী-রাস্তায় নতুন গাড়ী চালাচ্ছ, রাস্তাটা বড় গোলমেলে।

বল্লুম, আচ্ছা, এক সময় সুবিধে মত যাবো।

অভ্রের খনিগুলো পেছনে রেখে, প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখান দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় মোটর ছুটিয়ে বাঁ হাতে থানা ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়্‌লুম। খাড়াই রাস্তায় বরাবর গাড়ীখানা চালিয়ে আপন মনে গান গাইতে গাইতে ডান হাতে হাজারীবাগ ছেড়ে একটা পাহাড়ের গা ঘেঁসে গোল হয়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। এমনি করে দুটো পাহাড় পার হতেই প্রকাণ্ড পাঁচিলের মত গুল্মে ঢাকা পরেশনাথ আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো।

সেখানে গিয়ে গাড়ী থেকে নাম্‌লুম। সাম্‌নে পরেশনাথের গা বয়ে লাল কাঁকর দেওয়া রাস্তা লাল পিঁপ্‌ড়ের সারির মত সবুজ গুল্মের মাঝখান

দিয়ে এঁকে বেঁকে বরাবর ওপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের মুখে জৈনদের দু'টি ধর্ম্মশালা, একটি শ্বেতাম্বরীর, অপরটি দিগম্বরীর। দু'টিই পাথরের তৈরী এবং উভয়ের মধ্যেই মন্দির আছে। ধর্ম্মশালার পেছনে পাহাড়ী থালের দিকে মুখ করে বেহারীদের থাবারের দোকান। বালি ও কাঁকরের ভেতর থেকে কৃশকায় গরুগুলো ঘাসের সন্ধানে ব্যস্ত। জৈনদের দুটো হাতী বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে আপনমনেই গলাধঃকরণ কর্‌ছিল।

খানিকটা ঘুরে-ফিরে আবার গাড়ীতে এসে বস্‌লুম।

পরেশনাথ পাহাড়ে উঠ্‌তে গেলে ভোরবেলা যাত্রা কর্‌তে হয়, এবং ওপরটা সব ঘুরে নাম্‌তে একটি দিন পূরো লাগে, তাই আর ওপরে আমার ওঠা হলো না। যেমন গিয়েছিলুম, তেম্‌নি চলে এলুম।

হাজারিবাগ রোড ছাড়িয়ে, থানা পার হয়ে আস্‌বার সময় দূর থেকে একটা বাড়ী আমার চোখে পড়্‌লো। রাস্তাটা যেখানে গোল হয়ে ঘুরে গেছে, সেইখানে পথের ধারে উঁচু টিবির ওপর টালিখোলার একতোলা একটি ছোট বাংলো। তার চারিদিকেই উদ্যান। তারের বেড়া দিয়ে বাগানটি ঘেরা। ছোট একটি কাঠের গেট আছে। সাম্‌নে তার গোটা কয়েক সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে রাস্তা থেকে ফটক পর্য্যন্ত উঠ্‌তে হয়!

আশপাশে কোথাও কোন লোকালয় নেই। গুরুভার নীরবতার মাঝখানে এই বাড়ীখানি বড়ই মনোরম—যেন দিগন্তের প্রহরায় মৌনমূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত কাল ধরে।

বাংলোখানি দেখ্‌লে মনে হয় এর মালিকের সৌন্দর্য্যবোধ আছে। ঘরের প্রত্যেকটি জান্‌লায় ধপ্‌ধপে সাদা সিল্কের পর্দা ও সাম্‌নের দেওয়ালে লতানে ফুলগাছ লাগানো। বাড়ীটার সমস্ত দেওয়াল-ভর্ত্তি শাদা ও লাল ফুলের সমাবেশ বড় মনোরম। ছোটবড় ফুল ও ফলের গাছে সেই পাহাড়ী বাগানখানি যেন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আলো করে আছে।

জান্‌লার ধারে একখানা ইজিচেয়ারে একজন সাহেব বসে আছেন। বয়সে বুড়ো হলেও তাঁর মুখে চোখে কেমন একটা লালিত্য আছে। মাথার সাম্‌নে অল্প একটু টাক। গায়ে একটা ধপ্‌ধপে শাদা সিল্কের সার্ট।

তাঁর বাংলোর ফটকের সাম্‌নে দিয়ে ঘুরে যাবার সময় হঠাৎ মনে হলো কোন একটা লোহার জিনিষ মোটর থেকে 'ঠং' করে রাস্তায় পড়ে গেল।

গাড়ী থামিয়ে পথে নেমে পড়্‌লুম।

বেলা প্রায় চারটে। সূর্য্যের তেজ তখনও কমে নি। রাস্তায় নেমে যতটা দেখা যায় লক্ষ্য করে দেখ্‌লুম, খানিকটা দূরে আমার 'হুডে'র 'বাকল্'টা খুলে পড়ে আছে।

এগিয়ে গিয়ে সেটাকে তুলে নিয়ে ফিরে আস্‌ছি, দেখি সেই সাহেব তাঁর প্যাণ্টের পকেটে হাত ভরে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে দেখে স্নেহভরে হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি সেই রোদ্দুরের ভেতরই গেট্ পার হয়ে এগিয়ে এলেন এবং কাছাকাছি। এসেই পরিষ্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আমায় তিনি কোন সাহায্য কর্‌তে পারেন কি না।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সাহেবকে বল্লুম, না, আমার এই 'বাকল্'টা পড়ে গিয়েছিল, তাই কুড়িয়ে নেবার জন্যে মোটর থামিয়ে নেমেছিলুম।

তিনি কিন্তু তবু আমার গাড়ীর কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাহেবকে দেখে অবধি প্রথম থেকে আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন কোথায় তাঁকে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে যেন আমার কতকালের ঘনিষ্টতা! কিন্তু মনে প্রাণে বেশ জানি, সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

তিনি জিজ্ঞাসা কল্লেন, আপনি কি টুরিষ্ট, না এখানে কোথাও থাকেন?

বিপন্ন পথিককে সাহায্য করা 'Road courtesy' বটে কিন্তু অচেনা

পথিকের সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব এক পাড়াগাঁয়ের বুড়োরাই করে থাকে। ভাব্‌লুম তাদের মত আলাপ কর্‌বার কোন লোক না পেয়ে সাহেবের প্রাণটা নিশ্চয়েই হাঁপিয়ে উঠছে, তাই বোধ হয় আমায় দেখে তিনি এগিয়ে এসেছেন। বল্লুম, না, খনিতে চাকরী করি, সেই সূত্রেই এখানে থাক্‌তে হয়।

প্রশ্ন কল্লেন, কোন্ খনি?

উত্তর দিলুম।

এম্‌নি ধারা দু-একটা কথার পর সাহেব বল্লেন, যদি তুমি কিছু মনে না কর, তা' হলে আমার ঘরে এসো। একসঙ্গে বসে একটু চা খাওয়া যাক্।

কেন জানি না, কথাটা শুনে বড়ই ভালো লাগ্‌লো, গাড়ী থেকে নেমে পড়্‌লুম।

সাহেবের সঙ্গে এদিক ওদিক কথা কইতে কইতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্‌লুম, তারপর ফটক পার হয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে—

কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি, এ বাংলোটা ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নি; কিন্তু তবুও যেন এ সব আমার অতি পরিচিত বলেই মনে হতে লাগ্‌লো। এধার ওধার চেয়ে দেখি, যেখানটি যেমন করে আমি সাজাতে পার্‌তুম, এ সাহেবও ঠিক্ তেমনি করেই সাজিয়ে রেখেছেন।

সাহেবের একটা বেহারী চাকর আছে। বারাণ্ডার ধারে এসে আমায় দেখেই সে এক লম্বা সেলাম দিলে। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিরে, কেমন আছিস্?

কিন্তু অনেক চেষ্টায় নিজেকে সাম্‌লে নিলুম। কি মনে কর্‌বে লোক্‌টা, আগে ত ও আমায় কখনও দেখে নি।

সাহেব আমায় ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালে। কি পরিচ্ছন্ন এই ঘরখানি! আমি আমার ঘরকে এত করে ঝেড়ে-মুছেও ধূলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই না, কিন্তু এই রাস্তার ধারে সাহেব তাঁর ঘর এবং গৃহ-সজ্জাকে কেমন করে যে এত সুন্দর রেখেছেন, ভেবে কিছুই ঠিক্ কর্‌তে পার্‌লুম না। বাস্তবিক, এদের পরিচ্ছন্নতার একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে।

সাহেবের ঘরে টেবিল, চেয়ার, সোফা, এমন কি সিলিং থেকে ঝোলান ঝাড়ের আলোগুলো পর্য্যন্ত চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে, নতুন বলেই মনে হয়—যেন এ সব জিনিষ কাল কিনে এনে এখানে বসানো হয়েছে।

কথায় কথায় সাহেবকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লুম। তিনি বল্লেন, আমার নাম রিকি স্কট্, আমাকে সবাই স্কট্ বলে ডাকে।

বল্লুম, কতদিন এখানে আছেন ?

—অনেকদিন।

তারপরে তিনি নিজের জীবন-কাহিনী বল্‌তে সুরু কর্‌লেন, এলাহাবাদে তাঁর বাপ ছিল মিলিটারী অফিসার। তিনিও প্রথমে সেখানেই চাকরী নেন ; কিন্তু তাঁর বাবার মৃত্যু হওয়ায় এবং আরও একটা দুর্ঘটনার পর—তারপর আমার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিপাত করে বল্লেন, তোমায় আর বল্‌তে কি, আমি যে মেয়েটিকে ভালবাস্‌তুম, সে আমায় উপেক্ষা কর্‌ত। মনের দুঃখে আমি তখন সেখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। প্রায় তিন বছর এম্‌নি করে ঘুরে আমার যা' কিছু ছিল, সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। তারপর এই বেহারে এসে একটা অভ্র-খনিতে চাকরী নিতে বাধ্য হই। একদিন আমি ঘোড়ায় করে পরেশনাথ থেকে ফের্‌বার সময় এখন যেখানে তোমাদের খনি আছে, ওইখানে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একজন দেশীয় লোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিই। তাদের বাড়ীতে অভ্রের থালায় করে সব জিনিষ-পত্র রাখা হতো। তাদের কাছে সমস্ত সন্ধান নিয়ে

আমি ওইখানে অভ্র-খনির আবিষ্কার করি। তারপর জমীদারের কাছ থেকে জমী 'লিজ' নিয়ে আমিই এখানে প্রথম 'মাইকা মাইনে'র কাজ পুরোদস্তর আরম্ভ করি। ওই খনি থেকে আমি অনেক টাকাই লাভ করেছি। তারপর বুড়ো বয়সে দায়িত্বশূন্য হয়ে বাকী জীবনটা কাটাবার জন্যে খনি-টনি সব বিক্রী করে দিয়ে এই বাড়ীখানি নিজের মনের মত করে তৈরী করিয়ে এখানেই বসবাস করছি। আজ তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করে বড় আনন্দ পেলুম।

তারপর এদিক-ওদিক আরও কিছুক্ষণ কথার পর উঠে পড়্লুম। বৃদ্ধ আমার হাতখানি স্নেহভরে চেপে ধর্‌লেন। তাঁর স্পর্শে আমার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন হয়ে গেল। ভারী গলায় তিনি বল্লেন, তোমাকে যে আমার কত ভাল লাগছে, তা' আর কি বল্‌বো। মনে হচ্ছে, তুমি আমার কল্পনা। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে আমি আজ প্রকৃত শান্তি পেলুম। তা' যাক্, তুমি যখনই অবসর পাবে, তখনি আমার কাছে আস্‌বে, আর তোমার যখন যা' দরকার হবে, আমায় বল্‌তে দ্বিধা করো না। আমার এখানে বই বা অন্য যে কোন জিনিষ আছে, তোমার আবশ্যক মত তুমি এ সকলেরই ব্যবহার—

আমি তাঁর মুখের দিকে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম।

চার

চাটুয্যের দলে সেদিন তাসখেলার লোক কম পড়াতে সে আমায় জোর করে নিয়ে গিয়ে বসালে। তাকে কত বল্লুম যে, আমি তাস খেল্‌তে ভাল পারি না এবং সারাদিন ধরে মোটর হাঁকিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু চাটুয্যে আমার কোন কথাই শুনলে না। তাদের সঙ্গে বসে সেদিন খেল্‌তেই হলো।

খনির কেসিয়ার হরিদাসবাবু তাসটা ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে আমায় লক্ষ্য করে বল্লেন, আজ কেমন পরেশনাথ ঘুরে এলেন ?

উত্তর দিলুম, ভাল।

এদিক ওদিক কথার পর চাটুয্যেকে বল্লুম, চাটুয্যেমশায়, আজ আপনাদের স্কট্ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো।

চাটুয্যে বল্লে, কে স্কট্ ?

—সে কি, স্কট্‌কে চেনেন না, আপনি ত গোড়া থেকেই এই খনিতে আছেন।

—হ্যাঁ, তা' ত আছি, কিন্তু স্কট্ বলে এ-খনিতে এক ফাউণ্ডার রিকি স্কট্ ছাড়া আর কেউ ছিল বলে ত মনে পড়ে না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই।

অপর খেলোয়াড় রায়-মশায় বল্লেন, সে কি মশায়, তিনি ত আজ বহুকাল হোল' মারা গেছেন! আমরাই তাঁকে দেখি নি কখনও, তা' আপনি তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌লেন কি রকম!

চাটুয্যে বল্লে, না না, তুমি থামো, তারপর আমার দিকে লক্ষ্য করে বল্লে, স্কটের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হলো বিজয় ?

রায়ের কথায় কিন্তু আমার বড় মজা লাগ্‌লো। তাঁকে বল্লুম, সে কি মশায়, মারা গেছেন কি! আমাকে নিয়ে একসঙ্গে নিজের বাংলোয় বসে চা খেলেন, কত রকম সব গল্প কর্‌লেন, আর আপনি বল্‌ছেন মারা গেছেন।

তারপর সকলেই অধীর আগ্রহে একত্রে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কোথায়, কোন্ বাড়ীতে ?

তখন আমি ঘটনাটা সমস্তই খুলে বল্লুম।

রায়-মশায় চোখ কপালে তুলে বল্লেন, বলেন কি মশায়, এ কি সব সত্যি কথা ?

চাটুয্যে বল্লে, বিজয়, কেন ভাই ছলনা কর্‌ছো আমাদের সঙ্গে! হয় ত ওই বাংলো সম্বন্ধে তুমি কোনো ভূতের গল্প শুনেছো, তাই থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে—

আমি ত অবাক্! আমার কথা তাঁদের কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পার্‌লুম না।

চাটুয্যে বল্লে, বাপ্, ও বাড়ীতে কি ভয়ানক ভূতের উপদ্রব! স্কট্ মারা যাওয়ার পর তার এক আত্মীয় এসে ওই বাংলো অধিকার করে; কিন্তু সে ওখানে কিছুতেই টিঁক্‌তে পারে না। তারপর ও বাড়ী ভাড়া দেওয়ার জন্যে রীতিমত চেষ্টা হয়। কোন ভাড়াটেই ওখানে একদিনও বাস কর্‌তে পারে নি, কি এ-দেশী, কি সাহেব।

রায় বল্লেন, আর তুমি জানো না বুঝি। আমাদের উপস্থিত ম্যানেজার নিকল্‌স্ সাহেব অনেক লোকজন সঙ্গে করে ওই বাংলোয় গিয়ে আড্ডা নিয়েছিলেন, কিন্তু দু'দিন পরে পালিয়ে আস্‌তে পথ পান নি।

চাটুয্যে বল্লে, আর রেখে দাও তোমার নিকল্‌স্। ওই বাড়ীটায় থানা হবার কথা হয়েছিল। বাড়ীওয়ালা বিনা ভাড়ায় পুলিশকে দিতে

চেয়েছিল, কিন্তু তবুও ওখানে থানা টিঁক্‌তে পারে নি। ও কি যে সে বাড়ী হে!

বল্লুম, দেখুন, আপনারা বিশ্বাস না কর্‌লে আর আমি কি কর্‌তে পারি। আমি কিন্তু ওই বাংলোয় একজন বুড়ো সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে একসঙ্গে চা খেয়ে এসেছি।

চাটুয্যে বল্লে, ভায়া, বলি তোমার কি কিছু মাল টানার অভ্যাস আছে?

রায়-মশায় বল্লেন, আচ্ছা বিজয়বাবু, আপনি আমাদের কাল বাড়ী-খানা দেখাতে পার্‌বেন কি?

নিঃসন্দেহে তখনি স্বীকার করে ফেল্লুম। বল্লুম, নিশ্চয়ই পার্‌বো।

হরিদাসবাবু এ সব কথায় বড় আর আমোল দিলেন না। তাসগুলো হাতে সাজিয়ে নিয়ে ডাক্‌লেন, পনেরো।

পাঁচ

সেদিন দুপুরে অফিসে তেমন কাজ ছিল না। আমি, চাটুয্যে ও রায়-মশায় অফিসের ছোট গাড়ীটা নিয়ে তিনজনে মিলে বেরোনো গেল।

মোটরে যেতে পনের মিনিটও লাগে না। পরিচিত পথের মোড়ে আমার গাড়ীটা এনে দাঁড় করালুম।

কোথায় বা সাহেব, আর কোথায়ই বা তাঁর বাগান-বাড়ী! তারের বেড়ার ভেতর কতকগুলো জঙ্গল, তারই মাঝখানে এক বাংলোর ভগ্নাবশেষ কোনরকম করে জীর্ণ খুঁটীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দ্দিকে কাঁটাগাছ ও শুকনো পাতার রাশি। দেখ্‌লে মনে হয় এক সময় সে-আবাসে লোকের বসবাস ছিল, এখন কিন্তু সেই পরিত্যক্ত ভিটায় মনুষ্য প্রবেশের পথটুকুও নেই। বড় একটা গাছের ডাল ভেঙে দরজার ওপর আড় হয়ে পড়ে আছে। সাম্‌নের বারাণ্ডাটা স্থানে স্থানে ভাঙা। খুঁটীর গোড়ায় এক প্রকাণ্ড গহ্বর। বোধ হয় শৃগাল জাতীয় কোন জন্তু তার বসবাসের নিমিত্ত সেই প্রকাণ্ড গহ্বরটি খনন করেছে।

নিজের জ্ঞানকেও আর বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছে হয় না। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যেখানে বসে পরমানন্দে আতিথ্য-গ্রহণ করে বাংলো ও বাগানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছি, সেই বাড়ীই কি এই বাড়ী! অথচ, অবিশ্বাস করবার কোন কারণই নেই। রাস্তার ধারে কাল আমি মাইল ষ্টোন্‌টা ঠিক্ ওইখানেই দেখেছি। ওই বাঁকের মাথায় আমার 'বাক্‌ল'টা খুলে পড়ে গিয়েছিল। ওইখানটায আমি আমার গাড়ী থামিয়ে রেখেছিলুম। তবে—

চাটুয্যে বল্লে, কি হে, এইখানেই ত?

জবাব দিলুম, হ্যাঁ, এইখানেই ত ছিল।

—ছিল, ত গেল কোথায় ?

রায় বল্লেন, কি মশায়, আপনার বন্ধু কি রাতারাতি অদৃশ্য হলেন না কি ?

এ সব কথার কোন উত্তর আমার মুখে এলো না। শুধু অবাক্ হয়ে সেই ভাঙা বাংলোটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। এ দৈবী মায়া, না ভৌতিক কাণ্ড ? বিদেশে এসে আমার মস্তিষ্কের কোনরূপ বিকৃতি হলো না কি ? ভেবে কিছুই ঠিক্ কর্‌তে পার্‌লুম না।

ঘাড় হেঁট করে ফিরে এলুম। তাঁদের সঙ্গে কোন কথাই আর কইলুম না। তাঁরাও প্রথম দিকে বেশ খানিকটা হাসাহাসি করে শেষকালে যেন কিছু গম্ভীর হয়ে পড়্‌লেন। আমি হলুম নতুন লোক। আমার সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ কিছুই জানেন না। এই অদ্ভুত গল্প শুনে তাঁরা আমায় কি ভাব্‌লেন কে জানে !

খনিতে ফিরে এসে যে কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব কর্‌তে লাগলুম, তা' একমাত্র আমিই জানি। এই সমস্ত ঘটনা তবে কি ? তখন হঠাৎ মনে পড়্‌লো, সাহেব আমায় তাঁর বই নেবার কথা কাল বলেছিলেন ; কিন্তু বই ত আমি নিই নি। বই একখানা নিলে খুবই ভাল হতো। তবু একটা চিহ্ন থাক্‌তো।

আমি যেন কেমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লুম। গাড়ী তখন 'গ্যারেজে' পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাদের এক বেহারী 'টিণ্ডেলে'র কাছ থেকে তার সাইকেল-খানা খানিক ক্ষণের জন্য চেয়ে নিয়ে স্কটের সেই ভাঙা বাংলোর উদ্দেশে পুনরায় রওনা হয়ে পড়্‌লুম।

সাইকেলে যেতে যেতে যতই বাড়ীটার কাছাকাছি আস্‌তে লাগ্‌লুম,

ততই আমার বুকের ভেতর কেমন যেন দুড়্‌দুড়্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী ছিল না। জনশূন্য প্রকাণ্ড মাঠ তখন সূর্য্যের পড়ন্ত আলোয় লাল হয়ে উঠেছে। মেঠো হাওয়ায় পথের ধূলো উড়ে এসে আমার কাপড় ও গাড়ীখানা লালে লাল করে দিলে।

পরিচিত মোড় পার হতেই আমার হাত পা সব কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। সেই বাংলোর সাম্‌নে গিয়ে আমি সাইকেল থেকে নেমে পড়্‌লুম।

তখনও পর্য্যন্ত সাহস করে রাস্তা থেকে চোখ তুলে বাড়ীখানা দেখ্‌তে ভরসা করি নি। তারপর ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখ্‌লুম, পূর্ব্বদিনের মত বাগান তেম্‌নি সুন্দরভাবেই সাজানো। জান্‌লাতে সিল্কের পরদা ঠিক্‌ তেম্‌নিভাবেই অপরাহ্নের হাওয়ায় দুল্‌ছিল। গাছে গাছে বাহারী পাতা এবং ফুলের গুচ্ছ যেন আর ধরে না।

চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিয়ে আর একবার চেয়ে দেখ্‌বো, এমন সময় ওপর থেকে স্কট্‌ আমার নাম ধরে ডাক্‌ দিলেন। বল্লেন, হ্যালো বিজয়, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? সাইকেল নিয়ে ভেতরে এস।

পরনে তাঁর সাটিন জিনের শাদা ট্রাউজার, গায়ে একটা সিল্কের হাতকাটা সার্ট। বারাণ্ডার ওপর বেতের চেয়ারে বসে একটা বাইনা-কুলারে'র পেছন দিয়ে একমনে দূরের 'ল্যাণ্ডস্কেপ্‌' দেখ্‌ছিলেন।

সাইকেলটা হাতে করে বাগানের মাঝখানের কাঁকর দেওয়া পথ দিয়ে ঢুক্‌লুম। বেহারী চাকর তখন টিনের ঝারি নিয়ে গাছে গাছে জল দিচ্ছে। সারাদিনের উত্তাপের পর সন্ধ্যার জল এবং হাওয়ায় বাগানের উদ্ভিদ-মহলে তখন একটা প্রসাধনের উৎসব পড়ে গেছে।

স্কট্‌ আমায় পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বল্লেন, বসো।

বস্‌লুম। বল্লুন, আপনাকে আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে, তার উত্তর না পেলে আমি কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছি না।

তিনি বল্লেন, কি ?

আজ দুপুরের ঘটনাটা তাঁকে সব খুলে বল্লুম। শুনে তিনি একটু হাস্‌লেন। বল্লেন, তাই না কি! কেন আমি ত এইখানেই বরাবর আছি।

বুঝ্‌লুম যে, কোন কথা তিনি সহজে ভাঙ্‌বেন না। তখন চাটুয্যের কথাটাও তাঁকে বল্লুম। তবে যে-লোক আমার সাম্‌নে বসে কথা কইছেন এবং যাঁকে দেখে তিলমাত্রও সন্দেহ বা ভয় করে না, তাঁকে আমি কিছুতেই জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারলুম না, তিনি ভূত কি না ?

কিন্তু স্কট্ আমার মনের কথা বুঝে নিয়ে বল্লেন, কেন, চাটুয্যে কি আমাকে ভূত বলে না কি ?

বল্লুম, এমনিই ত বলে।

সাহেব যেন একবার কি ভাব্‌লেন। তারপর বল্‌তে সুরু কর্‌লেন। বল্লেন, আচ্ছা, এই যে তোমরা ভূত-ভূত কর, এর মানে কি ? মনে কর, তুমি কোল্‌কাতায় ছিলে, এখন সেখান থেকে গিরিডিতে চলে এসেছো। আচ্ছা, উপস্থিত যদি কোন লোক তোমায় কোল্‌কাতায় খোঁজ করে' না পায় এবং না পেয়ে যদি বলে যে তুমি ভূত হয়ে গেছ, তা' হলে তাকে তুমি কি বল্‌বে ?

—বা, কোল্‌কাতায় আমি না থাক্‌তে পারি, কিন্তু এখানে ত আছি। সে আমায় এখানকার ঠিকানায় খোঁজ কর্‌বে।

—হ্যাঁ তা' করবে, কিন্তু কোল্‌কাতা নামক দেশটায় তুমি এখন ভূত হয়ে গেছ, যদি ভূত অর্থে আমি অতীত ধরি। কোল্‌কাতায় তুমি ভূত, গিরিডিতে তুমি বর্ত্তমান, তারপর ভবিষ্যতে কোথায় যাবে, তার ঠিক্ নেই। এও কি তেম্‌নি ; মোটের ওপোর সত্যিকার ভূত বল্‌তে তোমরা যা' বোঝো, সেটা আমার মতে কিছুই নয়। কালের পরিবর্ত্তনে পাত্রের

বিবর্ত্তন, আবার কোল্‌কাতা থেকে তোমার এই গিরিডি আসা হলো স্থানের পরিবর্ত্তন, দেহীদের দেহান্তর গ্রহণ করা রূপের পরিবর্ত্তন। মোটের ওপর মূল বস্তু কখনও বদ্‌লায় না, এই হলো আমার মত।

কিন্তু আমার প্রশ্নের সোজা উত্তর তিনি কিছুই দিলেন না। তখন আমায় নির্লজ্জের মত জিজ্ঞাসা কর্‌তে হলো, কিছু মনে করবেন না মিঃ স্কট্‌ আপনি কি—

প্রশ্ন শুনে সাহেব একটু হাস্‌লেন। শেষে বল্লেন, তোমার কি মনে হয় বলো ত বিজয় ?

—মানুষ বলে।

—ঠিক্ তাই, মানুষ ছাড়া আমি আর কিছুই নই।

—তবে কেন বিকেলে এসে আপনাকে এখানে পেলুম না। আপনার বাড়ীখানা কেনই বা ওরকম অবস্থায় দেখ্‌লুম ?

—বিজয়, এইখানেই ত মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ। আমার আগে অনেকেই এই দেশে এসে ঘুরে গেছেন, বহুকাল ধরে বহু সহস্র লোক। তাঁরা সকলেই দেখেছেন এ দেশটা অনুর্ব্বর, মনুষ্যবাসের পক্ষে অযোগ্য বলে। কিন্তু আমার চোখে এদেশের মাটীতে প্রথম ধরা পড়ে এই অভ্রের সমৃদ্ধি। আমিও তাঁদের মতই মানুষ, শারীরিক কষ্ট ঠিক তাঁদেরই মতো পেয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখ্‌তে পেয়েছি, এদেশের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য। এখন বুঝ্‌লে ?

—তা' যেন হলো, কিন্তু আমার সঙ্গীদের সঙ্গে যখন এলুম, তখন কেন আমি এখানকার সেই পরিত্যক্ত অবস্থাই দেখ্‌তে পেলুম।

—সঙ্গদোষ বিজয়, সঙ্গদোষ ! ওই জন্যই মানুষ উপযুক্ত সঙ্গীর অন্বেষণ করে। তুমি তোমাদের দেশীয় কাব্য নিশ্চয়ই পড়েছ। তোমাদের কাব্যে আছে, রাধা মেঘ দেখে কৃষ্ণ মনে করে মূর্চ্ছা যেতেন। সেটা হলো

তাঁর নিজস্ব মানসিক চিন্তা, আবার যখন অন্য লোক এসে দেখিয়ে দিত ওটা নিছক মেঘ, তখন রাধার সেই ঐশ্বরিক দৃষ্টি সরে যেত। তুমি যখন নিজের মনে আসো, তখন আমার স্বরূপ তুমি দেখ্‌তে পাও, আর যখন ওই সব লোকের সঙ্গে আসো, তখন তাদের ভাবে ভাবান্বিত হয়ে—

আকাশ থেকে অন্ধকার এসে নাম্‌ল আমাদের চতুর্দ্দিকে, পুঞ্জে পুঞ্জে স্তরে স্তরে। পথ, গাছ, বাগান, বাড়ী, এমন কি উন্মুক্ত প্রান্তর পর্য্যন্ত অন্ধকারে কালো হয়ে গেল। হাওয়ার তেজ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌লো। আকাশে তখন মেঘের সমারোহ পড়ে গেছে।

বল্‌লুম, আচ্ছা আমি এখন উঠি, জল আস্‌ছে।

বৃষ্টির মধ্যে সেখানে থাক্‌তে আমার কেমন ভয় কর্‌তে লাগ্‌লো।

সাহেব বল্লেন, আচ্ছা, কাল কিন্তু আবার এসো।

—মিঃ স্কট্‌, আমার বন্ধুদের আন্‌তে পারি কি ?

—খুসী।

তিনি সেই বেতের চেয়ারে চুপ করে বসে রইলেন। আমি আমার সাইকেল নিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই পথে নেমে এলুম।

রাস্তা থেকে স্পষ্ট দেখ্‌লুম, অন্ধকারের মধ্যে সাহেবের মূর্ত্তি বেত্রাসনে গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট।

ছয়

ম্যানেজার নিকল্‌স্‌ আমায় দুপুরে চাপরাশী দিয়ে ডেকে পাঠালেন।

গেলুম। নিকল্‌সের ঘরে তখন রায়-মশায় বসে আছেন। নিকল্‌স্‌ আমায় স্কটের কথা তুলে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আমি সেখানে কি দেখেছি?

সমস্ত বিষয়টাই সংক্ষেপে তাঁকে জানালুম।

নিকল্‌স্‌ বল্লেন, বেশ, আজ দুপুরে তুমি, আমি ও মিঃ চ্যাটার্য্যি তিনজনে যাবো। তৈরী থেকো।

মোটরটা সেদিন নিজেই চালাতে লাগ্‌লুম। স্কট্‌ সাহেব কাল সন্ধ্যায় বন্ধুদের আন্‌বার হুকুম দিয়েছেন বলেই আমি সাহস করে এঁদের নিয়ে চলেছি।

দূর থেকে বাংলোটার দিকে চেয়ে কিন্তু আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল! দেখ্‌লুম, সেই ভাঙা বাড়ীখানা পূর্ব্বের মতই পরিত্যক্ত অবস্থায় পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। দু'-একটা পাখী দুপুরের রৌদ্র থেকে আত্মগোপন করে গাছের ছায়ায় বসে অদ্ভুত রকম শব্দ কর্‌ছিল।

আশ্চর্য্য!

চাটুয্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লে। নিকল্‌স্‌ একবার চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখে বল্লেন, কই বাবু, তোমার স্কট্‌ কোথায়?

নিরুত্তরে রইলুম।

চাটুয্যে বল্লে, চলো হে, ফিরে চলো।

অগত্যা—

আরও একটু এসে হঠাৎ আমার কি যেন মনে হলো। বল্লুম,

আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তা' হলে এই গাড়ীর মধ্যে একটু বসুন, আমি একবার একা গিয়ে দেখে আসি।

চাটুয্যে বল্লে, আর কি হবে ভায়া, চলো ফিরেই যাওয়া যাক্।

নিকল্‌স্ বল্লেন, না না, তুমি যা' বল্‌ছো, কথাটা ঠিক্। তুমি এগিয়ে গিয়ে একলাটি একবার ব্যাপারটা দেখে এসো।

মোটর থেকে নাম্‌বার উপক্রম কর্‌তেই নিকল্‌স্ বল্লেন, না বাবু, তোমায় নাম্‌তে হবে না, আমরাই বরং নেমে যাচ্ছি। তুমি এই গাড়ীটা নিয়ে চলে যাও ; 'চট্' করে ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে।

নিকল্‌সের হুকুমে বুড়ো চাটুয্যেকেও অনিচ্ছাসত্ত্বে মোটর থেকে নাম্‌তে হলো।

আমি সেই গাড়ী নিয়ে পুনরায় এগিয়ে চল্‌লুম।

দুপুর রোদ্দুরে স্কটের বাংলো যেন চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। গাছপালা সমস্তই নেতিয়ে পড়েছে। ভেতর থেকে দোর বন্ধ, কিন্তু দেখ্‌লেই মনে হয়, সে বাড়ীতে লোক আছে।

মোটর ছেড়ে আমি ওপরে এসে উঠ্‌লুম। মনে হলো বাড়ীটার ভেতর কে যেন পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে।

দরজায় হাত দিলুম। খুলে গেল। ড্রয়িংরুম পার হয়ে গানের শব্দ লক্ষ্য করে একটা ঘরের সাম্‌নে গিয়ে পর্দ্দা সরিয়ে ভেতর দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, স্কট্ সাহেব পিয়ানোয় বসে আপন-মনে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাইছেন। ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। জান্‌লায় কালো বনাতের পর্দ্দা থাকার দরুণ ঘরটা যেন কেমন আলো-আঁধারি হয়ে আছে। স্কটের সাম্‌নে, দেওয়ালে একটা বড় আর্‌সী। মেঝেয় কার্পেট বিছানো। সমস্ত ঘরটার মধ্যে যেন একটা পবিত্র গম্ভীরভাব ফুটে রয়েছে।

আমি কেমন আকৃষ্ট হয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লুম। স্কট্‌ সাহেব ইঙ্গিতে আমায় বস্‌তে বল্লেন।

ধর্ম্ম-সঙ্গীত চল্‌তে লাগ্‌লো। আমি আমার অবস্থার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলুম। ভুলে গেলুম যে, আমার ম্যানেজারকে আমি গাছতলায় দাঁড় করিয়ে এসেছি। একবারও মনে হলো না যে, এ অবস্থায় আমার এখানে বেশী দেরী করা উচিত নয়।

তন্ময় হয়ে স্কটের গান শুন্‌ছি। শুন্‌তে শুন্‌তে হঠাৎ আমার নজর পড়্‌লো আর্‌সীর দিকে।

স্কট্‌ পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছেন। আমি একটা কোচের ওপর বসে আছি। স্কট্‌ এবং আমার দু'জনের মূর্ত্তি দর্পণের মধ্যে ফুটে উঠেছে। উভয়ের প্রতিচ্ছবির মধ্যে কতকটা যেন সাদৃশ্য আছে। কিন্তু স্কটের আবয়বিক পরিবর্ত্তন সুরু হলো। পিয়ানোয় সঙ্গীতের প্রবাহে কালের গতিস্রোত বেজে উঠ্‌লো। জনহীন প্রান্তর-বাটীকায় স্তব্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতা ভেদ করে পিয়ানোর সঙ্গীতের মধ্যে শুন্‌লুম যেন কালের পদধ্বনি! মুকুর-গাত্রে সাহেবের ছবির মধ্যে পরিবর্ত্তন চল্‌তে লাগ্‌লো। রূপের পর রূপ পরিচ্ছদের পর পরিচ্ছদ বদ্‌লাতে লাগ্‌ল। সেই পরিবর্ত্তনের শেষ দিকে যার মূর্ত্তি সেই দর্পণে ফুটে উঠ্‌লো, সে যে আমারই শৈশব মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তিও ধীরে ধীরে বদ্‌লে গেল, শেষে ফুট্‌লো আমারই বর্ত্তমান ছবি। পিয়ানোয় বসে গান গাইছি আমি, পাশের কোচে বসে শুন্‌ছিও আমি। শ্রোতারূপে নবীন-আমি গায়করূপী পুরাতন-আমির গান শুনে তন্ময় ও নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলুম।

গান শেষ করে আমার দিকে চেয়ে সাহেব বল্লেন, বিজয় যে, এমন অসময়ে?

তখন আমার জ্ঞান হলো। স্কটের হাতটা চেপে ধরে বল্লুম, মিঃ স্কট,

আপনি আমায় এই রহস্য থেকে মুক্তি দিন। আমি সকলের কাছে পদে পদে অপমানিত হচ্ছি, লোকে আমায় পাগল ভাব্‌ছে—অথচ, আমি এর কোন মীমাংসাই কর্‌তে পার্‌ছি না।

স্কট তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ হাসি হাস্‌লেন, তাই ত বিজয়, তুমি ত বড় বিপদে পড়েছো দেখ্‌ছি।

একটু চুপ করে আবার তিনি বল্লেন, এই আরসীর ভেতরের ছবিটা দেখে তুমি কি বুঝ্‌লে বলো ত?

বল্লুম, কিছুই বুঝি নি, কোন কিছুর বোধশক্তি আমার লোপ পেয়েছে।

—আচ্ছা, আর একখানি ছবি দেখো ত। এই বলে সাহেব কার একখানা ফটো আমার হাতে তুলে দিলেন।

ফটোটা হাতে কর্‌তেই মনে হলো, সেটা উষার ছবি। কিন্তু সে হঠাৎ কেন যে গাউন পরে মেম সেজেছে, সেটা কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তারপর খুব ভাল করে দেখ্‌তেই মনে হলো না, উষা ত নয়, তবে হয় ত সেই, কি জানি!

মৃদু হেসে স্কট বল্লেন, কে, তোমার উষা না কি?

আশ্চর্য্যের সীমা আমার ছাড়িয়ে গেল, উষাকে তিনি জান্‌লেন কি করে?

স্কট বল্লেন, দেখো, তোমায় যে প্রণয়িনীর গল্প করেছিলুম, ওই হলো আমার সেই প্রণয়িনীর ছবি। আমি তাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিলুম—কিন্তু সে আমায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপর সে এবার উষা হয়ে জন্মেছে। গত জন্মে আমার সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ ছিল, এ জন্মেও সে তোমার সঙ্গে ঠিক্ সেই সম্বন্ধই স্থাপন করেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছিল, তোমার সঙ্গেও ঠিক্ সেই রকম ব্যবহারই করেছে, কেমন তাই নয় কি?

এই উষা মেয়েটি আমাদেরই .প্রতিবেশী। আমার তাকে বড় ভাল লাগ্‌তো। প্রথম প্রথম সে আমায় ভালও বাস্‌তো। কিন্তু শেষকালে আমায় প্রত্যাখ্যান করে। কল্‌কাতা ছেড়ে দূরদেশে চাকরী নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে আসার মধ্যে উষার উপর অভিমান ছিল অনেকখানি।

অবাক হয়ে সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি বল্লেন, বিজয়, তুমি কি বুঝ্‌লে কিছু?

বল্লুম, না, ঠিক্ বুঝ্‌ছি না।

—তবে শোনো। আমি হলুম পূর্ব্বজন্মের স্কট্, আর তুমি হলে পরজন্মের বিজয়। আমার চিন্তা ও ভাবধারা এসে পরজন্মের বিজয়রূপে ফুটে উঠেছে, আর তোমার মনের মধ্যে যে-রূপ অস্পষ্ট হয়ে ভাস্‌ছে, সেটা হলো স্কটের মূর্ত্তি। আমি হলুম তোমার স্মৃতি, আর তুমি হলে আমার কল্পনা। আজ এই শুভ-মুহূর্ত্তে উভয়েই উভয়ের কাছে মূর্ত্তিমান।

টেবিলের ওপর দু'খানা বই ছিল। সাহেব বল্লেন, বিজয়, দেখো ত ওই বই দু'খানা কি এবং কার নাম ওতে লেখা আছে।

একই বইয়ের দুটো সংস্করণ। একখানায় মুদ্রাঙ্কনের সাল আঠার শ' আটাশ, অপরটাতে উনিশ শ' আট। প্রথম বইটার গোড়ার পাতায় কালি দিয়ে লেখা আছে, 'রিকি স্কট্', আর দ্বিতীয় বইটায়, কি আশ্চর্য্য —এ যে আমারই নাম!

স্কট্ বল্লেন, আমার জন্ম আঠার শ' আটাশ সালে, তোমার?

আমি বলুম, উনিশ শ' আট।

চাটুয্যের গলা শুন্‌লুম। বাইরে থেকে বুড়ো আমার নাম ধরে ডাক্‌ছে।

স্কট্‌ বল্লেন, বিজয়, ম্যানেজার এসেছে, যাও। আবার এসো।

বাইরে বেরিয়ে এলুম।

চাটুয্যে বল্লে, কি হে, তুমি এই ভাঙা ঢিবির মধ্যে এতক্ষণ ধরে কি কর্‌ছো?

চেয়ে দেখি—বাস্তবিক, আমাদের সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ভাঙা ঢিবিই ত বটে!

দেখাতে পারবে ?

নিশ্চয়ই পারবো।

নাঃ, তোমার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পাচ্ছি না ছকু, ঐ খাদের মধ্যে জীয়ন্ত মানুষ আছে ?

শুধু মানুষ নয় হরিবাবু, শুধু মানুষ নয়। খাসা জীয়ন্ত মেয়েমানুষ, একেবারে পরীর মত দেখতে, ঐ খাদের মধ্যে জীয়ন্তই আছে, তবে সে বেউশ্যে, এই যা এক কথা !

ছকড়িকে এক ধমক দিয়ে হরিবাবু বলেন, হোক্ সে বেশ্যা, কিন্তু ওর মধ্যে বেঁচে থাকাও কি সম্ভব? সে খায় কি? হাওয়া পায় কোথা থেকে।

ওপোরে হাত দিয়ে ছকু বল্লে, ভগবান জানেন হরিবাবু, আমি আর কি বল্‌বো, যা দেখেছি তাই বল্লুম। গলা খাটো করে সে বল্লে, আচ্ছা বাবু, সাহেব কি ওরই সন্ধান পেয়ে এইখানে খুঁড়্‌তে স্থরু করেছে ?

বাবু বল্লে, কে জানে, কোথা থেকে কি খবর পেয়ে খুঁড়্‌ছে, তা কি আমায় বল্‌তে এসেছে !

ছকু বল্লে, কিন্তু বাবু, ধন্যি ছেলে ঐ রিং সাহেব, সাধে কি বলে সায়েব বাচ্ছা। আমাদের দেশে কোন্ জঙ্গলের মধ্যে কোথায় কি আছে, খুঁজে খুঁজে এসেছে ত ঠিক, আর বাঙ্গালী বাবুরা কি করে ?

ছকুর এই স্বগত প্রশ্নে হরিবাবুর অনেক কথাই মনে এল। সেও ছিল

ইতিহাসের একনিষ্ঠ ছাত্র, অনেক রকম গবেষণা করে সেও নতুন নতুন অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে পারতো, কিন্তু কেবল অর্থের অভাবেই তার সমস্ত জীবনটা মরু হয়ে গেছে। দ্বারভাঙ্গা থেকে ষাট্ মাইল উত্তরে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে সে আজ সামান্য কেরাণী হ'য়ে এসেছে, উদরান্নের সংস্থান করাই আজ তার একমাত্র উদ্দেশ্য! ইচ্ছা বা অধিকার বলে আজ তার কিছুই নেই। অতি দুঃখে বেকন সাহেবের কথাটাই তার আর একবার মনে পড়্লো,—Cash rules the world.

দুই

ভোর পাঁচটার সময় হরিহর বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লো। কাল রাতে ছকু চলে যাওয়ার পর থেকে মোটেই তার ঘুম হয়নি, কখন যে রাতটা কাটবে সেই চিন্তায় সে এম্‌নি ব্যস্ত ছিল। ইতিহাসের ছাত্র সে, অত বড় একটা ঐতিহাসিক আবিষ্কার যদি তার দ্বারা সম্ভব হয়, তাহ'লে সে নিজেকে ধন্য বলে মনে কর্‌বে।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যে এখনো বলা হয় নি। তবে সেইটে বলে নিই।

রিং সাহেব জাতিতে জার্ম্মান ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। ফ্রেঞ্চ একাডেমির অধ্যাপনা কর্‌তে কর্‌তে গেল বছর হঠাৎ কি মনে করে সে ভারতবর্ষে এসে ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার কাছ থেকে মাইনিং লিজ নেয় এই পাহাড়টার। এ পাহাড়ে যে কোনরকম খনিজ বা ধাতব পদার্থ কিছু আছে, তা কেউ ইতিপূর্ব্বে সন্দেহও করেনি, তাই মহারাজা দ্বারভাঙ্গাও আনন্দ-চিত্তে পাহাড়টার লিজ দিয়ে দেন। তারপরই রিং সাহেব অনেক কুলি নিয়ে পাউণ্ড পাউণ্ড ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় ফাটিয়ে বিরাট্ এক গহ্বর খুঁড়্‌তে সুরু করেন। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এ বিষয়ে রিং সাহেবের সঠিক উদ্দেশ্য কিছুই আন্দাজ কর্‌তে না পেরে নানারূপ কল্পনার প্রতিযোগীতায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। কেউ বলে পেট্রলের খনি আছে, কেউ বলে অভ্র, দেশীয় পণ্ডিতরা কেউ কেউ ক্রিষ্ট্যাল্, সিলিকেট, এমন কি হীরকের আন্দাজও বুঝি করেছেন। ঐতিহাসিক মহলেও অল্প বিস্তর সাড়া পড়েছে, বোধ হয় কোন ঐতিহাসিক গবেষণাই এখানে হবে।

হয়ত একটা হারাপ্পা কি মহেঞ্জোদাড়ো, কে জানে কপিলবস্তুর নতুন কোন তথ্য যদি এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়! ছকু কিন্তু সেদিনেও বলেছে, বড় লোকের বড় বড় খেয়াল, নাম বার করার এ হয় ত এক অভিনব ফন্দী!

যাই হোক্, সাহেবের তাঁবে আছে অনেক কর্ম্মচারী, তার মধ্যে বাঙ্গালী বল্‌তে মাত্র দু'জন। প্রথম নম্বর ছকু, ওরফে ছকড়ি আর দ্বিতীয় হোল হরিহর। ছকু বোধ হয় জাতে নমঃশূদ্রই হবে, চেহারা তার অতোধিক কালো, ভদ্রতার কোন রকম ছাপই তাতে নেই, তার ওপোর মুখের ডানদিকটা আগাগোড়া পুড়ে গেছে এবং সেইদিকেরই কানটা গোড়া থেকে কাটা। এ হেন ছকু বা ছকড়িই সাহেবের মোটর ড্রাইভার। ১৯১৮ সালে গ্রেট ওয়ারে সে ড্রাইভারী করতো, এবং ঐ যুদ্ধেই তার মুখের আবয়বিক বিকৃতি ঘটেছিল। চেহারাটা বীভৎস হ'লেও বিপজ্জনক ড্রাইভিংএ ছকুর নাম আছে, 'মিলিটারী ভেহিক্‌ল্‌স্ ডিপার্টমেণ্টে'র সার্টিফিকেট দেখে রিং সাহেব তাকেই চাকরীতে বহাল করেন।

দ্বিতীয় নম্বর হরিহর বাবুর চাকরী বড় মজার ব্যাপার। সাহেব তাঁর কেরানীর জন্য খবরের কাগজে একদিন বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে এত দরখাস্ত এসে পড়ে, যে তিনি ত একেবারেই বিব্রত হয়ে পড়্‌লেন। শেষে ভার দিলেন ছকুর ওপোর। বল্লেন, ছকু, তুমি এর ভেতর থেকে যে কোন ছ'খানা দরখাস্ত টেনে বার কর ত।

ছকু তাই করেছিল, সাহেব ঐ ছ'জনকে দেখা করার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন।

প্রার্থীরা যেদিন সেজেগুজে অনেক আশা নিয়ে সাহেবের সঙ্গে গ্র্যাণ্ড হোটেলে দেখা করতে যায়, সেদিন ছকুর ওপোর সাহেব লোক ঠিক করার ভার দিয়ে কোন একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ছকুর ওপোর বলা ছিল এই যে, যে-লোক কথা কইবে কম, দেখতে

ভালো হবে, যার জুতোয় শব্দ হবে না, আর হাতে কোনরকম কাগজ পত্তরের বাণ্ডিল থাক্‌বে না, তারই নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে বাকী লোকদের সে যেন মিষ্টি কথায় বিদেয় করে দেয়,—সাহেব তাকেই চাকরী দেবেন। কিন্তু ছ'কড়িকে অত কিছুই দেখ্‌তে হয় নি। হরিহর বাবু ছকুরই দেশের লোক। দেখা মাত্রই চেনা। ব্রাহ্মণ বলে ছকু তাকে তখনই নমস্কার করে, এবং তারই নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে বাকী লোকদের সরিয়ে দেয়। ছকু নমঃশূদ্র হ'লেও ব্রাহ্মণ হরিহর তাকে মনে মনে বোধ হয় যেন শ্রদ্ধাই করে। চাকরীটা ত তার জন্যই হয়েছে।

পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝখানে এই দু'জন অসমনীয় বাঙ্গালীর মাস-দুই যাবৎ একত্র বাসের ফলে এদের জাতিগত পার্থক্য যেন সবটাই চলে গেছে। একই টিনের চালায় বাহিরের দিকে একাকী হরিহর ও ভেতরের দিকে সস্ত্রীক ছকড়ি কোন রকমে মাথা গুঁজে দিন কাটায়।

সূর্য্য ওঠার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই ছকড়ি হাত মুখ ধুয়ে মাফ্‌লারের ওপোর ব্লেজার কোটটি প'রে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, হরিহর আগে থেকেই তৈরী হয়ে বসেছিল।

তিন

দুজনে বেরুলো।

পাহাড়ের খানিকটা ওপোরে কতকগুলো শিশু ও শাল গাছ কেটে রিং সাহেবের আদেশ মত কুলিরা গত দু'মাস ধরে প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত করেছে। গর্ত্তটা আন্দাজ দু'শো ফিট নিচু হবে, ভেতরটা অন্ধকার, তবে বরাবর বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নিচের দিকে ডিনামাইটের কম্বাশ্চনও বিদ্যুতের সাহায্যেই হয়ে থাকে। সেজন্য সাহেবের অস্থায়ী করোগেটের ছাউনির পশ্চিমদিকে আর একটি ছাউনি করে তার মধ্যে দুটো ডিজেল এঞ্জিন, ডায়নামো ও ব্যাটারী বসানো হয়েছে। এসবের পরিচালক স্বয়ং রিং সাহেব, আর সহকারী শ্রীমান্ ছকু। ইলেকট্রীক লাইনিংএর ব্যপদেশে ছকুকে সব সময় এই খাদটির মধ্যে ঘোরাঘুরিও করতে হ'ত।

ছকু ও হরিহর দু'জনে রিং সাহেবের ছাউনিতে গিয়ে সাহেবকে সুপ্রভাত জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে 'পাওয়ার হাউস' খুলে দিয়ে ফিরে এলো গর্ত্তের মুখে। গর্ত্তের ভেতর পর্য্যন্ত আলো জ্বলে উঠ্‌লো। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় বিস্তৃত কূপের ন্যায় অতি বৃহৎ সেই গহ্বরের তলদেশ পর্য্যন্ত ওপোর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তবে মধ্যে মধ্যে পাথরের উঁচুনিচু ঢিবির জন্য অন্ধকারও এক এক জায়গায় ছিল বেশ গাঢ়।

দু'মাসের মধ্যে একদিনও হরিহর এই খাদের ভেতর নামে নি। স্বয়ং সাহেবই দু' একবার মাত্র নেমেছিলেন, কারণ গর্ত্তের মধ্যে দর্শনীয় কিছুই ছিল না। দু'জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডিনামাইট-অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী ছিল ডিনামাইটের জন্য, আর একদল কুলি থাকতো ঐ দুজন সাহেবের সঙ্গে।

ছকড়িকে এই খাদের মধ্যে রোজই একবার করে নাম্‌তে হোত, কারণ ইলেকট্রিকের লাইনগুলো রোজই একবার করে তদারক করা দরকার; তা ছাড়া গর্ত্তও যত গভীর হোত' লাইনও তত নামিয়ে নিতে হোত'।

কিন্তু এই গর্ত্তের মধ্যে নামা এক দুরূহ ব্যাপার। প্রকাণ্ড বড় এক শালের খুঁটি আছে গর্ত্তের ঠিক ওপোরে এড়ো করে শোয়ানো; তাই থেকে দু'গাছা কাছি আছে গর্ত্তের তলা পর্য্যন্ত; সেই কাছির গায়ে টুক্‌রো টুক্‌রো বাঁশ বেধে জাহাজী কায়দায় এক 'মঙ্কি ল্যাডার' তৈরি করা হয়েছে, সেই মই ধরে কোন রকমে দুল্‌তে দুল্‌তে কুলী মজুররা ভেতরে গিয়ে নামে। দুপুরে যখন ভেতরে কাজ হয়, তখন নামা ওঠা আরও কষ্টকর, কারণ ঐ সময় বড় ক্রেণটাও কাজ করতে থাকে। ভেতর থেকে কাটা পাথরগুলো প্রকাণ্ড লোহার টবে ভর্ত্তি করে কুলিরা ক্রেণের শেকলে বেঁধে দেয়। সেই ক্রেণটা যখন প্রায় এক টন ওজোনের পাথর নিয়ে ওপোরে উঠে আসে, তখন সেই বাঁদুরে সিড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে এক রকম অসাধ্য।

সকালে তখন সে সব হাঙ্গামা ছিল না। ছকু নাম্‌ছে আগে আগে, তারই পরে পরে মঙ্কি ল্যাডারে পা দিয়ে ধীরে ধীরে নাম্‌ছিল হরিহর।

ক্রমে ক্রমে হাওয়া এল ভারী হয়ে, পাথরের কেমন একটা গন্ধ ওরা অনুভব কর্‌লে, মাথার ওপোর চেয়ে দেখ্‌লে প্রাতরাকাশের ছোট একটা গোলাকার টুক্‌রো ও আশে পাশে ইলেক্‌ট্রিকের তীব্র আলো।

ছকু ব'ললে, হরিবাবু, সাবধান, হাত কাঁপছে কেন আপনার—

অনেক কষ্টে নিজের কম্পিত হাতকে সাম্‌লে নিয়ে হরিহর বল্লে, না, না, কোথায় কাঁপছে?

আর এক ধাপ নেমে গিয়ে ছকু বল্লে, দেখ্‌বেন, পড়্‌বেন না যেন, আমি ঠিক সাম্‌লাতে পারবো না কিন্তু।

সে বল্লে, পড়্বো কেন, তুমি এগিয়ে চল।

গর্ত্তের নীচু অবধি প্রায় পৌঁছে গিয়ে ছ'কড়ি ডাকলে: হরিবাবু। সারা খাদের মধ্যে গম্ গম্ করে ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠ্লো—উহ্—উহ্—উহ্—

চাপা গলায় হরিহর জবাব দিলে, কি?

—ইহ্—ইহ্—ইহ্—

ফিসফিস্ করে ছকু বল্লে, আমরা আর তলা অবধি নাম্বো না, আপনি শক্ত করে মইটা ধরবেন, আমি এই মই দুলিয়ে ঐ পাশের ঢিবিটায় গিয়ে উঠ্বো।

কোনরকমে বাঁশটাকে শক্ত করে ধরে হরিহর একবার ওপোর দিকে চেয়ে দেখ্লে। মাথার ওপোর প্রকাণ্ড লম্বা সেই কাছি ও বাঁশের ঝোলান সিঁড়ি, খাদের গায়ে গায়ে বিদ্যুতের চোখ-ঝল্সানো আলো, তারও ওপোরে ক্রেনের বেঁকানো মুখটা, এবং ঊর্দ্ধ হতে' অল্প একটু আলোর রেখা আস্ছে,—পুরাতন পৃথিবীর লোভনীয় সূর্য্যোদয়ের। তারপর সে নীচের দিকে দেখ্লে। ছোট বড় পাথরের অসংখ্য টুক্রো ও ঢিবিগুলো ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে। নানারকম লোহার যন্ত্রপাতি, পাথর তোলার বড় বড় লোহার টব, সব থেকে বেশী করে ভয় ও শঙ্কা হয়, মৃত্তিকাতলের স্তব্ধ অপার গাম্ভীর্য্যের। পাথরের কঠিন বর্ম্মান্তরালে যে অন্ধকার এতদিন আত্মনিহিত অবস্থায় ধ্যানস্থ ছিল, সে যেন আজ সভ্যতার দুর্ব্বিনীত কৌতূহলে ক্ষুব্ধ হয়ে বিকট গর্জ্জন কর্ছে, তাই মানুষের প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসেও তার বিরক্তি-জ্ঞাপক প্রচণ্ড হুঙ্কার!

দড়ির যে মইটিকে সম্বল করে দু'টি অল্পপ্রাণ মানুষ এই পাতালপথের এত নীচে নেমে এসেছে, সেই মই এবার দুল্তে লাগ্লো। ছকু তার প্রাণপণ চেষ্টায় মইখানায় দোল দিচ্ছে।

হরিহরের হাত দু'টো জ্বালা করছে, পায়ের হাঁটু দু'টো কাঁপ্ছে, আর

ভীষণ গরম ও অত্যধিক দুশ্চিন্তার স্বেদজলে সমস্ত শরীর প্লুত হয়েছে; একটু বেসামাল হওয়ায় অর্থই হচ্চে নীচে ঐ পাথরের কঠোর আলিঙ্গনে চিরতরে চূর্ণ হওয়া।

কিন্তু ছকড়ির কি সাহস! ভয় বলে ওর যদি কিছু একটু আছে। দিব্য হাস্‌তে হাস্‌তে সে তার বাবুটিকে আর একবার সাবধান করে দিলে।

মইটায় রীতিমত দোল লাগ্‌লো। ছ'কড়ি তখন আর একবার ডাক্‌ দিলে, হরিবাবু?

আছি, হরিহর কোন রকমে উত্তর দিলে।

সে বল্লে, 'হরিবাবু, পাহাড়ের গায়ে, আপনার ডানধারে, দেখতে পাচ্ছেন।

ইলেক্‌ট্রিকের আলো সেখানে একেবারেই পড়েনি। জায়গাটা গভীর অন্ধকার, হঠাৎ এক টর্চ্চের আলো সেই অন্ধকারের ওপোরে গিয়ে পড়্‌লো।

এক হাতে টর্চ্চ ধরে আগের মতই সিঁড়িতে দোল দিতে দিতে ছকু বল্লে, ঐ যে, একটা উঁচু পাথরের খোঁচের মত আছে—

হরিহরের নজরে ঠিক পড়লো না।

ছকু বল্লে, আচ্ছা আর এক ধাপ নেমে আসুন।

আর একধাপ নাম্‌তেই ছকুর হাতটা হরিহরের পায়ে ঠেক্‌লো। ছকু বল্লে, নেমে আসুন, আর একধাপ?

পা'খানা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হরিহর আর একধাপ নাম্‌লো।

সে বল্লে, হ্যাঁ, এইবার একটু হেঁট হয়ে দেখুন দেখি। দেখবেন পড়বেন না যেন, আচ্ছা, আমি ধরছি, ঠিক করে সাম্‌লে নিন্‌।

হেঁট হতে গিয়ে হরিহরের পা' যেন আরও কেঁপে উঠ্‌লো। ছকু এবার স্পষ্ট বুঝলে এর কাঁপুনি এবং কোনরকম সংকোচ না করেই সে হো হো করে হেসে উঠ্‌লো।

হাসি ও তার প্রতিধ্বনিতে কিছু সময় কাট্‌লো। তখন ছকু বল্লে, এইজন্যেই আপনাকে আস্‌তে বারণ করেছিলুম হরিবাবু, কিন্তু আপনি ত শুন্‌লেন না।

মনে মনে হরিহরের দারুণ রাগ হচ্ছিল, কিন্তু সে ঐ প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার উদ্দেশে বল্লে, হ্যাঁ কোন্‌খানে, এইবার একবার আলোটা ঠিক করে ফেল দেখি।

আলোটা ফেলাই ছিল। ছ'কড়ি তাকে আর একবার দেখিয়ে দিলে। বল্লে, ঐ যে উঁচু খোঁচটা আছে, মই দুলিয়ে হঠাৎ আমি গিয়ে ঐ খোঁচটা ধরে ঝুল্‌তে থাকবো, তারপর একটু স'রে জায়গা করে দিলে আপনিও গিয়ে ঐ খোঁচটা দু'হাতে ধরে নেবেন। কেমন, পারবেন ত'? দাঁত বার করে ছকড়ি আর একবার হেসে উঠ্‌লো।

লোকটা পিশাচ না ভূত, ওর দেহে কি ভয় বলে কিছুই নেই!

কিন্তু মান্য বজায় রাখ্‌তেই হবে। সাহসে ভর করে হরিহর বল্লে, হ্যাঁ, নিশ্চয়েই পারবো, তুমি ধর ওকে।

ছকু তখন টর্চ্চটা পকেটে পুরে পুরোদমে মইটাকে দুলিয়ে দিলে। মইয়ের তলাটা খাদের পাথুরে দেওয়ালে ঘা' লেগে বিকট এক শব্দ হলো খাদের তলায়, সেটা প্রায় হরিহরের কাছ থেকে বিশ ফুট নীচে হবে। শব্দ ও তার প্রতিধ্বনি থাম্‌বার পূর্ব্বেই ঐ বিলম্বিত সোপানরজ্জু পূর্ণবেগে খাদের অপর ধারে গিয়ে আর একবার আঘাত পেলে অমসৃন অপরদিকের গাত্রে। পুরাতন শব্দের প্রতিধ্বনি ও নূতন শব্দে সমস্ত কূপ যেন জমাট্‌ ও নিরেট হয়ে গেল, হরিহরের শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।

তারই মাঝে এক সময় মইটায় তীব্র এক ঝাঁকুনি লাগ্‌লো; প্রাণপণ শক্তিতে হরিহর মইটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নিজের দুঃসাহসিকতায় চিন্তাশূন্য হয়ে দুল্‌তে লাগলো। ইলেক্‌ট্রিকের তীব্র বাতিগুলিও তার চোখে তখন অন্ধ হয়ে এসেছে।

টর্চ্চের আলো এসে হরিহরের গায়ে পড়্লো। অন্ধকারের মধ্য থেকে ছকু হাঁকলে, হরিবাবু।

প্রাণপণে চীৎকার করে হরিহর উত্তর দিলে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন শব্দই এলো না। সে ঠিক আগের মতই দুল্‌তে লাগলো।

দু' তিনবার দোল খাওয়ার পর হঠাৎ যেন কে সেই চলন্ত মইটাকে আঁকড়ে ধরে আস্তে আস্তে থামিয়ে দিলে, বল্লে, হরিবাবু, ঠিক আছেন ত!

কোনরকমে হরিহর সাড়া দিলে আছি।

মইটার কাছির সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই ছকু এক গাছি দড়ি নিজের কোমরে লম্বা করে বেঁধে রেখেছিল। কোন রকমে নিজে সে পাথরের উঁচু নীচু দেওয়ালের ওপোর পা' রেখে দেওয়ালের সঙ্গে গা' ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে কোমরের দড়িটাকে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে মইটাকে নিজের কাছে এনে আর একটা পাথরের খোঁচের সঙ্গে এঁটে বেঁধে ফেল্লে; তারপর নিজে একটা পাথরের ফাটলে পা' দিয়ে দেওয়ালের একটা গর্ত্তে একটা হাত দিয়ে অপর হাত এগিয়ে দিলে হরিহরের দিকে, বল্লে আসুন, আমার এই হাতটা ধরে আস্তে আস্তে পাথরের ফাটায় পা' দিয়ে দেওয়ালের দিকে ঝুঁকে নামুন কিন্তু সাবধান, ফস্‌কালেই মর্‌বেন।

বিদ্যুতের আলো এখানে ছিলই না, হয় ত এটা ছকুরই কারসাজি। গভীর অন্ধকারে ছ'কড়ির হাতে ভর দিয়ে কোনরকমে হরিহর সেই পাথরের দেওয়াল ধরে খাড়াই কূপের দেওয়ালে গৃহগোধিকার অনুকরণে নিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

চার

সেই অন্ধকারেই ছকু যেন কোথায় সরে গেল। ভয়ে ভয়ে হরিহর ডাক দিলে, ছকু ?

কোন উত্তর নেই।

—ছকু—ছকু—

অনন্ত প্রতিধ্বনির তুমুল গর্জ্জন উঠলো—উহ্—উহ্—

—ছকু—

—হরিবাবু।

কোথায় তুমি ?

—একটু—আর একটু।

হরিহরের হাত-পা সমস্তই আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আর এক মিনিট দাঁড়ালেই সে বোধ হয় খাদের নীচে পাহাড়ের স্তূপে গিয়ে পড়্বে। তার চোখ হলো অন্ধকার, মাথা গা' ঘুরে পায়ের তলায় সব যেন সরে গেল, তবুও সে প্রাণপণে দু'হাত দিয়ে যা পেয়েছে, তাই ধরে কোনমতে দাঁড়িয়ে রইলো।

টর্চ্চের আলো এসে হরিহরের মুখের ওপোরে পড়্লো। সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ এক হাত এসে হরিহরের কাঁধটি স্পর্শ করলে।

হরি বাবু!

কি

ঠিক করে চেপে ধরুন দেখি হাতখানা।

এক হাত দিয়ে হরিহর ছকুর হাতখানা চেপে ধর্লে। ছকু উঠলো হেসে, বল্লে, ওতে হবে না ঠাকুর, এক হাত দিয়ে ধর্লে হবে না, দু'হাত

দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে ধরুন। আমার এই হাত ধরে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে আপনাকে উঠতে হবে।

প্রতিধ্বনির ভিড়ে বোধ হয় সব কথা ভালো করে শোনাই গেল না। হরিহর দেওয়ালের খাঁজ থেকে অপর হাতখানি বার করে অবশিষ্ট শক্তির সমস্তটুকু একত্র করে ছকুর পেশীবহুল হাতখানা বেশ করে জড়িয়ে ধরলে।

ছকু ওকে টেনে তুল্‌লে। ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে শ্রীমান্ হরিহর কোন এক অজ্ঞাত গহ্বরের মুখে এসে হঠাৎ আট্‌কে গেল।

হাতের তালু ও হাঁটুর সাহায্যে কোন রকমে নিজের দেহটাকে সাম্‌লে নিয়ে হরিহর টর্চ্চের আলোয় দেখতে পেলে অন্ধকারে অজ্ঞাত এক গুহার মুখ, গুহার অপর দিকে কি যে আছে, কিছুই নজর হয় না।

সে বল্লে, ছকু, এ কোথায়?

ছকু একটু হেসে বল্লে, আর ভয় নেই হরিবাবু, এবার এসে গেছি।

—কিন্তু কোথায়?

—দেখুনই না!

পাঁচ

যেখান থেকে ছকু তার হাত বাড়িয়ে হরিহরকে তুলেছিল, সেখানে মানুষের পক্ষে বসাও অসম্ভব। বুকের ওপোর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়েই ছকু তার সঙ্গীটিকে নিজের হাতে ঝুলিয়ে তুলেছিল। ছকুর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি।

ছকুর ঠিক পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে হরিহর সেই সুড়ঙ্গটি স্পষ্ট অনুভব করলে। চার ফুট প্রস্থ, দু'ফুট আন্দাজ খাড়াই এবং ভেতর দিকে প্রকাণ্ড লম্বা; সুড়ঙ্গের গা'গুলো একান্ত অমসৃণ। ষ্ট্যালাক্‌টাইট * ও ষ্ট্যালাগ্‌মাইটের জন্য ওপোর ও নীচ দু'টোই এমন ভীষণ হয়ে আছে যে, সেগুলোর ঘেঁসড়ায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

টর্চ্চের আলোটা সাম্‌নের দিকে ধরে ছকু বল্লে, আসুন, খুব সাবধানে হামা দিয়ে আস্‌বেন কিন্তু, মাথা আদৌ তুলবেন না।

সে বল্লে, আচ্ছা, তুমি এগোও।

একটুখানি এগিয়ে গিয়েই হরিহর ডাক্‌লে, ছকু।

সাম্‌নে থেকে উত্তর এলো, আসুন।

—দম যে বন্ধ হয় ভাই।

—ও একটু হবে, তাড়াতাড়ি আসুন।

হাত পায়ের অনেকখানি ছিঁড়ে গেল। অতর্কিতে দু'একবার

* Hard waterএর সংস্পর্শে পর্ব্বতগাত্রে যে সমস্ত উচ্চনীচ পাহাড়ীয় খোঁচ হয়, তাহারাই ষ্ট্যালাক্‌টাইট্ ও ষ্ট্যালাগ্‌মাইট্। ইহাদের দ্বারা এখানে জলের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে।

মাথাটাও ঠুকে গেল। কোনরকমে দেহটাকে নিয়ে সে খানিকটা এগিয়ে যেতেই বেশ একটু ফাঁকা জায়গা পেলে, বল্লে, একটু দাঁড়াও ভাই, এখানে একটু বসি।

যেন কোন কিছু ঘটেইনি, এম্‌নি অনাসক্তভাবে ছকু সে বল্লে, বসুন, কিন্তু আরও একটু যেতে পার্‌লে আলো পেতেন।

—আলো? হরিহর আশ্চর্য্য হয়ে উঠলো, এই গভীর অন্ধকারে পাতালপুরীর মধ্যে আলো কি হে?

সে বল্লে, কেন, শোনেন্ নি, কাল যে বল্লুম।

স্বাভাবিক স্মৃতি তখন হরিহরের লুপ্ত। ছকুর কথায় কোন উত্তর না দিয়ে অর্থহীনভাবে সে বল্লে, চল।

ওর বলার ভঙ্গিতে ছকড়ি ফের হেসে উঠলো। লোকটার হাসি যেন মুখে লেগেই আছে। বিপদ যত ঘনিয়ে আসে, ছকড়ি ততই মনে প্রাণে হাস্‌তে থাকে।

এখানে ওরা দু'জনেই বসে বসে এগুতে লাগ্‌লো। টর্চ্চের আলোটা এধার ওধার কর্‌তে কর্‌তে ছকু বল্লে, হরিবাবু, কাল এখানে এসে আমার বেশ একটা আনন্দ হয়েছিল। এখানে যেন কেমন একটা 'ডাগ্‌আউটে'র আবহাওয়া আছে। কুড়ি বছর পরে যেন মনে হচ্ছে, আমি আবার ফের আমার 'ফিল্ড্ সার্ভিসে' ফিরে এসেছি।

এর উত্তর হরিহর মনে মনেই দিলে, বল্লে, তোমার ডাগ্‌আউট্ তোমার কাছেই থাক ও আর আমার চাই না। প্রকাশ্যে বল্লে, এমনভাবে আর কতটা যেতে হবে।

হেসে উঠে ছকু বল্লে, বেশী নয়, অল্প।

সাম্‌নে দুটো বেঁক ফিরতেই সামান্য একটু আলোর রেশ এলো। আর একটা বেঁক ঘুরতেই আগুনের লাল আলোর মতন কেমন একটা

উজ্জ্বল আলো ওরা দেখতে পেলে। সেই সঙ্গে অল্প একটু শীত, কিন্তু হাওয়ার প্রবাহ আছে বলে মোটেই মনে হোল' না। এখানে গুহার খাড়াইও ফুট পাঁচেক হবে, গুহাতল পূর্ব্বাপেক্ষা মসৃনও বটে।

আশ্বস্ত হয়ে হরিহর বল্লে, ছকু এই গুহার কি ক'রে সন্ধান পেলে তাই বল দেখি।

সে বল্লে, ঐ যে বল্লুম, ইলেক্‌ট্রিকের তার নিয়ে বাঁধতে বাঁধতে আমি এই গুহাটা দেখি ; দেখেই আমার কেমন ইচ্ছে হোলো ভেতরে ঢুকতে ; তাই আস্‌তে আস্‌তে একেবারে ভেতরে চ'লে এলুম।

হরিহর বল্লে, দেখ ছকু, তোমার উচিত ছিল সাহেবকে কালই সব খুলে বলা, তা যাক ফিরে গিয়ে এখনই বলি চল।

সে বল্লে, হ্যাঁ, তাই বল্‌বো। আমার পরিবারও সেই কথাই বল্‌ছিল, তবে আমার ইচ্ছে ছিল, যদি কিছু ভালো মন্দ জিনিষ থাকে, তা'হলে সেইগুলো আগে থেকে হাতিয়ে নিয়ে তারপর বল্‌তে, কারণ সাহেবকে একবার বল্লে ত আর উপায় থাকবে না ; বারুদ দিয়ে সমস্ত ভেঙ্গে, এই গুহাকে বড়ো করে সবাই মিলে এর মধ্যে এসে ঢুকবে ত।

হরিহর ও ছ'কড়ি দু'জনে সেই আলোয় আরো খানিক এগিয়ে গেল।

ছয়

যেখানে গুহার পরিসর হোল' মানুষের দাঁড়াবার মতন, সেখানে আলোও ছিল প্রচুর। আর একটু এগিয়ে একটা বেঁক পার হ'তেই ওরা দু'জনে এসে হাজির হোল' এক পাথরের গেটের কাছে।

সিংদরজার একটুখানি খোলা, বাকী সবটাই বন্ধ। দরজার পাথরটা পুরু বোধ হয় তিন ফুট হবে, দরজাখানার তলাটা মাটীতে ঠেকে আছে, ওপোরে পাথরের চৌকাঠ কোথাও থেকেই আকাশ দেখা যাচ্ছে না, আলো আস্‌ছে পথের অপর দিকের নীচু একটা জায়গা থেকে, সেটাকে বড় একটা আগুনের আলো বলেই মনে হয়, কিন্তু তেমন কোন উত্তাপ যে আস্‌ছে তা নয়, তবে পৃথিবীর তুলনায় এখানকার ঠাণ্ডাটা বেশ মধুর।

যে রাস্তায় ছকু ও হরিহর চলছিল, সেই রাস্তাটা বালি ও কাঁকরে ভর্ত্তি। ছকুর হাত থেকে টর্চ্চের আলোটা নিজের হাতে নিয়ে হরিহর দু'ধার ভালো করে দেখে রাস্তার দিকে আলো ফেলেই আঁৎকে উঠলো, বল্লে, একি।

তাদের সেই রাস্তার ওপোর ক্রোপসোল জুতোর ছাপ!

ছকু সেই ছাপটা দেখে অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লে, ওটা কিছু নয় হরিবাবু, ওটা আমারই জুতোর ছাপ। আজ আমরা খালি পায়ে এসেছি বটে, কিন্তু কাল আমি ঐ জুতোটা পরে এসেছিলুম। তবেই দেখুন, কাল থেকে আজকের মধ্যে দ্বিতীয় কোন লোক এই পথ দিয়ে চলেনি, বা এখানে একটু জোরে হাওয়াও বয়নি। দেখ্‌ছেন কি রকম জায়গায় আপনাকে এনেছি। পুনরায় ছকুর সেই অভ্যস্ত হাসি!

সিংদরজায় প্রবেশ করে আরও খানিক এগিয়ে এসে ওদের চোখের

সাম্‌নে পড়লো আর একটা দরজা! সেই দরজার সাম্‌নেই ছিল অদ্ভুত এক পাথরের স্তম্ভ।

হরিহর ইতিহাসের লোক। ভারতীয় মন্দিরের সাম্‌নে অনেক রকম স্তম্ভের কথা সে জানে, বৌদ্ধযুগের স্তম্ভের ওপোর সিংহও পাওয়া যায়, কিন্তু —এ আবার কি? অবাক্ হয়ে হরিহর সেই থামটিকেই দেখতে লাগলো।

দেখতে দেখতে বোঝা গেল, সেটি ত থাম নয়, সেটি একটা মোটা খোঁচ, যেন অনেকটা শূলের মতন। সেই শূলের সূচ্যগ্রে বেঁধা আছে এক সুন্দর শিশু, দুটি চোখ তার অন্ধ, পিঠে তুনীর, হাতে একটি ধনুক। ধনুকের ছিলা এবং দণ্ড ফুলের শুষ্ক মালায় জড়ানো। ছেলেটির মাথায় ছিল শুষ্ক ফুলের সাজ।

ছকু ডাক্‌লে, আসুন।

হরিহর বল্লে, দাঁড়াও। আচ্ছা বলতে পারো ছকু, এ ছেলেটি কে।

ছকু বল্লে, কে জানে বাবু, হবে সব নক্সা-টক্সা, চিত্র-বিচিত্র। তা যাক্, এসব দেখে আর কি হবে, তার চেয়ে ঐ সাম্‌নের ঘরখানায় চলুন, যা বলেছিলুম, সে ঐ ঘরটায় থাকে।

—চল।

সেই থামটি ছাড়িয়ে অল্প একটু দূরেই খাড়া দেওয়াল সাম্‌নের পথ রোধ করে আছে এবং অনেকখানি ওপোরে পাথরের ছাদ যেন সবটাকে পৃথিবীর অনেক নীচে ঢেকে রেখেছে। এর মধ্যে আলো যে কেমন করে আস্‌ছে, হাওয়ার অভাবে কেন যে দু'জনের দম বন্ধ হচ্ছে না, সেটা অনেক ভেবেও হরিহর কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না। এ যেন এক বিরাট গুহা। এর ভেতরকার গেট, ঘর ও থামগুলো সবই যেন গুহার ভেতরের সাজ সরঞ্জাম কিন্তু তবুও এ অন্ধকার নয়। রহস্যময় লাল এক আলোকে এই গুহার প্রতিটি বিন্দু পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমান।

সাত

সামনেই ছোট একটি ঘর। ঘরের কোনদিকে কোন জান্‌লা নেই, হরিহরের নজরে কোন দরজাও ওর পড়লো না। কিন্তু না—পেছন দিকে ছোট একটা দরজা বুঝি আছে। ছকু তার টর্চ্চের আলোটি হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ওপোর হাত দিলে, পেছনে হরিহর। জনশূন্য গুহার পূর্ণ স্তব্ধতায় দু'টি মনুষ্যহৃদয় অনন্ত আশা ও দারুণ বিস্ময় নিয়ে স্থির হয়ে দরজার সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে রইলো।

এতখানি নীরবতা কেউ বুঝি কখনও কল্পনাও কর্‌তে পারে নি। স্থির —স্থির—এখানকার জগৎ বুঝি বহুকাল পূর্ব্বেই গতপ্রাণ হয়ে কবরের মধ্যে স্থির শীতল হয়ে পড়ে আছে। এ যেন সমাধির দেশ! নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ জগতের বুকে প্রবালের ঘুণাক্ষর! হিমাচলের সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে তুষারের প্রাকৃতিক মোহ!

মৃতের শরীরে গতির সঞ্চার হ'ল, এতক্ষণে। গুরুভার পাথরের ক্ষুদ্র কপাট ধীরে ধীরে নড়ে উঠলো, ধীরে ধীরে মুক্ত হল! রিক্ত ক্ষুদ্র ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে পেলবদেহা, চন্দ্রবর্ণা এক তম্বঙ্গী! পীনকুচের উপর সূক্ষ্ম হার, গুরু নিতম্বের উপর মেখলা ও মণিকাঞ্চী, করিকরভে ক্ষুদ্র বলয়, কিন্তু মুখখানি ম্লান,—একান্ত ম্লান। নিবিড় কৃষ্ণ কেশভারের প্রচ্ছদপটের মধ্যে অশ্রুমতী যুবতীর দণ্ডায়মানা স্তিমিত সেই মূর্ত্তি!

মূর্ত্তিকে দেখেই ছকড়ি যেন কেমন বিরক্ত হয়ে পেছিয়ে এল। নিদারুণ ঘৃণায় তার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরে গেল।

হরিহর চেয়ে রইলো সেই মূর্ত্তির দিকে, অবাক্ হয়ে। এ কি জীবিতা

না মৃতা! বহুক্ষণ লক্ষ্য করেও সে ঐ দেহের মধ্যে প্রাণের কোন চিহ্নই আবিষ্কার করতে পারলে না। ডাক্‌লে, ছকু।

ছকু এই ছোট ঘরটির মধ্যে তখনও প্রবেশ করেনি। বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে থেকেই সাড়া দিলে, আজ্ঞে!

—কই ছকু, তুমি বল্লে মেয়েটি কথা কয়, কিন্তু কই, এ ত—

ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে ছকু বল্লে, সেকি, কথা কইছে না।

—না।

ঘরের মধ্যে একখানি পা' দিয়ে ছকু বল্লে, না না,—কালও আমি এখানে ঐ অবস্থায় ওকে দেখেছি, কিন্তু কাল ত আমার সঙ্গে কথা কয়েছিল।

এবার যেন মূর্ত্তিটি একটু নড়ে উঠলো।

ছকু বল্লে, ঐ, ঐ ত নড়ছে।

ভয় পেয়ে হরিহর পেছিয়ে যেতেই ছকু তাকে ধরে ফেলে বল্লে, ভয় কি, আমি আছি না। কোনরকম বেচাল দেখলেই লাথি লাগাবো। মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক্‌বে, অত ছিনালা কিসের?

ছকুর ব্যবহারে আশ্চর্য্য হয়ে হরিহর তার দিকে চেয়ে দেখলে, সে কি এতই গোঁয়ার!

অপরিসর ঘরের মধ্যে ওরা তখন দু'জনেই প্রবেশ করেছে, ওদের সাম্‌নেই সেই অদ্ভুত নারীমূর্ত্তি!

মেয়েটি চোখ চাইলে। দৃষ্টির বিলাসে পরিপূর্ণ মাধুর্য্য এনে কোমল কণ্ঠের সুধাজড়িত স্বরে ঐ বীভৎস বিকৃতরূপ অমার্জ্জিত ছকুকে সম্বোধন করে বল্লে, নাথ—

দু'টি হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে পাগলের মতন দাঁতে দাঁত ঘষে ড্রাইভার ছকড়ি রক্তচক্ষে একবার মাত্র হরিবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করে সেই

নারীকে নিদারুণ ধমক দিয়ে গর্জ্জে উঠলো, ব'ললে, চুপ কর্, চুপ কর্ মাগী, ফের যদি ওকথা বল্‌বি—

এর চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা যে পৃথিবীতে কি হতে পারে, তা হরিহরের কল্পনাতেও আসে না। ছ'কড়ি লোকটা অবশ্য খারাপ নয়, সে তার স্ত্রী নিয়ে সংসার করে এটাও ঠিক, কিন্তু তাহ'লেও সে যে এত বড় কঠিন ব্রহ্মচারী এবং অত রুক্ষ ও চোয়াড় তা হরিহরের মোটেই জানা ছিল না। আর এও যেন কেমন অভিনব—এই মহিয়সী রমণী যে কেন ঐ ছকুর মত লোকের কাছে প্রণয় জ্ঞাপন করতে যায়, এটাও তার সম্পূর্ণ ধারণাতীত। কিন্তু চাক্ষুষ যে ঘটনাকে সে এইমাত্র প্রত্যক্ষ করলে, তাকে ত জ্ঞান থাক্‌তে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

নারী মূর্ত্তি সচল হোল'। ধীরে ধীরে ছকুর দিকে এগিয়ে এল'। ছকু তখন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। বিস্ময়ের কোন কথাই আসে না, সাহসের সম্পূর্ণ অভাব সত্বেও হরিহর সেই চলমান নারীমূর্ত্তির পাশে দাঁড়িয়ে প্রচুর কুণ্ঠা ও জোর-করা শক্তি নিয়ে প্রশ্ন করলে, ব'ললে, আপনি কে ?

হরিহরের দিকে তীর্য্যক্ দৃষ্টিপাত করে সেই সাম্রাজ্ঞী-তুল্যা, মহীয়সী রমণীরত্ন অপার গর্ব্ব ও অক্ষুণ্ণ তেজ নিয়ে দৃপ্তস্বরে উত্তর দিলে, আমি উর্ব্বশী,—শাপভ্রষ্টা, স্বেচ্ছাবন্দিনী উর্ব্বশী।

আট

নিজের গায়ে হাত দিয়ে হরিবাবু শুধু একবার নিজেকে অনুভব করে নিলে।

ছকু তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, তারই পেছনে গেছে অদ্ভুত ঐ মেয়েটি। ঘর এখন খালি, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে এই ঘরে কোন মানুষের চিহ্ন ছিল তা এই ঘরের অভ্যন্তর দেখে একেবারেই সন্দেহ করা যায় না। সম্পূর্ণ শূন্য গবাক্ষহীন ক্ষুদ্র একটি পাথরের কক্ষ মাত্র!

ছোট খোলা দরজা দিয়ে হরিহর বেরিয়ে এল। কিন্তু বাইরের মূর্ত্তি গেছে বদ্‌লে!

ফুলফলের বাহারে পথের দু'ধার যেন ভাদ্রের নদী! পূর্ব্বতন জ্যোতির্ম্ময় শিখার তেজ যেন আরও মধুর ও উজ্জ্বল! আস্‌ছিল এক বীণার ঝঙ্কার যেন কোন অজ্ঞাত সুদূর লোক থেকে; বড় কোমল ও ক্ষীণ সেই সুর। পূর্ব্বদৃষ্ট রমণীর সাজ পোষাক অন্যরূপ, অভিনব; আরও কতক-গুলি অনুরূপা রমণীমণ্ডলীর মধ্যে উর্ব্বশীকে কত মধুর ও মহিমময়ই না দেখিয়েছে। ওপোরে চাইলেই দেখা যায়, উদার নীল মুক্ত আকাশ, অসংখ্য তারকায় সুশোভিত। গগনের নীলাঙ্গনকে আলোকিত করে শশিরাকার স্নিগ্ধ আনন্দ! রসালের উচ্চ চূড়ায় শিখী-ময়ূরের নর্ত্তন, শ্যামল বনকুঞ্জের অন্তরে অন্তরে কোকিলের পঞ্চম। অদূরে, পর্ব্বতের গাত্রলগ্না স্রোতস্বিনীর অপরূপ ভঙ্গী। উপলখণ্ডের প্রত্যেক প্রতিঘাতে স্নিগ্ধ ঝঙ্কার!

মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইলো; কিন্তু এই অপরূপ আয়তনের মধ্যে হরিহর তার সঙ্গী ছকড়িকে কোথাও পেলে না। শেষে ঐ উর্ব্বশীনামধেয়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে ছকড়িকে পাওয়া গেল,—সে এক প্রকাণ্ড শিলার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রাগে যেন ফুলছিল।

ছকুর দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল হরিহর, কেউ তার পথরোধ করলে না। ছকুর গায়ে হাত দিয়ে হরিহর ব'ললে, ছকু, শান্ত হও, তুমি কি পাগল হবে? ও যাই হোক্ না কেন, তোমার তাতে কি?

রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে সে ব'ললে, আমার কি? কেন, ও আমার কাছে আসে কেন? যাক্ না কেন আপনার কাছে, তাহ'লে আমি কিছুই বলবো না, কিন্তু—

যোষিৎকণ্ঠের সমবেত মধুর তানলয়ে সমস্ত অঙ্গন মুখরিত করে অঙ্গনামধ্যবর্ত্তিনী উর্ব্বশী এক স্বর্গীয় মাল্য নিয়ে ছকুর দিকে এগিয়ে এল—

ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ছকু তার সঙ্গীর হাত ছাড়িয়ে অগ্নিবিকৃত মুখমণ্ডলকে আরও বিকৃত করে ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে এলো নর্ত্তকীদের দিকে, রূক্ষ পরুষ কণ্ঠে চীৎকার করে ব'ললে, থাম্—থাম্, বলছি। ফের্ যদি গাইবি ত—

পেলব দুই বাহুবল্লরী প্রসারিত করে উর্ব্বশী তার বরমাল্য নিয়ে দিতে এলো ছকড়ির কণ্ঠে—

ছকুর মুখের অবস্থা কি বিভীষিকাময়! দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে ঐ নারীর উদরে ভীষণ এক পদাঘাত করলে।

হাহাকার শব্দে ছুটে এলো হরিহর, কর কি, কর কি ছকু, এ তোমার কি ব্যাপার, ছিঃ।

—মেয়েটি মাটীর ওপোর পড়ে গেছে। ফুলের শিরোভূষণ ছিন্নাবস্থায় দূরে গিয়ে পড়েছে, হাতের বরমাল্য হাতের মধ্যেই শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে; নর্ত্তকীদের কণ্ঠে গেছে থেমে, বীণার তার গেছে টুটে, কেকা ও শিখীর স্বর হ'ল বন্ধ।

কারুর মুখে আর কোন বাক্য নেই। আবার সেই পুরাতন শব্দহীন জমাট্ নীরবতা!

নয়

উর্ব্বশীর কাছে এসে হরিহর তার কপালে হাত দিতে গেল। সখীরা সকলেই হাঁ হাঁ করে উঠলো, ব'ললে, স্পর্শ করবেন না, স্পর্শ করবেন না, আপনি মানুষ, দেববালাকে স্পর্শ করবেন না।

তাদের দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গম্ভীর কণ্ঠে ছকু ডাকলে, হরিবাবু!

ঐ ষণ্ডামার্ক-সঙ্গীর দিকে হরিহর চোখ তুলে চাইলে।

ছকু যেন কি একটা ইঙ্গিত করলে।

এখান থেকে উঠে যেতে হরিহরের মন ঠিক চাইছে না, কিন্তু ছকুর হুকুম, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হোল।

—চলুন!

হরিহরের মুখ দিয়ে আপত্তিজনক 'না' কথাটা এসেও এলো না। নিরীহ শিশুর মতো ছকুর পেছন পেছন হরিহর আস্তে আস্তে গুহামুখের দিকে অগ্রসর হোল'।

প্রথম দ্বার পার হয়ে দ্বিতীয় দ্বারও দু'জনে পার হোল', তারপর কখন যে বামদিকে বেঁকতে হবে সেকথা দু'জনের কারুরই খেয়াল ছিল না। গোঁ ভরে ছকু যাচ্ছে এগিয়ে, নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে অনুসরণ করছে হরিহর, একরাশ কুণ্ঠা ও গ্লানি নিয়ে। ছকুর এই আজকের অদৃষ্টপূর্ব্ব পৌরুষের কাছে হরিহরের ক্ষুদ্র সত্বা যেন ভয়ে আড়ষ্ট ও ছোট হয়ে গেছে।

এম্‌নি ভাবে কতখানি পথ যে গিয়েছে, তার কোন হুঁস্ নেই, হঠাৎ তারা বড় একটা আগুনের কুণ্ডের সাম্‌নে এসে হাজির হোল'।

আকাশকে স্পর্শ করে আগুনের লাল শিখা উঠ্ছে জ্বলে। সেই প্রজ্জ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখায় এক বিরাট পুরুষ ঘৃতের আহুতি দিচ্ছেন দণ্ডায়মান অবস্থায়।

হোমরত সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে দু'জন পার্থিব দর্শক কেমন যেন মুগ্ধ হয়ে গেল। বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হোমকুণ্ডের অপর দিক থেকে অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য কর্‌তে লাগলো।

মন্ত্রময় আহুতি পড়ে হুতাশনের চরণে, রক্তলোল শিখা ওঠে আকাশকে রঙিন করে। সেই শিখার মধ্যে হরিহর স্পষ্ট দেখলে, বিশ্বের যাবতীয় শক্তিরাশী আহরিত ও একত্রিত হয়েছে। সেই শক্তিময়ী সবিতৃর মধ্যস্থ বীজ যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে উজ্জ্বল জয়টীকার মত সন্ন্যাসীর ললাটকে রেখাঙ্কিত করে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

সন্ন্যাসীর মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বের মতই চল্‌তে লাগলো। ঘৃতপূর্ণ জুহু নিয়ে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠলেন মত্ত সেই ঋষি। অগ্নিকুণ্ডে ভগবান বৈশ্বানরের চরণে আর একবার ঘৃতের আহুতি পড়লো। আর একবার আগুনের লাল শিখা উঠলো আকাশ ও জগৎকে ব্যাপ্ত করে। অপরিমিত অর্থভাণ্ডারকে আপন গ্রাসের মধ্যে আয়ত্ব করে সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট শিখার কি বিজয়িনী হুঙ্কার! অগ্নিমধ্যবর্ত্তিনী নারীমূর্ত্তি কেশবপ্রিয়া লক্ষ্মী। বিশ্বের সমগ্র ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্রীভূতা, সিন্ধুসম্ভূতা কমলা অমৃতের কলস নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের মূর্ত্ত গৌরবে সন্ন্যাসীকে পূর্ণ করে তাঁরই দিকে এগিয়ে এলেন আকাশপথে। সন্ন্যাসীর ললাটস্থ জয় টীকার ঠিক ওপোরেই আর একটি সোনার টীকা দিলেন এঁকে। কলসের সমস্ত অমৃত নিয়ে হৈমবতী কমলা ঐ সন্ন্যাসীর কপালে স্বর্ণের হেমটীকা অঙ্কিত করার মুহূর্ত্তেই অন্তরীক্ষের সমস্তই যেন পূর্ণ ও সার্থক হোল'।

পার্থিব দর্শকরা অবাক্ হয়ে দেখতে লাগলো। রূপের পর রূপ,

ছায়ার পর ছায়া, গতির পর গতি, বিরাট সৃষ্টি যেন উচ্ছল উন্মাদ হয়ে উঠেছে। হোতার তখনও বিরাম নেই। সোমরস ও হবিতে যজ্ঞীয় চমসকে পূর্ণ করে ঋষি তাঁর ঈলিত হবির্ব্বহ বহ্নিকে আর একবার দান করলেন। সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির অশেষ শিখা উঠলো দীপ্ত হয়ে। ভূলোক থেকে স্বর্লোক পর্য্যন্ত সমস্তই সেই শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো; সেই শিখার মধ্যে ফুটে উঠলো ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, স্বর্গের অমরাবতী; যক্ষ, রক্ষ, অসুর, কিন্নরের অখণ্ড বন্দনা, পশু ও মানবের একান্ত ভক্তি, ত্রিলোকের যাবতীয় প্রণতিপূর্ণ সেই সোনার সিংহাসন। সিংহাসনের উপযুক্ত অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ের তেজঃপুঞ্জ কিরীট সন্ন্যাসীর প্রশস্ত ললাটে এসে অঙ্কিত করে শতক্রতুর রাজটীকা। সন্ন্যাসী উঠলো নৃত্য করে। তার সেই নৃত্যের তাণ্ডবে সারা পৃথিবী উঠলো কেঁপে,—

গগনের ঈশান কোণ্ মুক্ত করে একদল সখী এলো নেমে। সঙ্গীতের অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে সারা ভুবনকে সিক্ত করে উচ্ছলা সব অঙ্গনার দল যেন ছন্দে ছন্দে হৃদয়কে প্লাবিত করে একেবারে নেমে এলো হোমকুণ্ডের কাছে, সন্ন্যাসীর পদতলে। মলয়ের প্লাবনে পৃথিবীর বুক বুঝি ভরে গেছে, গাছে গাছে ফুলফল বুঝি আর ধরে না, যৌবনের প্রথম প্রভাতেও কোকিলের স্বর বুঝি এত মধুর মনে হয়নি, সৃষ্টির প্রাক্কালেও ব্রহ্মার বীণা বুঝি এত উন্মাদনার সূচনা করতে পারেনি,—

তখন সন্ন্যাসীর দৃষ্টি পড়লো নারীসঙ্গতির দিকে। চক্ষুতারকার মধ্যে ফুটে উঠলো এক অব্যক্ত মায়া। কণ্ঠ এল সংযত হয়ে, কমনীয় স্বরের প্রশ্ন হলো মৌনমূকের অভিনয়ে—

নর্ত্তকীদের নূপুর উঠলো বেজে! মুগ্ধ সন্ন্যাসীর চতুর্দ্দিক এক মায়ার সূক্ষ্ম আবরণে ছাদিত হোল। মস্তকের জটাভার ঘনকৃষ্ণ চিকুরজালে পরিণত হোল; অগুরু ও কুঙ্কুমের অসংখ্য পরিমলে সন্ন্যাসীর বিভূতদেহ

হোল' রঞ্জিত, পরিধানের চর্ম্ম বসন সূক্ষ্ম তন্তুতে পরিবর্ত্তিত, হাতের চমস হোল এক সুগঠিত বীণা, প্রস্ফুটিত চম্পকের সুরভিত স্নিগ্ধতায় সন্ন্যাসীর জন্য সুরচিত এক বাসর,—ঋষিললাটের টীকাগুলি ম্লান হয়ে ক্রমেই যেন মিলিয়ে যায়!

—তবে বিদায়!

বীণা থেকে চোখ তুলে ভূতপূর্ব্ব-সন্ন্যাসী চেয়ে দেখলেন উর্ব্বশীর দিকে।

প্রিয়ে?

বিদায়!

বিদায়?

তরল হাসির লহর তুলে সখীদের দল উঠ্‌লো গান গেয়ে—

এগিয়ে এসে উর্ব্বশী বল্লে, ঋষিবর! তোমার সেই ইন্দ্রত্বের কথা কি মনে পড়ে। মনে পড়ে তোমার সেই অখণ্ড যজ্ঞের কথা?

উর্ব্বশীর শ্লেষবাণীতে সন্ন্যাসীর সব কথা মনে পড়ে গেল। লজ্জায় অধোবদন হয়ে ভূতপূর্ব্ব-যাজ্ঞিক নিরুপায়ে চুপ করে বসে রইলেন, তাঁর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়লো গড়িয়ে।

বায়বীয় আঁচলগুলি হাওয়ায় মেলে দিয়ে সখিদের দল সেই হাওয়াতেই মিশে গেল। ঋষি রইলেন গাছতলায়, নিছক একা।

গম্ভীর কণ্ঠের ভীষণ আহ্বান হোল, উর্ব্বশী।

কোন উত্তর নেই!

—যদি আমার তিলার্দ্ধ শক্তিও কিছুমাত্র থাকে, উর্ব্বশী—

ভীতা ও ত্রস্তা উর্ব্বশী আকাশ থেকে নেমে এসে ঋষির পাশে করযোড়ে দাঁড়িয়ে ব'ললে, ইন্দ্রের দাসী আমি, আমি নিরুপায়—তাঁরই আজ্ঞামাত্র বহন করেছি।

—এইখানে—এই পাহাড়ের মধ্যে—

অপ্সরার দল উঠলো কেঁদে, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন প্রভু, আমরা হীন দাসী মাত্র—

ঘাড় হেঁট করে সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ বলে গেল, এই পাহাড়ের মধ্যে, তুমি নীচ ঘৃণ্য কিরাতের প্রেমভিক্ষা করে স্বেচ্ছাবন্দিনী হয়ে থাকবে।

সন্ন্যাসীর পা ধরে কেঁদে উঠলো উর্ব্বশী ও সকল সখিরা, প্রভু—

তিনি মুখ তুলে চাইলেন।

—শাপের মুক্তি হবে কবে ?

মোহান্ধ সন্ন্যাসী পুনরায় উর্ব্বশীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে কেমন যেন শিউরে উঠলেন, আমি—আমি—আমি তোমায শাপ দিয়েছি ?

উর্ব্বশী উঠলো কেঁদে,—

হাতের উল্টো পিঠটা দেখতে দেখতে সন্ন্যাসী ব'ললে, উর্ব্বশী, তুমি, তুমি তোমায় প্রভুর আদেশ আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট করেছো, কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হও নি, জয়মদে মত্তা হয়ে শ্লেষও করেছ এর ফল তোমায় পেতেই হবে। তুমি এক ঘৃণিত কিরাতের প্রণয়-ভিক্ষার জন্য প্রাণপণ করবে; জন্মজন্মান্তর ধরে সে তোমায় প্রত্যাখ্যান করবে, ঘৃণা করবে, লাঞ্ছনা করবে, এমন কি পদাঘাত পর্য্যন্ত করবে, কিন্তু কোন জন্মেও যদি একতিলের জন্য তার কৃপাস্পর্শ লাভ করতে পারো, তবে সেই সময়ই হবে তোমার মুক্তি। ব্যর্থতার তীব্র জ্বালায়, বন্দীত্বের অনিশ্চিত প্রতীক্ষায়—এগুলো যে কী, তুমি তাই অহঃরহ উপলব্ধি কর উর্ব্বশী, তুমি তাই অহঃরহ অনুভব কর, আর আমি যাই আমার পুরাতন নরকে—

বিনা কারণেই হরিহর ছকুর দিকে মুখ তুলেছিল,—এই কি সেই আদিম যুগের কিরাত জন্মান্তরে বিকৃতবদন চণ্ডাল হয়ে এসে জন্মেছে।

দশ

যাবেন নাকি হরিবাবু, চলুন।

হ্যাঁ চল?

যেতে যেতে হরিহর তার সঙ্গীকে কি যেন বল্‌তে গেল, কিন্তু তার মেজাজ বড় কড়া।

* * * * * * *

কোনরকমে একলা উঠে এসেই ছুট্‌তে ছুট্‌তে হরিহর রিং সাহেবের কাছে গেলো। কিন্তু ভালো করে কিছুই বলতে পারলে না। সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলো। হরিহরের হাত ধরে তাকে বসিয়ে ভালো করে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কী?

ছকড়ি মই থেকে পড়ে গেছে।

সর্ব্বনাশ! সাহেব তার ডাক্তার নিয়ে ছুটলো খাদের মধ্যে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। যে-খাদের মধ্যে এতদিন জলের বিন্দুমাত্র ছিল না, সেই খাদ এক বিরাট কূপে পরিণত হয়েছে!

লোকজন, কুলিমজুর সবাই এসে গেছে। যন্ত্রপাতি সমস্তই নীচে, সেইখানেই সাহেবের প্রিয় ড্রাইভার ছকড়ি চিরদিনের মত শয্যা নিয়ে শুয়েছে, কিন্তু তাকে তোলবার কি কোন উপায়ই নেই?

প্রধান ইঞ্জিনিয়ার হতাশ হয়ে ব'ললে, না সাহেব, তাকে জীয়ন্ত পাওয়ার কোন আশাই নেই। জল যে এই ভাবে উঠবে তা আমি কোনদিন আন্দাজ করতেও পারিনি এবং এর উপযুক্ত পাম্পই বা কোথায়?

হরিহর কি আজকের ঘটনাগুলো রিং সাহেবকে সবই বল্‌বে?

না, তার সাহস হয় না।

সাথী

তীক্ষ্ণ তীব্র আর্ত্তনাদে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

মধ্যরাত্রি। কোথাও কোন শব্দ নাই। কেবল মুক্ত বাতায়ন দিয়া রাজপথের অনির্ব্বাণ আলোকরশ্মি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। পার্শ্বে নিদ্রিতা স্ত্রী সুষমা। শিশু তাহার নিজের শয্যায় অঘোরে ঘুমাইতেছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ঘুমের প্রথম আমেজ কাটিয়া গেলে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। এ কি স্বপ্ন! এমন ভীষণ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ কে বা কাহারা কোথা হইতে করিয়া উঠিল?

ঘুমের ঘোরে সুষমা হঠাৎ নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। তারপর যেন ভাল করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

কি করি! উঠিয়া জলাধার হইতে এক গ্লাস জল লইয়া আকণ্ঠ পান করিলাম। ঘরের মধ্যে যেটুকু আলো আসিতেছিল তাহাতেই ঘড়ি দেখিব মনে করিতেছি, এমন সময় আর একটি চীৎকার। সে কি এক করুণ বীভৎস শব্দ! যেন শ্বাসরুদ্ধ হতভাগ্যের শ্বাস গ্রহণের প্রবল আকুতি।

এ কি! প্রবল বিক্ষোভে সুষমার সমস্ত দেহ ভীষণভাবে আকুঞ্চিত হইয়া হঠাৎ প্রসারিত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত মুখখানা দারুণ উদ্বেগে রুদ্ধরক্ত এবং প্রাণহীনার ন্যায় পাংশু ও নীল হইয়া পড়িল। তারপর কেমন একটা একটানা গোঁয়ানীর শব্দ!

—সুষমা, সুষমা! অধীর আগ্রহে কর্তব্যমূঢ় হইয়া তাহার শরীরে এক ঝাঁকানি দিলাম। সে-দেহ যেন বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা।

—উঃ—উঃ—উঃ!

—কি হয়েছে—কি হয়েছে সুষমা?

—উঃ, প্রদোষ দা', তুমি—তুমি এমন!

স্পষ্ট শুনিলাম। প্রদোষ—প্রদোষ কে? কই, এ নাম কাহারও আছে বলিয়া ত শুনি নাই। অধীর হইয়া সুষমাকে জাগাইবার জন্য গোটাকয়েক ঝাঁকানি দিয়া ডাকিলাম—সুষমা, সুষমা!

এবার যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া সে সাড়া দিল, উঁ!

—প্রদোষ কে সুষমা? চেয়ে দেখো।

চোখ চাহিয়া সে এবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই চাহনির মধ্যে কেমন একটা ব্যাকুল শঙ্কা। এক মিনিট আমার দিকে স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া সুষমা ব্যগ্র হইয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, ও গো, ও গো, একটু কাছে এসো!

—এই ত, এই ত আমি!

জোর করিয়া সে আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আরও একটু কাছে আগাইয়া আসিয়া কেমন যেন বিভ্রান্তের মত পড়িয়া রহিল।

বিবাহের পর হইতে বরাবরই সুষমা রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে, কি সব কথা বলে, কাহার সহিত কি যেন ঝগড়া করে, কিছুক্ষণ পরে আবার সে ঘুমাইয়া পড়ে। পরদিন সকালে জিজ্ঞাসা করিলে লজ্জিত হয়, বলে কই, কিছু ত জানি না। কোনদিন বলে, কি জানি, কাল রাত্রে কত কি দুঃস্বপ্ন দেখেছি—কিচ্ছুই মনে পড়ে না!

কিন্তু এমনটি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। এরূপ দারুণ চীৎকার এবং এতটা শারীরিক উদ্বেগ এ আমি এই চার বছরেও দেখি নাই।

মিনিট পনের স্থির থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু সহজে ঘুম আসিল না। অতর্কিত চীৎকার আমার সুখসুপ্ত মনে এমন একটা বিশ্রী আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, চোখ বুজিয়া থাকিলেও মনের মধ্যে সেই শান্ত সমাহিত ভাব ছিল না, যাহা নিদ্রাকে আমন্ত্রণ করে।

হঠাৎ যেন নিকটেই কাহার উপস্থিতি মনে হইল। চট্ করিয়া চোখ চাহিতেই দেখি, সুষমার মাথার কাছে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে।

তীরবেগে উঠিয়া বসিয়া ক্ষিপ্তের মত প্রশ্ন করিলাম, কে ?

কই, কেহ ত নহে! ছায়া! এ কি, আজ কি আমার নিজেরই বিভ্রম হইয়াছে না কি ? কেমন যেন, কি যেন এক অবাঞ্ছিত অস্তিত্ব এই ঘরের মধ্যে অনুভব করিতেছি।

উঠিলাম। আলো জ্বালিলাম। টেবিল ও খাটের তলা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে নিরীক্ষণ করিলাম—কোথাও কোন দুষ্ট লোক আত্মগোপন করিয়া এই ঘরের মধ্যে আছে কি না। সংবাদ-পত্রে দস্যু-তস্করের এরূপভাবে অবস্থান ও গুপ্তভাবে নানারূপ অনিষ্টাচরণের কথা প্রায়ই পড়িয়া থাকি।

না, কোন ভয় নাই। আলো নিভাইয়া পুনরায় শয্যায় আশ্রয় লইলাম। সমস্ত মন যেন কি এক অসহ্য বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। ঘড়ি দেখিলাম, রাত্রি মোটে দেড়টা। রাত একটা হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত যদি এইরূপ অনিদ্রায় কাটিয়া যায়, তাহা হইলে কাল দুপুরে অফিসে কি দুর্গতি হইবে ? এরূপ মানসিক বিকারে আমার মত সুস্থ লোকও যদি আক্রান্ত হয়—

কিন্তু ঘুমের কোন আশা নাই। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আর একটু জল পান করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইলাম।

শূন্য রাজপথ মুক্তবক্ষে তন্দ্রায় বিভোর! দুই পাশের সারিবদ্ধ দীপাধার হইতে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক সেই রিক্ত পথের উপর কি যেন এক মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। উপরে নির্ম্মল নৈশ আকাশ। তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য তারকা—

উঃ—উঃ—উঃ—উঃ—ও মা, মা গো! সুষমা আবার একটানা চীৎকার করিয়া উঠিল।

এবার এমন বিরক্তি বোধ হইল যে, ক্রোধে আমার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। সুস্থ শরীর, সবল দেহ, কিন্তু এমনই ভীরু মন যে, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেবলই মনে করিতেছে, তাহার কোন প্রবল শত্রু সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। আর এই অনর্থক ভীতি যে আর একজনের রাত্রের সমস্ত নিদ্রা ধ্বংস করিতেছে সেদিকে তাহার খেয়াল নাই। ইত্যবসরে ছেলেটার ঘুম ভাঙ্গিয়া একবার যদি কান্না জুড়িয়া দেয়—দূর হউক, মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, কাল হইতে বাহিরের ঘরেই রাত্রি যাপন করিব। কাজ নাই আমার দোতলার খাটে, এক তলার চৌকিই আমার অনেক ভাল।

জড়িত কণ্ঠে স্ত্রী যেন কি বলিল।

কোন সাড়া দিলাম না। জানালার ধারে দাঁড়াইয়া নীরবেই ধূমপান করিতে করিতে তাহার দিকে দেখিতে লাগিলাম।

অস্ফুটস্বরে হাঁপাইয়া হাপাইয়া স্ত্রী কহিল, পায়ে পড়ি পায়ে পড়ি প্রদোষ দা', আমায় তুমি ক্ষমা কর, ছেড়ে দাও!

প্রদোষ দা! এবার যেন ওই নামটির উপর আমার কেমন অকারণ কৌতূহল জমিয়া উঠিল। কই, এ নাম ত ইহার পূর্ব্বে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

স্ত্রী বলিল, প্রদোষ দা, আমায়—আমায় মাপ কর! তুমি—তুমি বিয়ে ক'রে সংসারী হও, সুখী হও!

অভাবনীয়রূপে মনে একটা আঘাত পাইলাম। চার বৎসর ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করিতেছি, শিশু পুত্রের বয়স প্রায় :এক বৎসরের কাছাকাছি। কই, কোনদিন মুহূর্ত্তের জন্যও ত স্ত্রীর কোনরূপ বাল্য-প্রণয়ের আভাষ পর্য্যন্ত পাই নাই। এমন কি, সেদিক্ দিয়া কোনরূপ চিন্তাও ত আমার মনে আসে নাই। কিন্তু এই নাম শুনিয়া—

চুপচাপ অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ধূমপান শেষ করিয়া জানালা হইতে হাত বাড়াইয়া সিগারেটের অবশিষ্ট অংশটুকু ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শয্যায় আশ্রয় লইলাম। নানারূপ বিসদৃশ চিন্তায় মনটা যেন কেমন উদাস ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

দুই

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি মনে নাই, হঠাৎ কেমন চট্ করিয়া পুনরায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পাশে দেখি, ভীষণ অন্ধকার। রাজপথের আলোক তখনও বাতায়ন দিয়া ঘরের মধ্যে আসিতেছিল। কিন্তু সেই আলো যেন আমার নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই তারপরে—হঠাৎ এক দুর্ভেদ্য স্তূপীকৃত অন্ধকার। ঘরের একাংশে আলোক, অপরাংশ যে কি ভয়াবহ বিরাট ব্যাপক অন্ধকারের গভীর আবর্ত্তে একেবারে তলাইয়া গিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়। রোমাঞ্চিত শরীরের সমস্ত পেশীগুলি অলৌকিক ভয় ও অচিন্ত্যনীয় আতঙ্কে ছিন্নশির পশুর মত একত্রে এমন কম্পিত হইতে লাগিল যে, আমার নিজের উপর স্বাধিকার স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই আমি জ্ঞানহীন জড়ের মত স্থাণু হইয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু সেই অবস্থাতেই মনে মনে বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হইতে লাগিলাম—এ কি ভৌতিক মায়া, না মানসিক ব্যাধি!

—এমনি ক'রে তোমাদের মাঝখানে আমি একটা পাহাড় খাড়া করবো। তুমি জানো আমি কে?

সম্পূর্ণ অপরিচিত এক কণ্ঠস্বর যেন আমারই অতি নিকট-ব্যবধান হইতে পুরুষকণ্ঠে আমাকে সম্বোধন করিল। নিরুত্তরে পড়িয়া আছি। সেই কণ্ঠ মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় গম্ভীর স্বরে কহিল, সেই পাহাড় যা' আমার বুকে তুমি নিজে হাতে ক'রে চাপিয়ে দিয়েছিলে সুকুমার!

অন্ধকারে নিজের নাম ধরিয়া সম্বোধিত হওয়ায় ভয় ও বিস্ময়ে সম্পূর্ণ

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং সারা দেহের লুপ্ত বীর্য্যকে একত্রিত করিয়া বিপুল উদ্যমে মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া একেবার উঠিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথমেই ছুটিয়া আসিলাম ছেলের কাছে। খোকা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছিল। তারপরই বিছানায় উপুড় হইয়া সুষমার গায়ে হাত দিয়া তাহাকে সজোরে ঠেলা দিলাম, শুন্‌ছো শুন্‌ছো?

বিকট এক অট্টহাস্য যেন আমার সেই ক্ষুদ্র শয়ন কক্ষকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া সারা নৈশ রজনীকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সেই সঙ্গে আমি যেন পাগল হইয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া পড়িয়া সুষমাকে উপর্য্যুপরি কঠিনভাবে আঘাত করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলাম। সম্পূর্ণ অকারণেই মনে হইতে লাগিল, সুষমা আমার নাই! তাহার দেহ যেন হিমের ন্যায় শীতল, পাথরের ন্যায় শক্ত। চোখ ফাটিয়া জল আসিবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময় সুষমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কি গো, কি হয়েছে?

তাহাকে দুই হাতে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, আমি—আমি বড় ভয় পেয়েছি! কিন্তু ভাল করিয়া কথাগুলি বলিতে পারিলাম না, গলা এবং শরীর তখন এমনই কাঁপিতেছিল।

আমার এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারে সুষমাও কেমন যেন হইয়া গেল। কিন্তু কোনরূপ চাঞ্চল্য না দেখাইয়া আমার মাথাটা তাহার কোলের উপর টানিয়া শোয়াইয়া ধীরে ধীরে আমার চুলের ভিতর হাত বুলাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিলে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত কথা নূতন করিয়া স্মরণ করিতে নিজেরই মনে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। স্ত্রীর নিকট এই যে ভীরুতা প্রকাশ করিয়াছি, ইহার কি এমন কৈফিয়ৎ দেওয়া

যায় যাহাতে আমার সাহস ও পুরুষত্ব এই নারীর চক্ষে অটুট থাকে। সত্য যাহা ঘটিয়াছে তাহা যদি অকপটে বিবৃত করি, তাহা হইলে কোন সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই বিশ্বাস করিতে পারে না। এমন কি, আমিও বোধ হয় অপরের সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা বিশ্বাস করিতাম না। ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল, প্রদোষ দা'র কথা। প্রদোষ—এই লোকটি কে?

ভাবিলাম, স্ত্রীর নিকট ভীরুতার অপমান হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে নূতন এক চাল দেওয়া প্রয়োজন। মন এবং কণ্ঠকে যতদূর সম্ভব শান্ত ও সংযত করিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলাম, সুষমা।

—কি?

—প্রদোষ দা বলে কাউকে তুমি চিন্‌তে কি?

স্পষ্ট অনুভব করিলাম, সুষমা যেন একবার চমকিয়া উঠিল। বলিল, তুমি ঘুমোও।

এই কথা বলার ভঙ্গী হইতে বুঝা যায় তাহার সমস্ত মন যেন উদ্বেল হইয়া বাক্‌যন্ত্রের মধ্যে এক অস্বাভাবিক জড়তা ও সঙ্কোচের সৃষ্টি করিয়াছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার যে কি পরিবর্ত্তন আসিল জানি না! সোজা উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্পষ্ট এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম, প্রদোষ তোমার কে?

সুষমার সমস্ত মুখ যেন মৃতার মত পাংশু হইয়া গেল। জিব দিয়া ঠোঁট ভিজাইয়া লইয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, সে অনেক কথা, পরে বল্‌বো।

—না, এখনই বলো! আমার বেশ মনে পড়ে, আমার কণ্ঠে এক দানব তখন অধিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সুষমার জীবনে সে এরূপ বিব্রত বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। শূন্যদৃষ্টিতে সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জোর করিয়া বলিলাম, বলো সে কে?

সুষমা হঠাৎ আমার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। অশ্রুসিক্ত চাপাকণ্ঠে কাতর অনুনয়ে আমায় এইটুকুই জানাইল যে, সে এক অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে এবং আমি যেন সে-রাত্রের মত তাহার নিকট কোন প্রশ্ন না করি।

মনের মধ্যে কেমন একটা দারুণ বিতৃষ্ণা লইয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথাটা আমার কোল হইতে ঠেলিয়া নামাইয়া দিয়া শয্যায় নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিলাম। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কোন্ সময় যে আমারই পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া উপুড় হইয়া শুইয়াছিল, তাহা একেবারেই খেয়াল করি নাই।

তিন

দারুণ অবসাদের পর প্রভাতে নিদ্রান্তে চাহিয়া দেখি, সুষমা সেইভাবেই পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সযত্নে তাহাকে বিছানায় শোয়াইবার জন্য ব্যগ্র বাহু দুইটি যেন আপনা হইতেই উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল, হয় ত তাহাকে স্পর্শও করিয়াছিল—কিন্তু হঠাৎ কাল রাত্রের সেই অজ্ঞাত প্রদোষ যেন আমাদের মধ্যে আসিয়া কি এক নিষ্ঠুর ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। উদ্যত বাহুদ্বয় ফিরিয়া আসিল। দুঃখও কিছু কম পাইল না। মনে মনে মায়াও হইতেছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু না বলিয়া উঠিয়া যাইব মনে করিতেছি, হঠাৎ দেখি—এ কি, তাহার কোলের কাছে টাট্‌কা তাজা রক্ত!

তাহার কাঁধে হাত দিয়া মুখটি তুলিতেই ভীত ও বিস্মিত হইলাম। তাহার নাক ও মুখ দিয়া অজস্র রক্ত বাহির হইয়া চিবুক ও বক্ষ সিক্ত করিয়া কোলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কখন ও কিরূপে যে এই রক্তপাত হইয়াছে তাহা জানি না, কিন্তু নিশ্চয়ই উহা বহুক্ষণ পূর্ব্বে হইয়াছিল কারণ, তখন সেই রক্তের ধারাগুলি একান্তভাবে শুকাইয়া গিয়াছে।

ভীত ও ব্যাকুল হইয়া সুষমাকে কয়েকবার ডাকিতেই সে অস্ফুট কণ্ঠে সাড়া দিল জিজ্ঞাসা করিলাম, সুষমা, কি হ'ল তোমার?

কেমন এক অব্যক্ত স্বরে সে আমার প্রশ্নের যে কি উত্তর দিল তাহা বুঝিলাম না। ধীরে ধীরে তাহাকে শোয়াইয়া দিলাম। আকুল ও অধীর চিন্তায় কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় খোকা তাহার শয্যা হইতে শব্দ করিয়া জানাইয়া দিল যে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তাহার নিকট

গিয়া তাহার আবশ্যকীয় পরিচর্য্যা করিতেই সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল মাতৃ স্তন্যের জন্যে।

খোকাকে থামাইতে না পারিয়া এবং সকালের আলো ফুটিতেছে দেখিয়া আমি দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। ভাবিলাম, পিসীমার নিকট খোকাকে দিয়া সুষমার কি ব্যবস্থা করা যায় তাহা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখি, পিসীমা ঘরে তালা দিয়া গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়াছেন। নিশ্চয়ই সেদিন কিছু একটা শুভযোগ ছিল। পুণ্যলোভে এমন করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে স্নানে যাইতেন।

ছেলেটি তখন থামিয়াছিল। তাহাকে লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছি, শুনিলাম ঘরের ভিতরে কে যেন কথা কহিতেছে। বিপদের সময়ও মানুষের মনে কৌতূহল হয়। দরজার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। শুনিলাম, সুষমাই কথা কহিতেছিল।

বিস্মিত হইলাম। যে লোক আমার আহ্বানে অস্ফুট উত্তরও দিতে পারে নাই, সে ত এখন বেশ কথা কহিতেছে। মিনতির স্বরে বলিতেছে, প্রদোষ দা, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—

উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। থামিয়া থামিয়া সে যেন বলিতে লাগিল, খোকা—আমার খোকা! একটু পরে পুনরায় বলিল, আমি—আমি কি করবো প্রদোষ দা, আমার কি অপরাধ?

ক্ষণকাল নীরবতার পর একটা প্রবল নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম সঙ্গে সঙ্গে সুষমা যেন কাতরভাবে বলিল, উঃ!

আর থাকিতে পারিলাম না, ছুটিয়া গিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সেখানে ঢুকিয়াই যে বীভৎস দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আমি এ জীবনে ভুলিব না। সুষমার নাক ও মুখ দিয়া প্রচুর রক্তপাত হইয়া নূতন করিয়া শয্যা ও উপাধান সিক্ত করিয়াছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া খোকা ত কাঁদিয়াই

অস্থির। কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত করিবার সময় নাই। তাহাকে তখন তাহার রেলিং দেওয়া খাটের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া সুষমাকে ধরিলাম। বস্ত্রের সাহায্যে যতদূর সম্ভব মুছাইয়া দিয়া জল লইয়া মাথায় ও মুখে দিলাম এবং আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কতক্ষণে পিসীমা ফিরিয়া আসেন। তাঁহার নিকট রোগীর ভার দিয়া ডাক্তারের সন্ধানে বাহির হইব।

চার

শোণিতপাতের মধ্য দিয়া যে সূর্য্য উদিত হইয়াছিল, চিতার উপর কাঠ সাজাইতে সাজাইতে সেই সূর্য্যের অস্তগমন দর্শন করিলাম। সারাদিনের বিবরণ ঠিক্‌মত মনে নাই। শুধু ইহাই মনে পড়ে যে, বহু চিকিৎসকের আপ্রাণ চেষ্টা সেদিন সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইয়াছিল। সারাদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকা যখন পিসীমার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় কিছুক্ষণের জন্য সুষমার জ্ঞান আসিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া আমার দিকে সে কয়েকবার দেখিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেমন আছ?

ক্ষীণকণ্ঠে সুষমা উত্তর দিয়াছিল, চল্‌লুম, সে আমায় ছাড়ছে না!

মুমূর্ষুর উত্তরেও আমার পাষণ্ড মন ক্ষণিকের জন্য বিরূপ হইয়াছিল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কে সুষমা, কে ছাড়ছে না?

—তুমি চেনো না, সে বড় ভয়ানক লোক!

চার বছরের ঘনিষ্ঠ অশ্রু পুঞ্জীভূত হইয়া উত্তর দিয়াছিল, না সুষমা, আমিও তোমায় ছাড়বো না! তুমি—খোকা যে তোমায় ছাড়বে না সুষমা!

সুষমার শুষ্ক ওষ্ঠে একটা ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর কোন উত্তর সে দেয় নাই।

গঙ্গার তীরে বেঞ্চের উপর দুইজনে বসিয়া আছি, আমি ও সুষমার অনুজ ভ্রাতা সুনীল।

আমাদের প্রতিবেশী ও বন্ধুস্থানীয় দুইটি ভদ্রলোক চিতার অদূরে বসিয়া বসিয়া ধূমপান ও আবশ্যকমত চিতার অগ্নিশিখাকে দাহকার্য্যে সহায়তা করিতেছিল। সারা পৃথিবী তখন আমার চক্ষে ম্লান ও একাকার হইয়া গিয়াছে। সুনীল মধ্যে মধ্যে তাহার দিদির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া আমাকে সজাগ রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল।

হঠাৎ মনে পড়িল, প্রদোষের কথা। প্রদোষ কে?

বলিলাম, সুনীল, আজ যদি তোমায় একটা প্রশ্ন করি, তুমি কি আমায় সত্য উত্তর দেবে?

আমার এই ভূমিকায় বিস্মিত হইয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কি প্রশ্ন বলুন, জান্‌লে নিশ্চয়ই বল্‌বো।

—ঠিক্ বল্‌বে ত?

ছেলেটি তখন বি-এ ক্লাসে পড়িতেছিল। আমার এই কথায় সে আহত হইয়া বলিল, জামাইবাবু, দিদি গেলেও খোকা ত রয়েছে। আমাদের কি এর মধ্যেই এত পর বলে মনে করেন।

বলিলাম, না ভাই, পর বলে মনে করি না। তবে প্রশ্নটায় হয় ত কিছু ব্যথা থাক্‌তে পারে, তাই তোমায় বল্‌তে ঠিক্ মন সর্‌ছে না। অথচ, এই প্রশ্নটার সমাধানের ভেতরেই যেন তোমার দিদির মৃত্যু-রহস্য লুকিয়ে আছে।

উদ্‌গ্রীব হইয়া দিদিহারা ছেলেটি আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন এখনই এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া সে তাহার দিদিকে ফিরাইয়া আনিবে।

ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলাম, প্রদোষ কে? প্রদোষ বলে কি সুষমার পরিচিত কেউ ছিল?

সুনীলের মুখটা সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। পাল্‌টা প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি প্রদোষদা'র সম্বন্ধে কি শুনেছেন বলুন?

শ্মশানে গঙ্গাতীরে বসিয়া স্বীকার করিতে হইল যে, প্রদোষ সম্বন্ধে আমি এতাবৎকাল কিছুই শুনি নাই, কেবল কাল রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় সুষমার মুখ হইতে তাহার নাম শ্রবণ করিয়াছি।

বিস্মিত হইয়া সুনীল আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কাল রাত্রে—দিদির মুখে!

বলিলাম, হ্যাঁ।

—আচ্ছা, কত রাত্রিরে—তখন ক'টা?

—প্রায় একটা হবে।

দারুণ বিস্ময়ে সুনীল আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, প্রদোষ দা' যে কাল মারা গেছেন—রাত্রি তখন বোধ হয় বারোটা।

—মারা গেছে! আমার মুখ দিয়া অস্ফুট স্বরে কথাটা বাহির হইয়া আসিল, আচ্ছা, সে তোমাদের কি রকম দাদা?

সাবধান হইয়া সুনীল বলিল, দাদা, মানে আপনার দাদা নন্, তবে আমার বাবার সঙ্গে তার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। ওঁরা দু'জনে একসঙ্গে জমি কিনে এক 'প্লটে' দু'খানা বাড়ী করেছিলেন। এই—

বলিলাম, আচ্ছা, তোমাদের বাড়ীর পূর্বদিকে লাগাও যে বাড়ীখানা আছে, ওই বাড়ীটাই কি প্রদোষের?

সুনীল বলিল, হ্যাঁ।

—আচ্ছা, ওদের সঙ্গে তোমাদের খুব ঝগড়া ছিল না? আমার বিয়ের সময় থেকেই ত তাই শুনে আসছি।

বিব্রত হইয়া সুনীল বলিল, 'হ্যাঁ, সে সব অনেক কথা। আমি—আমি ঠিক্ জানি না। তবে কাল রাত্রে প্রদোষ দা' যখন মারা যান, তখন আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি আজ প্রায় তিন চার বৎসর ভুগ্‌ছিলেন কি না।

মুখে আর কিছু বলিলাম না, কিন্তু মনে মনে কত কি সম্ভাবনাই নীরবে চিত্রিত হইতে লাগিল। দুই বন্ধু, বন্ধুত্বের প্রাবল্যে একত্রে জমি কিনিয়া তাহারই উপর এক দেওয়ালে বাড়ী, ছেলেমেয়ে সকলেই প্রদোষ দা' বলিয়া ডাকে, তারপর ঝগড়া, বাক্যালাপ রহিত, চার বছর যাবৎ পীড়া এবং শেষ পর্য্যন্ত মুমূর্ষুর প্রলাপোক্তি—এ সব একত্র করিলে যাহা সূচিত হয়, তাহা ভগবানই জানেন!

রাত্রি আবার গভীর হইতে লাগিল। আজ এই গঙ্গাতীরে শ্মশানের মধ্যে পরম উদাসীনভাবে বসিয়া আছি। মনে যেন কিছুমাত্র বিক্ষোভ নাই, কাহারও উপর কোনরূপ ক্রোধ নাই। হিংসা-দ্বেষের অতীত দৃষ্টি লইয়া নদীপারের জাগরুক পথপ্রান্তীয় আলোকমালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সময় কাটাইতেছি। মধ্যের গঙ্গা সুস্থিরে বহিয়া চলিয়াছে। চন্দ্রের আলো, নক্ষত্রের আলো, মধ্য রাত্রির স্তিমিত এক অপূর্ব্ব আলোক, সমস্ত আলোকণা একত্রে মিলিত হইয়া প্রবাহিনীর বক্ষের উপর কেমন এক অপার্থিব মায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। গঙ্গার বিশাল বিস্তৃতি দেখিয়া মনে হয়, উহা যেন জল নহে, উহা এক অনন্ত প্রসারিত পথ। জীবনের উচ্চনীচ গিরিমালা হইতে নির্গত হইয়া এই পথ যেন মানুষকে সমস্ত নীলিমার দিকে, অতল শূন্যতার দিকে চালিত করে। ধীরগতি জলরাশির সেই একই ইঙ্গিত, কূলের সহিত মৃদু সংঘাতে যে অস্ফুট ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তাহার ব্যঞ্জনাতেও সেই অভিন্ন ভাব। আজ যেন মনে হয়—নদীর উপর পা দিয়া আমরা হাঁটিতে পারি, নদী যেন আমায় এই পৃথিবী হইতে কোন এক সুখের শাশ্বত পৃথিবীতে লইয়া যাইবে।

সুনীলের আহ্বানে চকিত হইলাম। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে ডাকিতেছে, জামাইবাবু!

—কি?

—চলুন, শেষ হয়ে গেছে।

চাহিয়া দেখি, চিতা নির্ব্বাপিত। প্রতিবেশী বন্ধুগণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই-একটা ডোম বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। একজন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কোথা দিয়া কলসী-পূর্ণ জল আনিলে কম পিছল হইবে, বকৃশিসের আশায় এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া তাহারই সন্ধান বলিয়া দিতেছিল।

নিযমিত কাজ ত করিতেই হইবে। বুক যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলেও সংস্কার তোমায় ছাড়িবে না—সামাজিক বিধান ষোল আনাই পালন করিতে হইবে।

একে একে কলস পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া ঢালা হইতে লাগিল। অন্য লোকের অভাবে আমাকেই আজ অস্থি লইয়া জলে ভাসাইতে হইবে। দীর্ঘ চার বৎসর ধরিয়া যাহার সহিত সুখে-দুঃখে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম, আজ তাহার দেহাবশেষ মৃত্তিকার মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া মাটির সরায় রক্ষা করিয়া দুই হস্তে সযত্নে বক্ষের নিকট ধারণ করিলাম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে ছিল না, এই মৃত্তিকা স্তূপকে আজ গঙ্গার কোলে সমর্পণ করিবার পরও সে থাকিবে না, কিন্তু সুষমার এই সুদীর্ঘ গতির যে চিহ্নগুলি আমার বক্ষের পঞ্জরে পঞ্জরে গভীরভাবে ক্ষোদিত ও একান্তভাবে বিজড়িত, আমার তুচ্ছ সুখ-দুঃখের অম্লান স্মৃতিমালায় কি সেই বিশাল ব্যবধান আদৌ পরিপূরিত হইবে?

জলের মধ্যে নামিয়া গেলাম। সুনীল আমার পাশেই ছিল। বন্ধুদ্বয় শুষ্কবস্ত্র আনিতে ভুলিয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি উপরে ঘরের দিকে কাপড়ের সন্ধানে ছুটিয়া গেল। একবুক জলে আসিয়া সরাখানি গঙ্গার মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। মন্ত্র জানি না, কিছু বলিও নাই। কিন্তু বোধ হয় আমার অকথিত বাণীই সেই গত আত্মার মর্ম্মকে সেদিন যেরূপ স্পর্শ করিয়াছিল,

নব-বিবাহিতের আকুল আগ্রহও হয় ত সেরূপে তাহাকে উদ্বেলিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

—ও কি! অস্ফুট কণ্ঠে স্থনীল আমায় অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল।

স্থির গঙ্গা, তাহারই প্রবহমান জলের উপর দিয়া দুইটি পথিক হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। একজন পুরুষ, অপরটি নারী।

স্থনীল তখন আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আমার হাত ধরিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, প্রদোষ দা'!

স্থপুরুষ বটে! তাহারই পার্শ্বে স্থষমা—ম্রিয়মাণ,—অত্যন্ত ম্লান। প্রদোষের কঠিন পাশ হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া সে যেন অসহায়ভাবে তাহারই সহিত চলিতে বাধ্য হইয়াছে।

দেখিলাম—কিন্তু আজ আমার কোন ক্ষোভ নাই। কাল রাত্রে যাহার নামটুকু মাত্র শুনিয়াই উত্তেজিত হইয়াছিলাম, আজ তাহার ছায়া-মূর্ত্তিকে স্থষমার সহিত একত্রে, মৃত্যুপারের সঙ্গীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াও আমার কোন ক্রোধ নাই, ঈর্ষা-অসূয়ার লেশমাত্রও নাই!

পাটকলের ঘড়িতে তখন ঢং করিয়া একটা বাজিল।

কেশগুচ্ছ

চট্ করে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি—বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে !

অপার বিস্ময়ে শয্যার ওপর উঠে বস্‌লুম। এ কি! স্তব্ধ গভীর রাত্রি, সুপ্ত এই বিশাল মহানগরী। নক্ষত্রখচিত আকাশের যে অংশটুকু মুক্ত বাতায়ন-পথে ঘর হইতে পরিদৃশ্যমান, সেটুকুও রাত্রির স্পর্শে নিদ্রামগ্ন। আকাশের সুশান্ত আশীর্ব্বাণী বহন করে শেষ রাত্রের মৃদু হাওয়া এই দরিদ্রের মেসের গবাক্ষ-পথে প্রবাহিত। কিন্তু তার মধ্যে এ কে—আমার মত হতভাগ্যের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে এ কোন্ দেবী ?

কিন্তু যেই হোক্, মেয়েটী সুন্দরী। বয়স তার কুড়ির মধ্যে। দাঁড়াবার ভঙ্গীটুকু ঈষৎ রাগত, কিন্তু সুঠাম অঙ্গ ও দৃপ্ত ভঙ্গীতে কি যেন এক ত্রস্ত ভীতি ও প্রবল আকর্ষণ মিশ্রিত রয়েছে। কেমন যেন পরমাত্মীয়ের স্পর্শ—অথচ, রাজ্যেশ্বরীর দুর্লঙ্ঘতা,—সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য ও অরণ্যানীর জটিলতা আমার সাম্‌নে বুঝি রূপ নিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে। ভীতনেত্রে হতবাক্ হয়ে আমি যেন আর আমি নেই।

কথাটা সেই কইলে। লালিত্যময়ী সুন্দরীর পরুষ কণ্ঠে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলুম। আমার দিকে পূর্ণ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে সে প্রশ্ন করলে, আমি তাকে কেন এনেছি ও ধরে রেখেছি ?

আমি ? এ কি কুহক, এ কি স্বপ্ন, এ কি রাত্রের মায়া ! থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। মুখ দিয়ে বোধ হয় যেন কিছু প্রতিবাদ করতেও

চেষ্টা করেছি। হাতের আঙুল দিয়ে ইসারা করে ওই অজ্ঞাত দেবী আমায় আদেশ দিলে, বসুন।

কাঁপতে কাঁপতে চৌকির ওপর থপ্ করে বসে পড়লুম। এবার নজর পড়ল আমারই ঘরের অপর বাসিন্দা অধীশবাবুর দিকে। তিনি আর আমি দু'জনেই ব্যাঙ্কে চাকরী করি। সারাদিন কলম পিষে, বড় বড় টাকা আনা পাই যোগ দিয়ে, সন্ধ্যার সময় বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে, ধুঁকতে ধুঁকতে ট্রাম ভাড়া বাঁচিয়ে পদব্রজে বউবাজার ষ্ট্রীটের 'রয়াল মেসে' ফিরে আসি। হিদারাম বাঁড়ুয্যের লেন থেকে অসম্ভব সরু সেই গলি। কোনরকমে দু' পাশের শেওলা ধরা দেওয়ালের কদর্য্য স্পর্শকে বাঁচিয়ে মেসে এসে পৌছুই। তারপর সামান্য আহারাদি শেষ করে রাত্রির অকুণ্ঠ নিদ্রা। দেশে স্ত্রী আছে, ছোট একটি ছেলেও হয়েছে। কি আমি, কি অধীশবাবু দু'জনের কারুরই নারীর দিকে কোনরকম নজর একেবারেই নেই—অন্ততঃ, প্রেমের কথা ভাবার সময়টুকুও যে আমরা পাই না, সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কিন্তু তাদেরই ঘরে এ কে আজ দুপুর রাত্তিরে এল! আমার চৌকির অপর কোণ চেপে মেয়েটি বসলো। কঠিন স্বরে সে ডাক্‌লে, অমিয়বাবু!

বিস্ময়ে ত্রস্ত হলুম—ও আমার নাম জানে! ভয়ে ভয়ে মুখের দিকে চেয়ে দেখতে কঠোর ও দৃঢ়কণ্ঠে সে বল্‌লে, এখন বলুন, আপনি কি জন্য সেধে আমায় ঘাড়ে করে নিয়ে এলেন এবং কেনই বা আমাকে বন্দী করে রেখেছেন?

হাতে হাত কচ্‌লে নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়ালুম। বল্‌লুম, আপনি—আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন, আমি ত আপনাকে—

দৃষ্টির ভঙ্গীতে আদেশ করে সে বল্‌লে, বসুন। ও সব চালাকী আমি শুন্‌বো না—আমি এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে চাই।

কপাল ও বুক দিয়ে তখন আমার টস্‌টস্ করে ঘাম ঝর্‌ছে। মুখ,

বুক ও গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একবার মনে হলো অধীশ-বাবুকে ডাকি। আবার মনে হলো, না, মেসের ঘরে ও মেয়েটা মিথ্যেই বলুক আর যাই বলুক, আমার কথা কেই বা বিশ্বাস করবে? হয় ত পুলিস কেসে পড়ে যাব, কিম্বা গণ্ডগোলে চাকরীটুকু—

বললে, কি, এখন বসে বসে ভাবা হচ্ছে কি? আন্‌বার সময় না বুঝে এনেছেন কেন? বড় যে বন্ধুপ্রেম, এখন বুঝুন।

বল্‌লুম, আপনি অনর্থক আমার ওপরে রাগ করছেন মা। আমি আপনাকে—

তীক্ষ্ণ উচ্ছল হাস্যে ঘরখানা সে ভরিয়ে দিলে। শুধু ঘর কেন, বোধ হয় যেন নীরব রাত্রে সমস্ত পাড়াটাই তার হাসির সূক্ষ্ম অথচ তীব্র শব্দে পূর্ণ হয়ে গেল। সেই শব্দে আমার বুকের রক্ত যেন স্থির হয়ে জমে গেছে। ভয়ে ভয়ে ওদিকে চেয়ে দেখি, অধীশবাবু ঘুমের ঘোরেই একটু নড়েচড়ে পাশ ফিরলেন।

হাসি থামিয়ে মেয়েটি বল্‌লে, 'মা!' তার কণ্ঠস্বরে তীব্র শ্লেষ! মাথাটা নাড়্‌তে নাড়্‌তে আর একবার আপন মনে বল্‌লে, মা! মা! বলি অমিয়বাবু, মায়ের সম্মান কি রাখ্‌তে জানেন আপনারা? কে আপনার মা, কতটুকু সম্মান তাকে দিয়েছেন? বলি নারী কখনও দেখেছেন, রমণীকে ভোগ করেছেন, মা কথাটা উচ্চারণ করবার আগে মা বলার দায়িত্ববোধ কতটা সে খেয়াল কি আছে আপনার?

আর একবার মনে হলো, এ কে? কিন্তু যেই হোক্‌, এ ভাবে বেশীক্ষণ বসে বসে কথা বলা ত ভাল নয়। সকাল হয়ে এল। ম্যানেজার ত এখুনি উঠ্‌বে, আর আমারই সাম্‌নের বারাণ্ডা দিয়ে নীচে যাবে—তাই ত!

হাসিমুখে মেয়েটি বল্‌লে, ভাবছেন কি? একটু থেমে তার আঁচলটা আঙুলে পাকাতে পাকাতে বল্‌লে, হয় ত মনে কচ্ছেন এ পাপ কতক্ষণে

বিদেয় হবে, কতক্ষণে সব ঝেড়েঝুড়ে ফেলে আমি ঝাড়া-হাত-পা হবো—কেমন, এই না ?

তার হাসিমুখ ও সামান্য একটু তরল ভাব দেখে আমার যেন কেমন সাহস হলো। বললুম, দেখুন, আপনি ভুল কচ্ছেন। আমি আপনাকে কখনো দেখি নি, আপনার কোন অনিষ্টই আমি জ্ঞানতঃ করি নি, আমার ওপর রাগ কোন কারণেই আপনার হ'তে পারে না, আপনি কা'কে চান বলুন ত ?

—আমি চাই আপনার বেহারীকে। চিন্‌তে পাচ্ছেন বেহারী কে ?

—কে বেহারী ?

—আপনার বন্ধু শ্রীমান্ বনবিহারী। মনে পড়েছে কি তাকে ? তার কণ্ঠে কি তীব্র শ্লেষ—যেন জিঘাংসার তীক্ষ্ণতম শর সেই শব্দের ধনুক।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কে ?

—কেন পরিচয়টা না দিলে কি সুখ হচ্ছে না ? ক্রন্দনের উচ্ছ্বসিত বেগ সে রোধ করতে না পেরে আমার সেই বিছানার ওপর একেবারে ফেটে পড়ল।

ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে কি যে করবো কিছুই ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত অধীশবাবুকে ডাকবার জন্য উঠ্‌ছি, সে উঠে বস্‌ল। বল্‌লে, অমিয়বাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি বসুন। লোক ডেকে মিথ্যা আর কেলেঙ্কারী বাড়াবেন না। আমি বড় ঘরের মেয়ে ছিলুম। লজ্জা বলে কোন জিনিষ আপনার হয় ত নেই, কিন্তু আমার এখনও আছে। তারপর যোড় হাত করে জলভরা চোখ নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, অমিয়বাবু, দয়া করে আপনি আমায় মুক্তি দিন !

তার কথা শুনে কি যে উত্তর দেবো ভেবে পেলুম না। মুক্তি আমি তাকে দেব, না সে আমায় দেবে ?

দুই

বল্‌লে, বেহারীর সঙ্গে আমার ছিল অনেক দিনের পরিচয়। তা তার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধই থাক্ না কেন, আপনি কেন গায়ে পড়ে আমায় নিয়ে এলেন ?

এবার মরিয়া হয়ে উঠেছি। বল্‌লুম, মাপ করবেন, আমি আপনাকে আনি নি—এর আগে আমি আপনাকে কখনও দেখি নি। বেহারীর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানি না, শুনি নি। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন। আমার মাথা বেশ সুস্থ আছে এবং সুস্থভাবেই কথা বল্‌ছি।

মেয়েটিও যেন অল্পে অল্পে গরম হয়ে উঠ্‌লো। বল্‌লে, আপনার মাথা সুস্থ থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার তা' নেই, আর আমার মত অবস্থায় পড়লে মাথা সুস্থ থাকা সম্ভবও নয়।

মনে মনে বল্‌লুম, তা' ঠিক। আমিও যে আর বেশীক্ষণ ঠিক থাক্‌বো, তা' বোধ হয় নয়। কিন্তু সে বলেই চল্‌লো। বল্‌লে, অমিয়বাবু, আপনি কি ভাব্‌তে পারেন, মানুষের ওপরে মানুষের কতখানি বিশ্বাস থাক্‌লে সে তার জন্য সব কিছু ছাড়তে পারে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, সম্মান ও আশা, জীবন—এমন কি সমস্তই একজন অপরকে উৎসর্গ করতে পারে কতটা সাহস এবং কতটা জোর থাক্‌লে ? আর এই আশা ও জোরের ওপর যদি প্রকৃত মিলন হয়, আপনি কি কল্পনা কর্‌তে পারেন সে মিলনে কি অফুরন্ত আনন্দ হ'তে পারে ? তার গতিবেগ কি অমানুষিক হবে তা' কি আপনি ভাবতে পারেন ? এই সঙ্গে আরও ভাবুন—আপনি যার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করলেন, সে

যদি আপনার কাছে বিশ্বাসঘাতী হয়? বাঁধনের ঘৃণায় নিরেট মাটিকে দূরে ঠেলে একখানি নৌকামাত্র সম্বল করে জলে নেমে এসে যদি দেখেন, সে নৌকাটা কাঁচা মাটি দিয়ে তৈরী, তবে বলুন ত আপনার অবস্থাটা কি হয়? ধূলো কাদা মেখেও লোকে নিরেট মাটিতে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কাঁচা মাটির নৌকা? হাত-পাগুলো এলিয়ে দিয়ে সে বল্‌লে, ভুল—ভুল করেছি অমিয়বাবু! জীবনে এত বড় ভুল বুঝি আর কেউ কখনও করে না, এতখানি প্রতারিতও আর কেউ কখনও হয় নি! কিন্তু আপনি, আপনি ত খারাপ লোক নন? আপনি আমায় মুক্তি দিন। দেবেন না? উৎসুক ও আশাপূর্ণ চোখ দু'টি আমার মুখের ওপর সে আর একবার তুলে ধরলে।

কি এক অপার মোহ যেন ধীরে ধীরে আমায় গ্রাস করেছে। শব্দহীন নীরব রাত্রি! আশেপাশে, সম্মুখে কোথাও কোন জাগ্রতের কৌতূহলী দৃষ্টি আজ আমাদের ওপর নেই। সম্মুখে নারী মূর্ত্তি—কি এক অজ্ঞাত বেদনা ও উচ্ছ্বাসে তার অপরূপ মোহিনী অবয়বে সে আমার সামনে আজ অবতীর্ণা। তার বুকের প্রতিটি উত্থান পতন আমি স্পষ্ট অনুভব করছি। নবনীত কোমল শুভ্র কণ্ঠদেশের দুই পার্শ্বের দুইটি শিরা যেন প্রবল উত্তেজনায় ঘন ঘন স্ফীত ও নমিত হচ্ছে। নির্ম্মল ও বড় দুই চোখ, অল্প আলোকে আমি দেখ্‌ছি তার সিক্ত দুই পল্লব, তার ব্যথাময় মুক্ত দৃষ্টি আমার মুখের ওপর অপলকে নিবদ্ধ, তা'তে আছে হতাশের ভিক্ষা—কিন্তু প্রার্থীর কামনা যে দাতার কল্পনারও অতীত।

অপার্থিব তন্দ্রায় কেমন এক আচ্ছন্নতা! নারীর কমনীয় সান্নিধ্যে মনের সমস্ত বিস্ময় ও আশঙ্কা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল প্রগাঢ় শান্তিতে। সেই কামনাহীন, জ্বালাহীন সৌন্দর্য্যে সুদূর এক নিভৃতির ভাব যেন প্রস্ফুট! সে মানুষকে ক্রমাগতই কাছে আনে কিন্তু গ্রাস করে না,

কোলে নেয় কিন্তু আলিঙ্গন দেয় না, সে চিত্তের শান্তি আনে, তা'তে উন্মাদনার নেশা নেই। তাই বুঝি মন আমার ঘুমিয়ে গিয়েছিল এবং পরে তখনই আমার জ্ঞান ফিরে এলো, যখন সে আমার নাম ধরে ডাক্‌লে, অমিয়বাবু!

—বলুন?

—আপনি আমায় ছেড়ে দিন—আমি চলে যাই।

বল্‌লুম, দেবী, আপনি আমায় অনর্থক কেন প্রতারণা কচ্ছেন? আপনাকে বন্দী করার শক্তি আমার কোথায়? সে ইচ্ছাও ত আমার নেই।

—তবে আমি যার জন্যে দূরে সরে এসেছি, তারই কাছে আমায় পাঠিয়ে দিন।

যেন অৰ্দ্ধসুপ্তভাবেই প্রশ্ন করলুম, সে কে, আর কেমন করেই বা পাঠাবো?

—সে বেহারী—আমার আসনটি তারই কাছে পাঠিয়ে দিন।

—আপনার আসন?

—হ্যাঁ, আমার আসন, যার বাহ্যিক নৈকট্য আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না!

—সেটা কি, সে কি আমার কাছে?

—আপনারই কাছে এবং তা' অতি তুচ্ছ, সে আমার মাথার একগুচ্ছ চুল।

আর একবার বিস্মিত হলুম। তন্দ্রার লেশটুকুও চলে গেল। শক্ত হয়ে বসে বল্‌লুম, কি বল্‌ছেন?

—আমার মাথার একগুচ্ছ চুল! ওই চুলের গোছার সঙ্গে আমায় একত্র থাক্‌তে হয়, আমি থাক্‌তে বাধ্য, আর সেই জন্যই আজ আপনার ঘরে আসতে বাধ্য হয়েছি।

—সে গোছাটি কোথায় আছে ?

—এই চৌকির নীচে, বাক্সের মধ্যে।

জানা থাকা সত্ত্বেও ঘাড় হেঁট করে আর একবার দেখ্‌তে হলো কোন্ বাক্সের কথা সে বল্‌ছে। দেখি, পূর্ব্বের মত দুইটি মাত্র সুটকেসই সেখানে রয়েছে। বল্‌লুম, কোন্ বাক্স ? এই দুটো যে রয়েছে, এর মধ্যে এটা আমার, আর আপনার পায়ের কাছে যেটা, সেটা আমার এক বন্ধুর।

সহসা যেন বজ্র পতন হলো! তীক্ষ্ণকণ্ঠে ক্রুদ্ধস্বরে ওই অপরিচিত স্ত্রীলোক চীৎকার করে বলে উঠলো, কেন—কেন আপনার বন্ধুর জিনিষ আপনার ঘরে! আপনি কি চোর যে চুরি করে এনেছেন, না আপনি ভিখিরী যে ভিক্ষে করে এনেছেন! আদেশের ভঙ্গীতে সে গর্জ্জন করে বলে উঠ্‌লো, যান, এক্ষুণি এটা যার জিনিষ তাকে ফেরৎ দিয়ে আসুন! সে আদেশ এমনই কঠোর যে বিনা কারণেও আমি তখুনি উঠে না দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারি নি।

কিছুক্ষণ সময় লাগ্‌লো আমার সম্বিৎ ফিরে আস্‌তে, কণ্ঠস্বরে কেমন যেন জড়তা এসে গিয়েছিল। সেটা কাটবার পূর্ব্বেই ভয়ে ভয়ে বলে ফেললুম, ফেরৎ ত দেবো—কিন্তু সে যে দেশে গেছে—সে ত এখানে নেই।

ওই তন্বী তার পূর্ব্বের মতই গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে আদেশ দিলে, পাঠিয়ে দিন—তার দেশের ঠিকানায় আজই পাঠিয়ে দিন! শ্লেষভরে মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, কেমন সেটা ত পারেন ?

ভয়ে ভয়ে জবাব দিলুম, পারি।

কিন্তু আমার এই ভয়ের কারণ কি ? কিছুক্ষণ আগে যার সান্নিধ্যে আমি জীবনের সমস্ত স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়ে শূন্যতার লঘুতায় বিভোর হয়ে গিয়েছিলুম, তারই মুখের আর একটা কথায় এত

ভয় আসে কিসে? কিন্তু আর কিছু ভাববার পূর্ব্বেই সে বাধা দিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, অমিয়বাবু, তা' হ'লে আজ উঠি। কালই কিন্তু মনে করে ঠিক পাঠিয়ে দেবেন।

অফিসের গরীব কেরানী। মাসকাবারী দিনগুলো এতই নিদারুণ যে, সে কথা সর্ব্বদাই মনে থাকে। ইতস্ততঃ করে বল্‌লুম, কাল—কালই—কেন দু'দিন পরে হ'লে হয় না?

তীব্র হয়ে নারী বলে উঠ্‌লো, না—না—না! তারপরেই ভেঙ্গে পড়ে অনুনয়ের সুরে বল্‌লে, আপনার পায়ে পড়ি অমিয়বাবু, দয়া করে কালই—

ব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়ে বল্‌লুম, না না, পাঠাতে আমার কোনই আপত্তি নেই—তবে কি না দেখুন, পাঠাতে একটা খরচা আছে ত? আমার হাতে এখন—নারীর কাছে অর্থাভাব জানাতে পুরুষের মন কেমন যেন অকারণেই সঙ্কুচিত হয়।

ডান হাতের তর্জ্জনীটি ঠোঁটের ওপর ঠেকিয়ে উর্দ্ধে দৃষ্টি দিয়ে সে বল্‌লে, ও, তাও ত বটে—তা' আমার হাতেও ত কিচ্ছুই নেই। তা'—তা', আপনি এক কাজ করুন না কেন—ওই বাক্সটা খুলে ওর ডালার ভেতর যে খাপ আছে, তাইতে একটা লাল কাগজের খাম দেখ্‌তে পাবেন, আপনি সেই খামে একটা সাধারণ ডাক টিকিট এঁটে কালই ডাকে ফেলে দিন না কেন, কম পয়সায় হবে? কেমন এতে বোধ হয় আপনার কোন অসুবিধে হবে না?

তার যুক্তি ও উপদেশ শুনে ভয় আমার কেটে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও দুটো কথা মনে হলো। এত রাত্রে যে আমার ঘরে এসেছে,তার হাতে দু'গাছা সোনার প্লেন বালা ছাড়া আর কিছুই নেই, এটা কি রকম? আর দ্বিতীয়তঃ, বন্ধু আমার কাছে যে বাক্স জিম্মা রেখে গেছে, সেটা খুলে তার একটা খাম আমি তারই ঠিকানায় পাঠাবো, আর বাকী সব এখানে পড়ে

থাকবে এটাই বা কি—আর এতে এর লাভটাই বা কি? তা' ছাড়া, বাক্স আমি খুলবোই বা কি করে? চাবি ত নেই। তার চেয়েও বড় কথা, এ কে? পূর্ব্বেই ও বলেছে, আমি বড় ঘরের মেয়ে ছিলুম। এখন বোধ হয় সহরে কোথাও ঘর ভাড়া করে আছে। হঠাৎ মনে হলো, সর্ব্বনাশ! এরা কোন নতুন ধরণের চোর নয় ত?

মুখ তুলে দেখি—সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আর ভয় বা সম্ভ্রমবোধ আমার নেই, সোজাসুজি কঠোরভাবে প্রশ্ন করলুম, বল্লুম, সব ত শুন্লুম, কিন্তু তুমি যে কে তা' ত বল্লে না? তুমি কে—তোমার স্বার্থ কি? এ সব না বল্লে আমি বন্ধুর বাক্সে কোনমতেই হাত দিতে পারব না।

হঠাৎ 'তুমি' বলে এত কড়া প্রশ্ন করার ইচ্ছা আমার ছিল না—কিন্তু কেন যেন অনিচ্ছাতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার এই প্রশ্নে ওই অজ্ঞাত মেয়েটি এবার সত্যই দ্বিধাবোধ করলে। একটুখানি লজ্জা ও অনেকটা জড়তায় তার সমস্ত মুখখানা নিমেষেই রক্তহীন, পাণ্ডুর হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে আমার ওই বিছানায় সে আবার বসে পড়লো।

কিন্তু আমার মন তখন দীপ্ত সংস্কারে এতই প্রবল যে, ওই ভঙ্গুর নারীর অসহায় অবস্থাতেও সে আদৌ কৃপা করে না। কঠিন বিচারকের ন্যায় নির্ম্মম হয়ে হুকুম করলুম, বল্লুম, উত্তর দাও—নয় ত সোজা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। আমি তোমার কোন কথা শুনবো না।

তিন

একটুখানি সময় সে নিলে। এক মিনিটে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আমার দিকে ভেজা চোখ তুলে বল্‌লে, উত্তর আমি দেবো কিন্তু সেটা তোমাদের, অর্থাৎ, পুরুষদের পক্ষে বড় গৌরবের জিনিষ হবে না, তা' মনে রাখ্‌বেন।

'আপনি'-'তুমি'র মিশ্রণ দেখার অবস্থা সেটা নয়, পুরুষের কোন গৌরবময় ইতিহাস শুন্‌তেও আমি তখন বসি নি। বিচারকের ভঙ্গী নিয়ে আদেশ কর্‌লুম, বলো তুমি—ও সব ভণিতা আমার চাই না।

তবুও যেন মনে হলো, আমার দিকে চাইছে সে করুণভাবে। তার সেই চকিতের দৃষ্টি দিয়ে সে যেন আমায় নিবারণ করতে চায়। যেন বল্‌তে চায়, এ কাহিনী শুন্‌তে চেয়ো না, এ শোন্‌বার নয়, এ শুনো না!

কিন্তু বিচারক তার আসনে বসে আছে অটল। সে হৃদয়হীন। ইঙ্গিতের কোন মূল্যই সে দেয় না। সে কথাগুলো শুন্‌বে স্পষ্ট করে। প্রত্যেকটি শব্দ সে চুল চিরে ওজন করে নেবে।

বাঁ হাতের চেটোর ওপরে ডান হাতের চারটি সুঠাম অঙ্গুলি স্থাপন করে নখের কোণগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে বল্‌লে, বল্‌বো আমার কথা। কিন্তু সে আপনার বন্ধু বেহারীবাবুকে নিয়ে—শুন্‌বেন ত?

অকারণেই উষ্ম হয়ে বলে উঠ্‌লুম, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনবো! তুমি বলো।

এবার সে নিজেকে আরও একটু দৃঢ় করে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে, দেখুন অমিয়বাবু, না জেনে একজনকে অনর্থক হেয় বোধে অপমান করতে নেই—তা'তে পরে হয় ত অনুতাপের সীমা থাকবে না। এটা মনে রাখ্‌বেন—আপনি আমায় যা' ভাব্‌ছেন, আমি কিন্তু সে রকম একেবারেই

নই। বেহারী যদি আপনার বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত হয়, তবে আমি আপনাদের আদর্শ হ'তে পারি, এটা জেনে রাখ্‌বেন।

তার এই দৃঢ়কণ্ঠের ভাষণে আমি অন্তরে অন্তরে কেমন একটু দুর্ব্বল হলুম। মুখে এর কোন উত্তরই দিলুম না।

সে একটু স্থির হলো। তারপর কি ভেবে অল্প হেসে বল্‌লে, মনে পড়ে, মাস-চারেক আগে একদিন দুপুরে আপনার বন্ধু বেহারী এসে আপনাকে কি বলেছিল ?

বল্‌লুম,—কি বলুন ত ?

বল্‌লে, এমন কিছু বলেছিল, যাতে আপনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, বুঝ্‌তে পেরেছি। ওর কথাবার্ত্তায় আমার সেদিন মনে হয়েছিল, ও আত্মহত্যা করবে। কিন্তু সে কথা আপনি জান্‌লেন কি করে ?

পাশের বিছানায় অধীশবাবু ওপাশ থেকে এপাশে ফিরলেন, কিন্তু ভোরের মৃদু হাওয়ায় তাঁর ঘুম ভাঙ্‌লো না। যে অধীশবাবুকে জাগাবার কথা একটু আগে মনে হয়েছিল, এখন যেন কেমন ভয় হলো, পাছে তিনি জেগে ওঠেন।

আমার মত ভয় বোধ হয় তারও হয়েছিল। অধীশবাবু পাছে জেগে ওঠে সেই ভয়ে কণ্ঠস্বর খুব নামিয়ে একরকম ফিস্‌ফিস্‌ করেই সে বল্‌লে, সে কথা আমি তার কাছেই শুনেছি। কিন্তু তারপর কি হয়েছিল তা' কি জানেন ?

—তারপর ? ভেবে নিয়ে বল্‌লুম, কই না ত—তারপর কি হয়েছে, তা' ত শুনি নি।

বল্‌লে, বেশ ত, আমি একটা কথার গোড়া ধরিয়ে দিলুম, আপনি আপনার বন্ধুর কাছেই বাকীটুকু শুনে নেবেন। আর হ্যাঁ, তাকে আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন, মঞ্জুলা বলে কাউকে তিনি চেনেন কি না ?

—মঞ্জুলা? আচ্ছা, তা' জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু আপনি কে তা ত' বল্‌লেন না?

মেয়েটি যেন আর একবার হাসলে। বল্‌লে, আরও একটা ব্যাপার এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আগুনের সঙ্গে বরফ—এপারের সঙ্গে ওপার এবং আরও—আরও আছে—সত্যের সঙ্গে ভুল! বল্‌তে বল্‌তে আবার তার চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌লো। বল্‌লে, সেই সঙ্গে জিজ্ঞেস করবেন, জীবনে সে কত সুখ পায়, কে তাকে ভালবাসে, আর সেই ঐশ্বর্য্য সে কতকাল ভোগ করতে আশা করে?

সত্য কথা স্বীকার করলে আমায় বল্‌তে হয়, আমি ঠিক্ মত কিছুই বুঝিনি। ওই কি মঞ্জুলা, না সে অন্য কেউ? বিহারীর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল অনেক দিনের। এক জেলায় হলেও আমাদের ভিন্ন গ্রাম এবং আলাপটা আমাদের জমেছিল জেলা স্কুল থেকে। সহপাঠি হলেও সে ছিল আমার চেয়ে বয়সে ছোট এবং একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে দু'জনেই আমরা কোল্‌কাতায় আসি কলেজে পড়তে। সে পেতো জলপানি, পড়তো গিয়ে স্কটিশে, আর আমি কোনরকমে ক'টা টাকা জুটিয়ে গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটে ঢুকেছিলুম। সেখান থেকে দু' বছর ধরে শিখেছি খালি কারবারের খাতা ও ব্যবসাদারের চিঠি; আর টাইপের প্রফেসার কান্তবাবুর ক্লাসে বসে ঠক্‌ঠকানি টাইপ, সেইটাই এখনও মনে আছে। তাইতেই এখন ভাত-কাপড় চল্‌ছে। আর বিহারী বড়লোকের ছেলে। টকাটক্ পাশ করে অনারে বি-এ হয়ে এবার সে এম-এ পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার পর সে কয়েক দিন তার হোষ্টেলেই ছিল। তারপর কি তার খেয়াল হলো দেশে যাওয়ার। আমার কাছে এসে বল্‌লে, দেখো অমিয় দা', আমি একবার দেশে যেতে চাই। কিন্তু যাবার পথে আমার এক বন্ধুর বাড়ী যাব—তা' তার বাড়ী ষ্টেশন

থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে। শুনেছি, ষ্টেশনে গাড়ীটাড়ি মেলে না। তাই মনে করছি, শুধু হাতেই যাব। তা' তুমি যদি আমার স্যুটকেস্‌টা রাখো ত বড় ভাল হয়। বল্‌লুম, বেশ কথা, এ আর এমন কি। তারপর আজই সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফেরবার সময় তাকে বিদায় দিয়েও আসা হলো, আর সেই সঙ্গে স্যুটকেস্‌টাও তার আনা গেল। কিন্তু এই সহজ সরল ব্যাপারের পেছনে কি রহস্য যে থাকতে পারে, ব্যাঙ্কের নিরীহ কেরানী আমি, এ সব ত আমার মাথায় কিছু ঢোকে না।

মেয়েটি আমার মুখের দিকে আর একবার চেয়ে দেখলে। তার চোখ দু'টি জলে ছাপাছাপা। তার এই করুণ মূর্ত্তিতে আমি সত্যই বিব্রত হয়ে পড়লুম। বল্‌লুম, আচ্ছা থাক্, আপনাকে আর কিছু বল্‌তে হবে না, তার কাছ থেকেই সবটা শুনে নেবো।

তার চোখ থেকে জমানো জল আমার বিছানায় পড়লো, অনেকগুলো ফোঁটা। তারপর কেমন যেন অবিশ্বাসীর মত মাথা নেড়ে সে বল্‌লে, না অমিয়বাবু, আপনি আমায় অবিশ্বাস করছেন। আমার কাহিনী আমি নিজেই পুরোপুরী বল্‌বো। বেহারীর কাছ থেকে মঞ্জুলার গল্প শুনে আপনার দরকার নেই।

হ্যাঁ কিম্বা না কোন উত্তরই দিলুম না। খোলা জান্‌লা দিয়ে উষার আগমন প্রতীক্ষা করছিলুম। তার চোখের জলে কি যেন এক মোহ ছিল। সেই জল দেখে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এসেছিল। তার গল্প শোনার কথা আর মনেই ছিল না।

নিজেকে নাড়া দিয়ে সজাগ হয়ে সে বস্‌লো। বল্‌লে, বেহারীর কথা মনে হ'লে আমার মেজাজ ঠিক্ থাকে না। তারপর আমার ঘুমন্ত মনকে নাড়া দিয়ে সে হঠাৎ বল্‌লে, আপনার বন্ধু বেহারীকে আমি ভালবাসতুম। আমিই সেই মঞ্জুলা।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সে বল্‌লে, আমি নিজের মুখেই স্বচ্ছন্দে বলে যাব। আমি বড় ঘরের মেয়ে ছিলুম। স্কটিশ কলেজে পড়তুম। নিজে হাতে মোটর চালিয়ে কলেজে আসতুম। কলেজে আমার সঙ্গে কেউ পারতো না—না পরীক্ষায়, না স্পোর্টসে। কিন্তু জীবনে এত উৎসাহ কে আমায় দিয়েছিল জানেন, সে ওই বেহারী।

আমি তাকে ভালবাসতুম—তার কথা, তার হাসি, তার বুদ্ধি। এমন কি, শেষকালে সে যখন এক গুরু বাগিয়ে কপালে ফোঁটা কেটে জপ করতে বসলো, তখন মুখে নানা বিদ্রূপ করলেও আমার তাকে আরও বেশী করে ভাল লাগ্‌ত। তখন মনে হোত' যে, ইংরাজী শিখেও এত বড় হিঁদু কে আছে?

তারপর—দিন যায়। শেষে আমরা দেখ্‌লুম যে, চিরকালের মত এক না হ'লে আমাদের দু'জনেরই জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু নানা বাধা—সে সব কি আর বল্‌বো অমিয়বাবু, সে আর বল্‌বার নয়। আমি ফিপ্‌থ্‌ ইয়ারে, সে সিক্সথ ইয়ারে। এক গভীর রাত্রে দু'জনেই পালালুম।

চাঁদনী রাত। ফাল্গুনের চাঁদ তখন আকাশে। ঠাণ্ডাও বেশ, কিন্তু আমাদের গায়ে শীতের কোন আমেজই নেই। সোজা এলুম গঙ্গায়। গঙ্গার বুক যেন প্রশস্ত পথ—তাকে জল বলে মনেই হয় না। ঘাটে ছিল বেহারীদের ক্লাবের রোয়িং বোট। ছোট হালকা নৌকা। হাত ধরাধরি করে দু'জনে গিয়ে নৌকায় উঠ্‌লুম।

আমরা বরাবর সুখেই মানুষ হয়েছি। এমন সাধ্য বা সাহস ছিল না যে, সমাজের বিপক্ষে কাজ করে বাড়ীর সমস্ত সাহায্য বর্জ্জিত হয়ে নতুন ঘর আমরা গড়ে তুল্‌তে সাহস করবো। তাই গড়া-ঘর ভাঙার জন্যেই নৌকায় গিয়ে উঠেছিলুম।

সে বল্‌লে, মঞ্জুলা, বাড়ী থেকে বিদায় নিতে পারি নি, কিন্তু এমন

লোককে জানিয়ে দিয়ে এসেছি, যে আমার কথা দেশে ঠিকমতই জানিয়ে দেবে। এই বলে সে আপনার নাম করেছিল। বল্‌লে, আজ দুপুরে তাকে আভাষে ইঙ্গিতে বলেছি, তবে ধরা পড়ার ভয়ে সবটা আর বলি নি।

মঞ্জুলা এক মুহূর্ত্ত স্থির হোল'। সেদিন দুপুরের সেই কথাটা আমার মনে পড়লো। তার দু'দিন পরে যখন পুনরায় বিহারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন তার মুখ-চোখের ভাব দেখে বাস্তবিকই কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকেছিল। সবটা ভেবে নিলুম। ইতিমধ্যে মঞ্জুলা যেন সেই নৌকা চড়ার রাত্রিটাই ভাব্‌ছিল।

সে বল্‌লে, স্রোতের মুখে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জলে কোনোরকম আবেগ নেই। আকাশের চাঁদ সেই জলের ওপর স্থির হয়ে পড়েছিল। মাঝগঙ্গায় নৌকা যখন যাচ্ছে, তখন বেহারী আমায় ডেকে বল্লে, মঞ্জুলা, এমনই এক রাত্রে আমার প্রিয় কবি শেলি তার ছোট ডিঙি থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে প্রকৃতিকে তিনি ভালবাসতেন তারই ভেতর মিশে গিয়েছিলেন। আর আজ—

আমি বলেছিলুম, আজ এই জলের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে মিশে যাবো।

সে বলেছিল, একটা গান গাও।

কিন্তু কি জানি কেন আমার গলা এতই কাঁপতে লাগ্‌লো যে, আমি কথাই বলতে পারি নি। সে আমার হাত ধরেছিল। বল্‌লে, তুমি ভয় পেয়েছ ?

আমি বলেছিলুম, না। কিন্তু আর দেরী করতে পারি নি। শেষ সময়ে তাকে বলেছিলুম, ও গো, আর দেরী করতে পারি না। এবং তারপরই সেই চাঁদিনী রাতে নৌকা আর এগোয় নি।

মঞ্জুলা পুনরায় নীরব হলো। মেসের কঠোর ও বাস্তব ঘরখানির আপাদমস্তকে কে যেন এক স্তব্ধ শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছে। তখন আমারও মনে হলো, জীবনের এ একটা পর্য্যায় বটে। মৃত্যুর শাশ্বতীকে যে এভাবে করায়ত্ত করা চলে, তা' ত আমি কোনদিন কল্পনাও করি নি। তখন মনে হোল' যে, বেহারী ও মঞ্জুলা আমার চেয়ে বহু উর্দ্ধে।

মঞ্জুলা বলে চললো, পরে যখন জ্ঞান হলো, তখন আমি একা। বেহারী নেই। আমি কোন্ এক অজানা চরে এসে পড়েছি। সেখান থেকে উঠে অনেক সন্ধানের পর বেহারীকে খুঁজে বার করি। কিন্তু সে আমায় দেখ্‌তেও পেলে না। আমি ডাকি, সে সাড়া দিলে না। কথা কই, সে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। শেষে আবিষ্কার করলুম যে, সে সাঁতরে নদীর তীরে গিয়ে উঠেছে, আর আমি নদীর অপর পারে—

শুন্‌তে শুন্‌তে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো। বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লুম, মাপ করবেন মঞ্জুলা দেবী, তবে কি আপনি—

হ্যাঁ আমি! আমার ইচ্ছা আছে, তৃষ্ণা আছে, অতৃপ্তি আছে—নেই কেবল দেহ।

ত্রস্ত হয়ে পেছন দিকে সর্‌তে সর্‌তে—আর একটু হ'লে চৌকি থেকে পড়েই গিয়েছিলুম আর কি! অতি দুঃখেও মঞ্জুলার মুখে হাসি এল। বল্‌লে, আমার কাছে আপনার ভয় করবার কিছুই নেই—কারণ, আমি যে আপনারই বন্দী।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, সে কেমন? শুন্‌ছি ত অনেকক্ষণ থেকেই—কিন্তু বুঝ্‌তে ত পার্‌লুম না।

বল্‌লে, সেটা হলো পরের কথা। মৃত্যুর পর দিন সকালে আমার দেহ যখন নদীর জল থেকে আবিষ্কৃত হয়, তখন বেহারীর নাগরিক বুদ্ধি এসে পড়েছে। মৃত্যু তার হয় নি। শেষ রাত্রে জল থেকে উঠে সে নিজের

হোষ্টেলে ফিরে গিয়েছিল। আমার দেহ সম্বন্ধে পুলিসের খবর পেয়ে সেই যায় আগে দেখ্‌তে। তারপর হাসপাতালে শব ব্যবচ্ছেদের সময় সকলকে লুকিয়ে সে আমার একগুচ্ছ চুল কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে পালিয়ে আসে। আর কি-ই বা করবে সে—ভীরু, কাপুরুষ, আমার কাছে আসবার মত তার সাহস কই?

শুন্‌তে শুন্‌তে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো, কেমন এক অকপট শ্রদ্ধায় মঞ্জুলার সাম্‌নে ঘাড় যেন নুয়ে এলো। একের জন্য বহুময় জগৎ যে ছাড়তে পারে, সে সাধক। বেহারীকে ত জানি, সে হুজুগে। এর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না, তবুও আমি সাহসে ভর করে বেহারীর হয়ে মঞ্জুলাকে বল্‌লুম, কি জানি বেহারী তা' হলে বোধ হয় এইজন্যই মনমরা হয়ে আছে।

মঞ্জুলা দেবী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন। চীৎকার করে হাত নেড়ে দীপ্তকণ্ঠে বল্‌লেন, বল্‌বেন না, বল্‌বেন না তার কথা! আমার সঙ্গে পরে কত কথা হয়েছে। আমি তাকে কতদিন বলেছি। কিন্তু সে মানুষ নয়—সে পিশাচ! অপরকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়ে সে নিজে চায় জীবনকে ভোগ করতে—সে পাষণ্ড!

কি বুঝে একটু প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলুম। মঞ্জুলা দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, কোন কথা নয়—এর ওপর কোন কথা চলে না! তোমরা পুরুষেরা বুঝ্‌তে পারবে না এর অর্থ! তোমরা—তোমরা আস কেন ভালবাসতে? ভালবাসা তোমাদের কাছে ছেলেখেলা—কিন্তু আমাদের মর্ম্মস্থান ভালবাসায় তৈরী! হতাশ হয়ে মঞ্জুলা আমার বিছানার সেই কোণটিতে বসে পড়ে ঘাড় হেঁট করে হাঁপাতে লাগ্‌লেন। একটু পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, কিন্তু তবু, তবু ত তাকে ভুলতে পারি না! মনে হয়, আহা সে দুর্ব্বল—সে

পারে না! তা' করুক না—পৃথিবী সে ভোগ করুক! ভোগ-শেষে সে যখন আস্‌বে—তখন—তখন ত আমি তাকে পাবো!

কি যেন মনে করে নিয়ে মঞ্জুলা বল্‌লেন, হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম। আমার মাথার চুলগুলো কেটে নিয়ে সে গেল তার গুরুর কাছে। গুরু কি, বা কে তা জানি না। তিনি কত সব মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে, উঃ—বল্‌তে বল্‌তে মঞ্জুলা আর একবার উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন। উন্মাদের মত অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টিতে আশে-পাশে চারিদিকে দেখ্‌তে লাগলেন—যেন সদ্যধৃত হিংস্র পশুর ন্যায় পলায়নের পথ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন—যেন অসহায় সম্রাটের দিক্‌দণ্ডী জ্বালা করে নিয়ে কারাপ্রাচীরের চারিদিকে তিনি অন্বেষণ করতে লাগ্‌লেন। আমার ন্যায় ভয়ার্তের মুখের দিকে তাঁর সেই করাল দৃষ্টি স্থাপন করে ক্রুদ্ধরুষ্ট কণ্ঠে হেঁকে উঠলেন, কেন, কেন সে আমায় বন্দী করলে। মন্ত্র দিয়ে কেন সে চিরকালের মত আমার ওই পরিত্যক্ত কেশগুচ্ছের সঙ্গে অচ্ছেদ্য করে বেঁধে রাখলে! সুর নামিয়ে আপন-মনেই তিনি প্রশ্নোত্তর করতে লাগ্‌লেন, সে কি আমায় ভালবাসে? চিরকাল ধরে কাছে কাছে পাবে বলে কি সে আমায় এমনি করেই বেঁধেছে? তবে আমায় বর্জ্জন করে কেন? আমার দিকে চেয়ে দেখে মঞ্জুলা দেবী বল্‌লেন, জানেন অমিয়বাবু, মানুষের শুধু মন নিয়ে চলে না—তার দেহ চাই! তাই আপনার বন্ধু এবার দেহের সন্ধানে—মঞ্জুলার গলা চিরে শব্দ এলো—বিয়ে করতে তাই তিনি দেশে গেছেন। আমাকে আমার কেশগুচ্ছের সঙ্গে বেঁধে রেখে—অতৃপ্ত করে—বন্ধুর মেসে সেই হতভাগিনীকে স্মৃতি সমেত ঠেলে দিয়ে, ওঃ! হতাশ হয়ে মঞ্জুলা তার হাতের ওপর ভর দিয়ে কিছুক্ষণ নির্জীব হয়ে বসে রইলেন। পরে মুখ তুলে বল্‌লেন, কেন, আমার এই ছায়াদেহ থেকে কি মনে হয়, আমি কুৎসিত ছিলুম? তবে, তবে? আমার এই দেহ ছাড়বার ত কোন ইচ্ছাই ছিল না, এ মতলব ত তারই! সেই ত বল্‌লে,

শেলির মত অতল জলে ঝাঁপ দিতে! বল্‌লে, শেলি ছিল একা, আমরা দু'জন। বল্‌লে, এতে কোন কষ্ট নেই, সমাজের তাড়া নেই, অর্থের চিন্তা নেই, রোগ-শোক নেই, মিলনের কোন বাধা নেই। তার প্ররোচনাতেই ত আমার এই অবস্থা! আর অতৃপ্ত আমাকে সে আজ উপেক্ষা করে—

মঞ্জুলা দেবীর চোখের জল আর থামে না। আমি আর কি বল্‌বো, নিরুত্তরে বসে আছি। ততক্ষণে উষার আলো এসে আমার ঘরটিকে সামান্য উজ্জ্বল করে তুলেছে। অধীশবাবু অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। আমি না নিদ্রিত, না জাগরিত?

দুঃখের মুখখানি আঁচলে মুছে নিয়ে মঞ্জুলা উঠে দাঁড়ালেন। যোড়হাত করে বল্‌লেন, অমিয়বাবু, আমি আর পার্‌ছি না! সে আমায় চায় না—কিন্তু আমি তাকে না দেখে থাক্‌তে পারি না! আপনি আজই ওই বাক্স থেকে চুলের গোছাটি বার করে তার কাছে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন, আর সেই সঙ্গে লিখে দিন—সে বিয়ে করুক, কি যা' তার খুসী করুক—কিন্তু লাল খামে ভরা চুলের গুচ্ছটি তার জামার বুক পকেট থেকে সরিয়ে যেন অন্য কোথাও না রাখে, নিদেন—নিদেন জুতোর শুকতলার মধ্যেও এতটুকু স্থান যেন পাই!

শেষ কথায় মনে হলো, মঞ্জুলা দেবী—উদ্গত অশ্রু চেষ্টা করেও রোধ করতে পার্‌লেন না। আমারও চোখ দুটোও নেহাৎ শুষ্ক ছিল না। ভাল করে চোখ মোছ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই অধীশবাবু তাঁর বিছানার ওপর উঠে বসে বল্‌লেন, আরে, অমিয়বাবু যে, এত সকাল সকাল উঠেছেন—ব্যাপার কি?

অধীশবাবুর শিষ্টাচারমূলক প্রশ্নের কোন উত্তর চট্‌ করে দিতে সেদিন পারি নি।

মহাকালের বুভুক্ষা

পৌষের কন্‌কনে রাত্রে আপ কাল্কা মেল আসানসোল ষ্টেশনের মধ্যে এসে ঢুক্‌লো।

পান-বিড়িওয়ালা অভ্যাস মত হাঁক্ দিলে, 'কেলা-শান্ত্রা'র কোন খরিদ্দারই হোল না, থার্ড ক্লাস কামরায় দু' একটা ভাঙা গলা বুঝি চা-ওয়ালাকে বার দুই ডাক্‌লে, মিঠাই-ওয়ালার ওঠবার কোন আবশ্যকতাই হয় নি। সারা গাড়ী যেন ঘুমন্ত, কেবল জেগে ছিল ট্রেণের এঞ্জিন!

এঞ্জিন ড্রাইভার নিকোলাসের শরীর তত ভালো ছিল না। মনটাও তার বিশেষ খারাপ। ডাক্তার সাহেবকে খোসামোদ করেও ছুটী সে কিছুতেই পায় নি, টাকা পয়সার নেহাতই টানাটানি, চারিদিকেই ধার, শেষ পর্য্যন্ত তার এই চাকরীতে কেমন যেন বিতৃষ্ণাই এসেছে!

বড়ো একটা কালো কোট পরে ষ্টেশনের একজন কর্ম্মচারী এঞ্জিনের সাম্‌নে এসে হাজির হোল, হ্যালো!

নিকোলাসের বিরক্তিময় মুখও উজ্জ্বল হোল, এঞ্জিন থেকে নেমে এসে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলে।

কিছুক্ষণ দু'জনে কি যেন পরামর্শ হোল', তারপর ড্রাইভার নিকোলাস তার সহকারী রহমনকে ডেকে কোথায় পাঠিয়ে দিলে। সে লোকটা ছুটে চলে গেল, তারই পেছনে পেছনে নিকোলাসের বন্ধুও অদৃশ্য হোল'।

ওদের দিকে নিকোলাস একদৃষ্টেই চেয়ে রইলো। তার গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!

দূরে লাইনের লাল সিগ্ন্যালটি হঠাৎ নীল হয়ে গেল, যাত্রীহীন আলোময় বিরাট ষ্টেশনের অপর দিক্ থেকে গার্ডের হাতের আলোটাও নীল হয়ে এলো, ষ্টেশনের ঘণ্টা, গার্ডের বাঁশী রহমন ছুটে এসে এঞ্জিনে উঠ্‌লো।

এঞ্জিনের বাঁশীতে ছোট বড় দুটো আওয়াজ দিয়ে ড্রাইভার নিকোলাস বেঁকান লিভারটায় অল্প একটু ধাক্কা দিলে। রেলের চাকাটা গড়াতে স্থরু হোল'।

অমাবস্যার আকাশ ছিল অন্ধকারে ভরা ; কেবল আকাশের গায়ে গায়ে অসংখ্য তারা নীরব ও জলভরা দৃষ্টি নিয়ে সেদিন বোধ হয় ট্রেণের জন্য মঙ্গল কামনাই করেছিল।

দুই

ষ্টেশনের প্লাটফরমটা ধীরে ধীরে পার হয়ে গেল।

সন্ধানীর [সার্চ্চ লাইট] শাদা আলোয় সারা লাইন যেন আনন্দে ঝল্‌মল্ করছে। দু'পাশের সবুজ গাছ ও বার্ত্তার তারগুলি কত উজ্জ্বলই না দেখিয়েছে, তারই মাঝখান দিয়ে ট্রেণটির অভ্যস্ত পথ। যেন বিজয়ী এক বীরের দাম্ভিক অভিযান!

এঞ্জিনের মধ্যে আছে তিনটি প্রাণী। ড্রাইভার নিকোলাস ও তারই দুই সহকারী। প্রথম সহকারী রহমন্ মুসলমান, সে হোল, এঞ্জিনের 'জ্যাক্'; দ্বিতীয় সহকারী ছট্টু, সে হিন্দু ও এঞ্জিনের ফায়ারম্যান। রহমনের জামার ওপোর হাত দিয়ে নিকোলাস কি যেন ইঙ্গিত করলে। রহমন্ তার গ্রেট-কোটটি খুল্‌লে, তার মধ্যে ছিল একটি বোতল, দেড়া দাম দেওয়ার অঙ্গীকারে কিনে নেওয়া মাঝারি গোছের বিলাতী মদ।

দু' হাতে বোতলটি নিয়ে নিকোলাস আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো, জিভ্ দিয়ে ঠোট্ ভিজিয়ে নিয়ে মুখে বল্‌লে, হাউ লাভ্‌লি! বিলাতীর আশায় ছট্টুও ধীরে ধীরে সাহেবের কাছে এগিয়ে এলো। নিকোলাসের অভাব যতই থাক না কেন, উদার এই পানীয়টি খেতে বা খাওয়াতে তার কার্পণ্য কোনদিনই হয় না।

তখন তিন জনেই প্রাণ ভরে বোতলের সাহায্যে শীতের রাতকে মধুময় করে নিলে। ইতিমধ্যেই ষ্টেশনের আউট-সিগ্‌ন্যাল পোষ্ট পার হয়ে গেল।

এর পরেই স্পীড দেওয়ার নিয়ম। নিকোলাস একবার এ্যাক্‌সেলারে-

টারে হাত দিয়ে আরও কয়েক ঘর বাড়িয়ে দিলে। মেল তার নিজের স্বভাবসিদ্ধ গতিতেই এগিয়ে চল্‌লো।

সাহেব তখন পাইপ নিয়ে লোহার টুলের উপর বস্‌লো, রহমন্ তার বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে নিজের মনকে ছেড়ে দিলে, ছট্টু তার চামচের সাহায্যে এঞ্জিনের চুল্লীতে প্রাণ ভরে কয়লা দিচ্চে লাগ্‌লো।

শীতল পৌষের মুক্ত হাওয়ায় মধ্যরাত্রির কি যেন এক গভীর মায়া!

এঞ্জিনের চুল্লীতে কয়লা ভর্ত্তি করার পরই যেন ছট্টু দেখ্‌লে,—স্পষ্ট দেখ্‌লে, সেই আগুনের মধ্যে, সেই এঞ্জিনের বিপুল শিখার মধ্যে একটী জীবন্ত নারী দেহ; সে নারী—সে নারী তারই বিবাহিতা স্ত্রী—সে সখিয়া!

—সখিয়া!

ছট্টু চীৎকার করে উঠলো।—কিন্তু এর পরেও আশ্চর্য্য এই যে, তার চীৎকারে সাহেব কি রহমন্ কেউই কান দিলে না, তবে সাহেব হঠাৎ তার টুল থেকে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো!

গাড়ীতে যেন কি এক ভূতের আবেশ হয়েছে। তিনজনের প্রত্যেকেই আপন আপন মন নিয়ে ব্যস্ত। এঞ্জিনের চুল্লীতে ছট্টু তার সখিয়াকে দেখ্‌তে পেয়েছে, এদিকে নিকোলাস আপন সিট্ ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বাইরে যেন কি সে দেখ্‌লে—ও কি? স্পষ্ট যেন কার এক ছায়া!

সঙ্গে সঙ্গে নিকোলাস্ চিৎকার করে উঠলো, মড্, মেরি মড্।

এ যেন কি এক তাজ্জব ব্যাপার! ট্যাঁস্‌মহলের খ্যাতনামা গায়িকা সার্কুলার রোড্ নিবাসিনী মেরি মড্ এই চলন্ত মেলের পাশে পাশে কেমন করে চল্‌তে পারে? কিন্তু—তবে কি ও মৃতা? মৃত্যুর পর মানুষ তার দয়িতকে ভুল্‌তে না পেরে তাকেই দেখা দেয়, কিন্তু দু'দিন

পূর্ব্বেও যাকে নাচের মজ্‌লিসে সুস্থ শরীরে নিকোলাস দেখে এসেছে—সেই মড্‌!

এঞ্জিনের ডানদিকে গাড়ীর যে সামান্য আলোটুকু পড়েছে, সেই আলোর ওপর লঘু পদক্ষেপ করে স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতে মেরী মড্‌ তার 'ওল্ড বয়' নিকোলাসের পাশে পাশেই এগিয়ে আস্‌ছে।

এসব দিকে ছট্টুর কোন খেয়াল নেই। সে আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো।

তখন এঞ্জিনের চুল্লী থেকে সখিয়া ছট্টুকে যা' বল্লে তার অর্থ হোল' এই যে, ছট্টুরই সহকর্ম্মী রহমন তার স্ত্রীধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করায় সে বাধ্য হয়ে আগুনের মধ্যে নিজের পাপ দেহকে ভস্ম করছে। এই সঙ্গে সখিয়া এটুকুও আশ্বাস দিলে যে, জনম-দুখিনী সীতারই মত নিষ্পাপ অবস্থায় সে পুনরায় বেরিয়ে আস্‌তে পারে, যদি ছট্টু এই অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ নেয়।

কিন্তু এটা যে কি করে সম্ভব, ছট্টু তা একটিবারও ভাব্‌লে না। মায়ের জিম্মায় নিজের যে বিবাহিতা স্ত্রীকে সে গয়া জেলার দূর গ্রামে সুস্থ অবস্থায় রেখে এসেছে, সেই স্ত্রী—তার সেই পয়মন্ত সখিয়া—যাকে বিয়ে করার পরই সে রেলের চাকরী পেয়েছে—সেই সখিয়া যে কেমন করে রহমনের দ্বারা অপমানিতা হতে পারে এবং সেই দুঃখে কেমন করে চলন্ত রেলের চুল্লির মধ্যে পুড়তে আস্‌তে পারে, তা' সেই মুগ্ধ স্বামীর বুদ্ধিতে কিছুতেই এল না, নিজের দৃষ্টিকে সে ষোল আনাই বিশ্বাস ক'রে হিংস্র শ্বাপদের মত রহমনের দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

রহমনের মন তখন অন্য চিন্তায় বিভোর। ফায়ার-বক্সের খোলা মুখের দিকে চেয়ে সে বসেছিল। খোলা চুল্লীর মধ্যে আগুনের কি বিজয়িনী হুঙ্কার! সেই বিপুল সমারোহের উদ্দাম নর্ত্তনে রহমনের মনে এক মত্ততার

সৃষ্টি হয়েছে। তার মনে হয়, সে নিজে ওই আগুনেরই সমকক্ষ। যদি ঐ নিকোলাস্‌কে—যদি ঐ সাহেবকে কোনরূপে একটিবার তাড়ান যায়, তা' হলে—তার পরে ওরই প্রোমোশান, কিন্তু সাহেবের চাকরী যে এখনও বহুকাল।

প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখা দেখে রহমনের মাথায় এল খুন! যদি,—এক কাজ করলে হয় না, যদি আজই একে—

দয়িতার চিন্তায় নিকোলাস তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছে! মড্‌—মড্‌, প্রণয়িনীর চোখে চোখ রেখে গদ্‌গদকণ্ঠে নিকোলাস একহাতে এঞ্জিনের রড্‌ ধরে অপর হাত তারই দিকে শূন্যে বাড়িয়ে দিলে—

কুন্দের মত সাদা ও ছোট দাঁতগুলি হাসির ঝরণায় চম্‌কে দিয়ে ছায়ারূপী মড্‌ তার পরিচিত পুরাতন কণ্ঠের ডাক দিলে, গিনি।

গিনি? এ যে তারই ডাক্‌ নাম, সাহেব একেবারে গলে গেল, মেরি, মেরি—তুমি, তুমি আমার এই—

আয়ত নীল চোখের আবেশময়ী দৃষ্টি দিয়ে মড বল্লে, গিনি, তোমায় এই গাড়ীতে কি আর জোর নেই, কই আমার সঙ্গে সমান তালে ত তোমার গাড়ীখানা চলে না—

সত্যই ত, গাড়ী কি থেমে গেছে! পাগলের মত চিন্তা-শূন্য হয়ে সাহেব এসে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো এক্‌সেলারেটারের ওপর, লিভারটা সম্পূর্ণ ঠেলে দিয়ে ফিরে গেলো এঞ্জিনের ধারে।

গাড়ীর পাশে পাশে আলোর যে ধারাটুকু সমান তালে ছুটছিল, মেরি হোল' তখন সেই আলো-পথের যাত্রী!

মড্‌, ঐ মড্‌, ঐ মড্‌কে আজ নিকোলাসের চাইই। একহাতে এঞ্জিনের রড ধরে অপর হাত সে শূন্যের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

আগুনের মদে মাতাল হ'য়ে রহমন্‌ তখন সাহেবকে তার চাকরীর পথ

থেকে সরিয়ে দিতে চায়! কে যেন অলক্ষ্যে তার মনে বিশ্বাস দিয়ে গেছে যে, নিকোলাসের মৃত্যুর পরেই সে নিকোলাসের পদটি পাবে। সাহেবের এই গাড়ী থেকে ঝুঁকে-পড়া অবস্থার সুযোগ নিয়ে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে শুধু কেবল খুন করার জন্যই রহমন্ সাহেবের পিঠে দিলে সজোরে এক পদাঘাত। এই অতর্কিত আঘাত সহ্য কর্‌তে না পেরে ছায়ামুগ্ধ নিকোলাস গাড়ী থেকে ছিট্‌কে বাইরের অন্ধকারে বিলুপ্ত হোল'।

রহমনের এই অপকর্ম্ম ছট্টু সিং স্বচক্ষে দেখলে, ভীমকণ্ঠে গর্জ্জে উঠ্‌লো, রহমন্!

মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে রহমন্ বল্লে, চুপ্ রও, একদম চুপ্! তার চোখে মুখে খুনের পৈশাচিক উল্লাস!

ভ্যাকুয়াম্ ব্রেকের ওপোর ছট্টু এলো ছুটে। গাড়ীখানা থামিয়ে সে মনিবকে আগে তুল্‌বে, তারপর নেবে সে রহমনের ওপোর দু' রকমের প্রতিশোধ!

ক্ষিপ্রবেগে ভাকুয়াম ক্যাচ্‌টি দু'হাতে বন্ধ করে রহমন তার সহকারী ছট্টুর জামা ধরে টেনে বল্লে, কেঁও শালা, আবি ভ্যাকুয়াম্ রোখ্ দেও। বিল্‌কুল সারা ট্রেণমে ভ্যাকুয়াম বন্ কর দিয়া, মালুম হায়।*

এর পর দু'জনে হাতাহাতি কুস্তি সুরু হয়ে গেল। ফায়ারবক্সের মুখ আছে খোলা, সেদিকে কারো হুঁস্ নেই, ট্রেন তার স্বাভাবিক গতির চেয়ে

---

* আধুনিক কালের সকল ট্রেণেই ভ্যাকুয়াম বা বায়ুতাড়িত ব্রেক্ থাকে। ট্রেণ পাইপ নামক বায়ুহীন একটি পাইপ এঞ্জিন হইতে শেষ কামরা পর্য্যন্ত থাকে, ঐ পাইপে হাওয়া ঢুকিলেই ট্রেণ থামিয়া যায়। ঐ পাইপে বায়ু প্রবেশের পথ সারা ট্রেণের সমস্ত কামরাতেই থাকে, কিন্তু মধ্যে নূতন ডিজাইনের এক শ্রেণীর এঞ্জিন হইয়াছিল, যাহাতে 'ভ্যাকুয়াম ক্যাচ্' নামক এমন একটি যন্ত্র ছিল যাহার দ্বারা ট্রেণ পাইপে বায়ু প্রবেশের সমস্ত পথই ড্রাইভার ইচ্ছামত বন্ধ করিতে পারিত।

অনেক বেশী জোরে যাচ্ছে, কিন্তু কে তার তাদারক করে, ড্রাইভারের পরেই আরোহীদের জীবন ও মৃত্যুর জন্ম জ্যাকই দায়ী, কিন্তু রহমনের সে কথা আদৌ মনে নেই। প্রতিশোধপরায়ণ ছট্টু ও খুনী রহমন, দুজনে দুজনকে এঞ্জিন থেকে নীচে ফেলে দিতে চায়, অথচ কেউই কাউকে ছাড়ে না। এদিকে এঞ্জিনের পাশে দরজা নেই, খানিকটা খোলা থাকে মাত্র !

এঞ্জিনে এই ভাবে যখন কুস্তি চল্‌ছিল, তখন মেলের শেষ কামরায় গার্ড যেন কেমন একটু ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লো। তার সামনে গতিনির্ণয়ের যে ঘড়ি আছে, তা'তে গাড়ীর স্পীড্ অনেক বেশী বলে মনে হচ্ছে, এত জোরে—

সে তার নিজের সিট থেকে উঠে এলো জান্‌লার কাছে, গাড়ীর আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল, লাইনের ঠিক্ পাশেই দু'জন সোয়েটার পরা, বোধ হয় যেন ট্রেণেরই লোক, জড়াজড়ি করে পড়ে গেছে। গার্ডের সন্দেহ হোল', ওরা কারা,—এঞ্জিনের লোক নয় ত ?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবারমাত্র দেখে সে ছুটে এলো ভ্যাকুয়ামের কাছে, ভ্যাকুয়াম লিভারটিকে দু' হাতে ঠেলে দিয়েও—

কিন্তু কোনো ফল নেই, ভ্যাকুয়াম—ভ্যাকুয়াম ব্রেকটি অচল, এঞ্জিন থেকে ওটাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গার্ডের কপাল দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম এলো গড়িয়ে, নির্জীব ভ্যাকুয়ামে হাত দিয়ে মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নিজের কামরায়।

মেল তখন ঝড়ের বেগে ছুট্‌ছে এবং ছুটন্ত গাড়ীকে গ্রাস করে হাওয়ার কি দারুণ মত্ততা ! এ কি অবাধ গতির দিগ্বিজয়ী উদ্দামতা, না মৃত্যুরাজ মহাকালের খলখল অট্টহাস্য !

তিন

—What devil do they mean by this, ফাষ্ট' ক্লাশ কামরায় রেলের এক শ্বেতাঙ্গ অফিসার নিজের বার্থেই উঠে বস্‌লো।

—ওঃ গাড়ী ত ভারী দুল্‌ছে, ইণ্টার ক্লাশ কামরায় বাঙ্গালী এক ছোক্‌রা বিয়ের পর সেই বোধ হয় প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে, চোখে তার ঘুম নেই, ট্রেণের চেয়েও মন তার অনেক দ্রুত।

—দুলুক, দু'খানি কম্বলের তলা থেকে তারই সহযাত্রী উত্তর দিলে।

পাশে এক ভদ্রলোক সুটকেস্‌ মাথায় দিয়ে শুয়েছিল, উঠে বসে বল্লে, দাদার ভাল বালিশ আছে, দুল্‌লে কোন ক্ষতি হয় না, আমার মতন বাক্স মাথায় দিয়ে যেতে হলে—

—এঃ ভিজে ভিজে কি বল ত, চটচটে—এ রাম, ও মশাই, মশাই, শুন্‌ছেন—ও মশাই—

বৃদ্ধ ভদ্রলোক নির্ব্বিবাদে নিদ্রিত, মশাই আপনার রসগোল্লার হাঁড়ী যে কাৎ হ'য়ে আমার জামার মধ্যে—

রসগোল্লার নামে বুড়োর ঘুম গেল ভেঙে, হাঁড়ী? ও আমার মেয়ের বাড়ী—আমার নাত্নীর ফরমাস—

—আর মশাই নাত্নী, এর আর আছে কি?

—সে কি! ভদ্রলোক মারমুখী!

—হ্যালো—হ্যালো—মাই গড্‌—সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় ছোকরা সাহেবটি ওপোরের বার্থ থেকে গড়িয়ে মোটা মেমের ওপোর পড়ে গেল।

পাঁচটি যাত্রী ছিল গাড়ীতে, দু জন বাঙ্গালী, দু জন শাদা চামড়া, একজন হিন্দুস্থানী।

একজন বাঙালী শুয়ে শুয়েই স্বগত প্রশ্ন কল্লে, তাই তো, কোথায় যাচ্ছি আমরা ?

অপর বাঙালীর বোধ হয় চোঁয়া ঢেকুর উঠছে, মন মেজাজ বড়ই কড়া, নিদারুণ বিরক্ত হয়ে প্রশ্নের উত্তরে বল্লে, চুলোয়—

পশ্চিমা লোকটি শুয়ে শুয়েই প্রতিবাদ কর্‌লে, বল্লে, নেই বাবুজী, এ্যাসা বাৎ মাৎ বোলিয়ে, এবং তারপর অনেকগুলি ছেদহীন একটানা কথায় কি যে বললে তা' শ্রোতারা কেউই শুন্‌লে না।

থার্ড ক্লাশ কামরায় একদল উড়িয়া মিস্ত্রী, তারা ধানবাদে নাম্‌বে, কাজেই আসানসোলের পর থেকেই অনেক চেষ্টায় বহু ঠেলাঠেলির পর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। দরজার পাশেই যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি ধানবাদের অপেক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, এরা নাম্‌লে বাঁচি।

চক্ষের নিমেষে কি একটা বড় ষ্টেশন পার হয়ে গেল! দরজার মধ্য দিয়ে ঠিক্ সেটা বোঝাই গেল না।

—ইয়ে কড়, ইয়ে কড়, বুড়ো মিস্ত্রীই প্রথম ব্যস্ত হয়ে উঠলো, ই ধাঁড়বদ অছি, মু বহুদিন কাম করিলু, মু ত ভুলিবি না।

ধানবাদ ষ্টেশনের মাষ্টার মহাশয় অবাক্! এই ষ্টেশনে আজ বহুকাল ধরেই তিনি কাজ কর্‌ছেন, কিন্তু ওয়ান্ আপ্ ধর্‌লো না, এমন ত হয় না, তা' ছাড়া, আউট সিগন্যাল,—তাও ত পড়ে নি। বিনা সিগ্‌ন্যালে ট্রেন গেল, এ কি রকম। তাঁর হাত পা কাঁপ্‌তে সুরু হয়ে গেল।

ধানবাদের পরেই ছোট ষ্টেশন তেঁতুলমারী। সেখানে মেল গাড়ী দাঁড়ায় না, শীতের রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মাষ্টার মশাই ট্রেণ পাসিংএর অপেক্ষায় বসে বসে ঝিমুচ্ছেন, ঝন্‌ঝন্ ক্‌রে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো।

ফোনটি কানে তুলে এ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার বিস্ময়ে চোখ কপালে তুল্‌লেন,—কি ব্যাপার! এঁ্যা, ওয়ান্ আপ্—Runs amock! পাগল

হয়ে গেছে ! রামধনিয়া, রামধনিয়া ! তেঁতুলমারীর এ-এস্-এম্ সোরগোল করে সিগন্যালম্যান্‌কে ডাক দিলেন।

ইতিমধ্যেই তুমুল শব্দ ! তীক্ষ্ণ এক প্রকাণ্ড আলোয় সারা ষ্টেশনকে চমকে দিয়ে মাটির মধ্যে কাঁপন তুলে প্রলয়ের ঝড়ের ন্যায় ভীমবেগে কাল্কা মেল নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই বিনা-সিগ্‌ন্যালে আপের দিকে অন্তর্হিত হলো।

এ-এস্-এমের বুকখানা কেঁপে উঠলো, কি জানি কি হয় ! কিন্তু মেল্‌কে ত হাত দিয়ে থামান যায় না। তাঁর সমস্ত গায়ের ভেতর কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগ্‌লো, ভগবান—দোহাই ভগবান, চাকরী যেন থাকে—কাচ্ছাবাচ্ছা—ফাইন্ দিয়েও যদি—

লাইনের সমস্ত ষ্টেশনেই টেলিফোন ও টেলিগ্রামের হুড়োহুড়ি, ওয়ান্ আপ্—আপ্ কাল্কা মেল—

পরের ষ্টেশন মাতারি। খবর পেয়েই মাষ্টার মশাই ছুটে এলেন বেরিয়ে। দূর থেকেই কেমন একটা বিকট বীভৎস শব্দ তাঁর কানে এলো !

সন্ধানীর শাদা আলোয় ষ্টেশনের ধূলোটিও জ্বলে উঠলো, এবং তার-পরেই বিনা সিগ্‌ন্যালে মত্ত এক রাক্ষসের মত বিপুল দর্পে আপ্ কাল্কা মেল অমাবস্যার নৈশ অন্ধকারেই অপর দিকে অন্তর্হিত হোল—

এবং ট্রেনের ঠিক্ পেছনেই কি বিকট এক ভয়ানক দানবীয় মূর্ত্তি ! যেন ঝড় ও অন্ধকারের প্রকাণ্ড এক সচল পাহাড় ! সেই পাহাড়ের ঠিক্ ওপরেই বিরাট এক পুরুষ, কুঞ্চিত কেশবহুল নভঃস্পর্শী উচ্চ তার শির, নিকষকৃষ্ণ পেশল তার বিরাট্ শরীর, পরণে আছে লাল এক রক্তময় কাপড়, তার হাত দু'টি বিশাল, বোধ হয় আকাশের তারাও তারা উপ্‌ড়ে আন্‌তে সক্ষম।

মাষ্টারের বুকের স্পন্দন যেন একেবারে থেমে গেল, শরীরের রোমগুলি সমস্তই খাড়া হয়ে উঠলো, পায়ের নীচে মাটী তার দুল্‌তে লাগ্‌লো। পর্ব্বত-যানের ওপরে যে নির্ম্মম দৈত্য তার শীকারের পেছন পেছন ছুটছে, তারই তীক্ষ্ণ অট্টহাস্যে বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর জ্ঞান বুদ্ধি সবই যেন লুপ্ত হোল'। মহাকালের ধ্বংস মূর্ত্তিকে স্পষ্ট দেখার মত শক্তি বুঝি মানুষের নেই।

আসানসোল, গয়া ইত্যাদি বড় বড় ষ্টেশনগুলায় নিদারুণ চাঞ্চল্য। ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে ওয়ান্ আপ্ গোমো প্লাটফরমের মধ্য দিয়ে ঝড়ের মত পার হয়ে বেরিয়ে গেল। প্লাটফরমের টিন্‌সেড্‌গুলো হুড়মুড় করে একযোগে দুলে উঠ্‌লো!

চালকহীন দুর্নিবার ট্রেনের শেষ কামরায় দাঁড়িয়ে খোলা জান্‌লার মধ্য দিয়ে বাইরে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ওয়ান্ আপের হতাশ গার্ড অস্ফুট স্বরে বলে উঠ্‌লো, we are doomed! অচল ব্রেকটি তার হাতের মধ্যে তখনও ধরা আছে।

চার

নীচে, বহু নীচে—

ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় স্তর পার হয়ে বহু নিম্নে যেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ শীতল যতু ও লাক্ষার রাশীগুলি স্থির হয়ে পড়ে আছে, তাদেরও তলদেশে, মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রস্থলে—

আধারহীন উজ্জ্বল এক দীপশিখা স্থির নিষ্কম্প! পৃথ্বি-গোলকের কেন্দ্রীয় এই স্থিতির দীপশিখা হঠাৎ যেন কেমন একটু চঞ্চল হয়ে দুলে উঠ্‌লো। মহাকালের ক্ষণিক নিশ্বাসই কি জাজ্বল্যমান শিখাটিকে এম্‌নি বেপথু ও বিব্রত করে?

কিশোর এক সুকুমার শিশু তার মাতৃবক্ষে স্তন্যপান করে! মাতার দৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠলো দীপশিখার কম্পন। মহাকালের বিষাণ সেই জননীর কর্ণকুহরে আতঙ্কের সৃষ্টি ক'রে মাতৃদেহকে আকুল ও রোমাঞ্চিত করে!

—মহাকাল!

—আমি ক্ষুধার্ত্ত।

—তোমার এই পৈশাচিক ক্ষুধার কি শেষ নেই?

—বুঝি নেই। প্রতি যুগের শেষ অমাবস্যায় আমার যে আকণ্ঠ রক্ত চাই মা! তাই আমার ক্ষুধার শেষ নেই! দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বের ভূকম্পন আমায় রক্ত পান করিয়ে পূর্ণ তৃপ্তি দিয়েছিল, দ্বাদশ বর্ষ পরে আমি আবার ক্ষুধিত, আমি রক্ত চাই! ভীম ও পরুষকণ্ঠে মহাকাল আর একবার চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, আমি রক্ত চাই!

স্তুতি ও মিনতির অসংখ্য দুর্ব্বল, ক্ষীণকণ্ঠ শিশু-ভিক্ষুর দল তখন জননীর চতুঃপার্শ্বে আপন আপন ভিক্ষার পাত্রগুলি প্রসারিত করে সজল-

নেত্রে চেয়ে আছে বরাভয়ার দিকে, মা—মা! বিপন্ন যাত্রীর করুণ ব্যাকুলতায় সৃষ্ট এই শিশুদের মূর্ত্তি। বিবৃতমুখ মহাকালের করাল দশনের মধ্যে প্রাণসর্ব্বস্ব মানুষের যে ক্রন্দন স্বতঃই উৎসারিত হয়, সেই ক্রন্দনের ধ্বনি বুঝি এম্‌নি রূপ নিয়েই অম্বার আশে পাশে অধীর আকুলতায় আপন আপন প্রাণ ভিক্ষা করে।

—মহাকাল, তুমি শান্ত হও।

—আমি বুভুক্ষু, আমার ক্ষুধার যে নিবৃত্তি নেই!

—তুমি অগ্নেয়গিরির অগ্নিরাশির মধ্যে তোমার আহার্য্যের সন্ধান কর, যুদ্ধের ডঙ্কার মধ্যেই তোমার ভোজনের আমন্ত্রণ, তুমি শিকারীর শস্ত্রের মধ্যে তোমার রসনাকে প্রেরণ কর, :বন্যা, অনাবৃষ্টি ও মন্বন্তরই তোমায় নিমন্ত্রণ করে। মহাকাল, তুমি আমার আশ্রিত বিপন্নদের ত্যাগ কর।

—কিন্তু দেবী, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত যে নেই, পুরাতন পৃথিবীতে সে আজ অশক্ত, অগ্নিহীন। পৃথিবীর বুকের ওপোর আশু কোন যুদ্ধও নেই, মানুষ আজ বিশ্বমৈত্রীকরণে অগ্রসর, শিকারীর শিকার আজ কোথায়? সভ্য মানুষ যে পৃথিবীতে অরণ্যচারীর রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। বন্যা ও অনাবৃষ্টি, সেও মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে জয় করেছে। মন্বন্তর, সে ত আর হয় না, পৃথিবীর টান্‌-যোগান যে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি হিসেব করে বেঁধে ফেলেছে দেবী! মা ধরিত্রী, আমি নিরুপায়, আমার ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন সহজ উপায়ই যে নেই মা!

ক্ষণকাল স্থির হয়ে পুনরায় সেই ভীম কণ্ঠের ধ্বনি হোল', আমি মহাকাল, আমি ধ্বংস করি!

মাতৃকণ্ঠের দৃঢ় উক্তি হয়, আমি ধরিত্রী, আমি রক্ষা করি!

পৃথ্বী-গোলকের কেন্দ্র-বিন্দুতে দোলায়মান জীবনের দীপশিখা!

পাঁচ

Jesus—what for was he crucified ?

সত্যই ত! ভগবান যিশু ত নিজের জন্যই মৃত্যুকে বরণ করেন নি! তিনি মরেছেন, পরের জন্য। তাঁর দেশবাসীর সমস্ত পাপকে নিজের স্কন্ধে নিয়ে,—তুমি কি নিজের প্রাণ দিয়েও এই একগাড়ী যাত্রীকে আজ বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারো না ?

ওয়ান্‌ আপের গার্ড তখন সাহসে বুক বাঁধ্‌লে।

বাহিরে উন্মত্ত ঝড় ও অন্ধকারের প্রচণ্ডতায় মহাকালের যে তাণ্ডব চল্‌ছে, সেই তাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, হয় ত ঐখানেই নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে হবে—কিন্তু,—কিন্তু আর দেরী নয়; ট্রেণ যে এখনও কেমন করে চল্‌ছে, সেইটাই আশ্চর্য্য! প্রত্যেকটি বেঁকের মাথায় সে কেমন করে এখনই তার বর্ত্ম্যের ওপোর নিজেকে ধরে রেখেছে, এখনও যে আণিগুলি তপ্ত হয়ে [Hot axle] গুরুত্বের নিষ্পেষণে দুমড়ে ভেঙে পড়ছে না কেন, বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে গার্ড তার কোন সদুত্তরই পায় না—

যদি পারি, বাঁচাবো—আজ আমার ট্রেনকে বাঁচাবো!

তাড়াতাড়ি নিজের বড় কোটটা খুলে ফেলে গার্ড সাহেব এদিক ওদিক চেয়ে ভালো করে দেখে নিলে। ডাইরী বইয়ে দু' লাইন কি সব লিখে প্যাণ্টখানাও খুলে ফেল্‌লে, রইলো শুধু ছোট একটি আণ্ডারওয়ার। পৌষের দারুণ শীত ও ঝড়ো হাওয়া সত্ত্বেও এই সামান্য বস্ত্রেই গার্ডের মুখ ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম এলো। তারই ছোট কামরায় বেঞ্চের তলায় ছিল মোটা একটা লাক্‌লাইন দড়ি। সেই দড়িতে সাহেব এক ভারী বল্টু

বেঁধে এগিয়ে এল জানালার ধারে দড়ির শেষ দিক্‌টা গাড়ীর বেঞ্চে এঁটে বেঁধে নিলে।

প্রচণ্ড ঝড়ের উদ্দাম বেগ যেন গার্ডের বক্ষে মহাকালের গদাঘাত!

ট্রেণের যাত্রী তখন অনেকেই তারস্বরে ডাকৃছে—দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, মা আমাদের রক্ষা কর! কেউ বলে—দোহাই খোদাতাল্লা, মহম্মদ, পয়গম্বর কে আছ রক্ষা কর—জয় জগন্নাথ, হনূমানজী! কাশীর যাত্রীরা সভয়ে চীৎকার করে—কাশী বিশ্বনাথ! মনে মনে কেউ বা জপ করে—জিসাস্, গড্।

গার্ড তখন আবার এগিয়ে আসে।

উন্মত্ত ঝড়ের প্রলয় গর্জ্জন, লৌহবর্ত্ম্যের সঙ্গে লৌহচক্রের দারুণ ঝঞ্ঝনা, মানুষের প্রাণ নিয়ে মহামৃত্যুর পৈশাচিক ক্রীড়া, শরীরের সমস্ত শক্তিকে একত্র করে গার্ড সেই রজ্জুবদ্ধ লৌহ কীলককে গবাক্ষের মধ্য দিয়ে গাড়ীর ছাত পার করে অপর দিকে ছুঁড়ে দিলে। ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয়, তখন বুঝি এম্‌নি করেই মানুষের বুদ্ধি আসে। সরজ্জু কীলকটিও গাড়ীর অপর দিকের গবাক্ষে এসে আঘাত করে।

কৃতকার্য্যতার প্রথম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গার্ড তখন ছুটে এল অপর দিকের গবাক্ষে। লোহার সেই কীলকটিকে দু' হাতে ধরে সেই লোহাসমেত জানালার কাঠের সঙ্গে দড়িটিকে বেশ করে জড়িয়ে বাঁধ্‌লে। তারপর সে গাড়ীর মধ্যে দাঁড়িয়ে একবার বুক ভরে দম নিয়ে আপ্রাণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোল'।

পার্শ্বনাথ বা ইশ্রী ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার প্লাটফরমের ওপোর এক প্রকাণ্ড আগুন জেলে অনেকখানি দূরে গিয়ে চালার মধ্যে ট্রেণেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। ভূতগ্রস্ত ওয়ান্ আপ পার্শ্বনাথ পার হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই কোথায় যেন দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

যে দিকের গবাক্ষ দিয়ে গার্ড সাহেব দড়িটাকে ছুঁড়েছিল, সেই দিকের দরজাটি সে এবার খুললে। ঝড়কে উপেক্ষা করেই গার্ড তার হাতে পায়ে দড়িটাকে ধরে নিয়ে শূন্যের ওপোর ঝুলে পড়লো।

সেই সঙ্গেই সুরু হোল তুমুল যুদ্ধ। নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে অল্পপ্রাণ কৌশলীর কি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম!

অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে দিগন্তের করাল গহ্বরে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে ওই নিয়ন্তৃহীন মত্ত মেল। মুহূর্ত্ত পরেই যে বিরাট আত্মঘাতী শক্তি তার আপন লৌহদেহকে পাষাণের স্নেহহীন বক্ষের উপর অণুপরমাণুতে পরিণত করে নিজের দিগ্বিজয়ী গর্ব্বকে ধূলিসাৎ ও নিশ্চিহ্ন করে নিস্প্রাণ হ'য়ে পড়বে, সেই শক্তিকে করায়ত্ত করার দুর্জ্জয় স্পৃহা ঐ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে কে আজ জাগিয়ে দিলে? কে তার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে এই অপরিমেয় শক্তিকে ফুটিয়ে তুললে? সে কি মহাপ্রাণের বিবেক, না ধরণীর গর্ভ থেকে জীবধাত্রী ধরিত্রীর বিশেষ প্রেরণা!

ঝড়কে জয় করে ক্ষুদ্র একটি দড়ির সাহায্যে বিজয়ী গার্ড তার কামরার ছাতে গিয়ে উঠলো।

ঝঞ্ঝা ও ভূকম্পের প্রলয় কি পৃথিবীকে গ্রাস করবে, সারা বিশ্ব কি আজ প্রাণহীন হিংস্র উন্মাদ!

ট্রেণের মুক্ত ছাদের ওপোর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়েই অর্দ্ধ নগ্নদেহে মৃত্যু-জয়ী বীর তখন ধীরে ধীরে এগিয়েছে।

বগিটার শেষ প্রান্তে সে এমনি করেই এলো। মনে তার অদম্য ইচ্ছা, সে এম্‌নি করেই সারা ট্রেণটা ছাদ দিয়ে পার হয়ে এঞ্জিনে যেয়ে পড়বে, ও এঞ্জিনকে থামাবে। কিন্তু পরের বগির সঙ্গে এই বগির মধ্যে যে-ব্যবধান সেটা সে কেমন করে পার হবে? মধ্যের ফাঁক ত কম নয়! কিন্তু পার তাকে হতেই হবে! শুধু এখানে নয়, এমনি করেই সবগুলি

বগি পার হয়ে যেতে হবে এঞ্জিনে, কিন্তু দু'খানি গাড়ীর মধ্যে ঐ যে স্বল্প অবকাশ ওর মধ্যে ঝড়ের কি বিপুল ঘূর্ণী। এতটুকু স্খলনের ফল শুধু নিজের মৃত্যু নয়, ট্রেণের সমস্ত যাত্রীর নিদারুণ, নিশ্চিত অপঘাত!

অসম্ভব, সাধ্যের অতীত—গার্ডের মনটা হতাশ হয়ে কেঁদে উঠলো!

উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়েই সে একবার চেয়ে দেখলে। সেই যেন তার শেষ দৃষ্টি।

আকাশ ও পৃথিবী সবই এক দানবীয় বীভৎসতায় ছেয়ে গেছে, কিন্তু —কিন্তু সেই নিদারুণ ঘূর্ণীর দুঃসহতার মধ্যে, মসীময় আকাশের সীমাহীন প্রচ্ছদপটে, তারই দৃষ্টির ঠিক্ সম্মুখে, ও কে?

স্নেহময়ী, স্তন্যপানরতা, শিশুপৃথিবীর আদিরূপা জননী ধরিত্রীর বরাভয় মূর্ত্তি। শিশু ও জননীর চাক্ষুষ রূপ আজ গার্ডের এই পরা মুহূর্ত্তে দিগন্তের মৃত্যুপটে কিসের ইঙ্গিত নিয়ে উপস্থিত,—সে কি হতাশের আশা, না সে দিগ্বিজয়ীর বরমাল্য?

ম্যাডোনা!

স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে গার্ড তাঁকে আর একবার দেখলে, আর একবার! ঝড়ের নিদারুণ বেগ তার দৃষ্টিকে অন্ধ করছে, যে হাওয়ায় মানুষের প্রাণ সেই হাওয়াই আজ শ্বাসরোধক, হাত পায়ের ওপোর কেমন যেন শক্তি নেই, শরীর তার ক্রমে ক্রমেই অসাড় হয়ে আস্‌ছে কিন্তু, কিন্তু —ম্যাডোনা।

Madonna—Madonna is revealed!

সে যে কেমন করে তার দেহের লুপ্ত তেজ আবার ফিরে পেলে তা সে নিজেই ঠিক্ জানে না, নবলব্ধ শক্তিকে একত্র করে দু'খানি বগির দুরন্ত ব্যবধানকে সে পার হোল, যেন অবলীলায়। বিপদের সময় একমাত্র ঐকান্তিকতায় মানুষ যে কত বড় কাজ কত সহজে করতে

পারে, তা' ঐ গার্ডের নিজেরও বোধ হয় জানা ছিল না কিন্তু, কিন্তু সেই ম্যাডোনা—

পরের বগিটার ছাতের ওপোর উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়েই সে চল্‌লো। হাঁটু, পা এবং হাত যে ছিঁড়ে যাচ্ছে, তা' সে হয় ত ঠিক বুঝতেই পারছে না, ঝড়ের বেগে তার কান যে জন্মের মত কালা হয়ে গেছে, সে জ্ঞান তার একেবারেই নেই, শুধু এক একবার সে চোখ চেয়ে দেখে,—ম্যাডোনার বরাভয় মূর্ত্তি। বগির ছাতের ওপোর বেপথু হাত দিয়ে একবার সে জলের ট্যাঙ্কটাকে চেপে ধরলে। পৌষের শীতল বায়ুস্রোতে ধাতুময় ট্যাঙ্কটি তুষারকল্প, তবুও সেইটাকেই চেপে ধরে সে যেন কিছু শক্তি নতুন করে পেলে। দেহবোধ সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়ে, শুধু যেন বিবেক ঐ ঝড়ের মধ্যে কর্ত্তব্যকে মৃত্যুপথে এগিয়ে দেয়, আর সাম্‌নে থেকে তাকেই শুধু অভয় দিয়ে টেনে নেয় ম্যাডোনার উজ্জ্বল মহিমা!

পাহাড় ও গাছকে মাটির সঙ্গে একেবারে পিষে দিয়ে গর্জ্জে উঠ্‌লো তীব্র এক নিদারুণ হুঙ্কার; মহাকালের ক্ষুব্ধ ও কুটীল আক্রোশ!

সাত

চৌধুরীবাঁধ ও চিচাকীর ষ্টেশন মাষ্টার অনেক চেষ্টা করেও এঞ্জিনের মধ্যে ড্রাইভার আছে কি না তার কোন হদিস্ পেলে না, তবে আন্দাজে মনে হয়, এঞ্জিনে লোক থাকা একেবারেই অসম্ভব।

সারা এঞ্জিনেই আগুনের লীলা। বোধ হয় যেন এঞ্জিনে ফায়ার-বক্সের মুখ খুলে সেই আগুনের সঙ্গে পেছনের বাঙ্কার-কোল একত্র হয়ে কয়লার গাড়ীতেও আগুন ধরেছে। ড্রাইভার কি অপর কোন মানুষ ঐ এঞ্জিনের মধ্যে থাক্লেও তার পক্ষে এতক্ষণ বেঁচে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

হাজারীবাগ ষ্টেশনের ফোন্ উঠ্‌লো বেজে। আসানসোলের কন্‌ট্রোল তাকে হুকুম দিচ্ছে, হুসিয়ার, কেউ যদি কোন উপায়ে চলন্ত ট্রেণকে থামাতে পারে, তাকে রেলওয়ে থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে নগদ পাঁচ হাজার টাকা—আছে কেউ, এমন লোক কেউ আছে? গয়া ইত্যাদি বড় বড় ষ্টেশনেও এই সংবাদ ছড়িয়ে গেল।

হাজারীবাগ রেলওয়ে পুলিসের এক নিম্ন কর্ম্মচারীকে ষ্টেশন মাষ্টার সংবাদটি দিলে। চলন্ত গাড়ী থেকে ওঠা বা নামা দুইই তার বিশেষ অভ্যস্ত ছিল।

সে বল্লে, নিশ্চয়ই এই ত আমার সুযোগ!

জামার ওপোর বালতী বালতী জল ঢেলে প্যাণ্ট ও জামাটিকে বেশ করে ভিজিয়ে নিয়ে, তোয়ালের সাহায্যে হাতকে মুছে, হাতে বেশ করে বালি মেখে, প্ল্যাটফরমের প্রথম মুখে যুবকটি তৈরী হয়ে দাঁড়ালো।

বহুদূর থেকে বিকট এক শব্দ আসছে। ওয়ান্ আপের এতখানি

উগ্র গর্জ্জন এরা ইতিপূর্ব্বে কোনদিনই শোনে নি। সেই সঙ্গেই সন্ধানীর তীব্র আলো।

আশপাশের চালাগুলি কাঁপিয়ে দিয়ে দূরের পাহাড়কে ধ্বনিত করে রেলওয়ে লাইনের শ্লীপারগুলি নড়িয়ে দিয়ে দুর্নিবার গতিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে আপ্ মেল হাজারীবাগ রোড্ ষ্টেশনের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো।

ষ্টেশন মাষ্টার দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই অবাক্ হয়ে ছেলেটির কৌশল লক্ষ্য করতে লাগলো। প্রথমটা তীরবেগে ছুটে গিয়ে এঞ্জিনের রড্ ধরে ফুট্‌বোর্ডে পা'ও সে দিলে। ষ্টেশন মাষ্টার চীৎকার করে উঠলেন—ব্র্যাভো, ব্র্যাভো! কিন্তু তার সেই চীৎকার কোথায় যেন ডুবে গেল। প্ল্যাটফরমের শেষ দিকে খোয়ার স্তূপের ওপোর কে যেন ছেলেটিকে আছ্‌ড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। তার দু'খানি পা কেমন করে লাইনের ওপোর গিয়ে পড়েছিল। সেখানকার মাটিখানা রক্তের ধারায় ভিজে গেল। আসান্‌সোলের কন্‌ট্রোলে তারযোগে এই খবরটি মুহূর্ত্তেই পৌছে গেল।

কিন্তু হাজারীবাগের একজন এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট অন্য কিছুও লক্ষ্য করেছে। পরের ষ্টেশন চোবে। হাজারীবাগ চোবেকে ডেকে বল্‌ছে, হ্যালো চোবে, বহুৎ হুঁসিয়ার, ওয়ান্ আপ্ এইমাত্র চলে গেল; আর দেখো, ভালো করে লক্ষ্য কর, ট্রেণের ছাতে, যেখানে সাম্‌নের নেম-প্লট আছে, সেখানে যেন মানুষের মত কি একটা মনে হোল—যেন কোন মানুষ উপুড় হয়ে ছাতের ওপোর শুয়ে আছে—

একটু পরেই চোবে এর জবাব দিলে, ওয়ান্ আপ্ এই মাত্র পার হোল। কে বা কাহারা এঞ্জিনে আগুন লাগিয়েছে। ছাতের ওপোর একজন মানুষই আছে। এঞ্জিন থেকে একখানা বগির পেছনে ছাতের

ওপোর একজন জীয়ন্ত মানুষ, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, পেছন থেকে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

আসানসোল কন্‌ট্রোল-ঘরেও এই খবর এসে পৌছাল। মানুষটির কি উদ্দেশ্য সাংবাদিক তার কোন হদিসই দিতে পারলে না।

বড় সাহেব স্থির করলেন, ডাকাত, ট্রেণ-ডেকয়টি। নিশ্চয়ই কোন ডাকাত ট্রেণের ড্রাইভারকে হত্যা করে আরও কোন অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে—

তাঁর সহকারী অনুমান করে বল্‌লে, ডাকাত নয়,—তা' হলে—

খোলা জান্‌লা দিয়ে বড় সাহেব বাইরের দিকে দেখলেন, অন্ধকার রাত্রিতে গাঢ় তমিস্রায় মহাকালের গভীর মায়া!

বড় সাহেব চীৎকার করে বল্‌লেন, ডাকাত, ডাকাত, তাকে গুলি করে মারো, গুলি কর, এখ্‌খুনি।

সারা লাইনেই খবর গেল ট্রেণের ছাতের ওপোর যে লোকটি যাচ্ছে, তাকে এখনই গুলি কর।

চোবের পরেই পার্শ্ববাদ, ছোট ষ্টেশন। সেখানে বন্দুক নেই। তারপরে পরপর শর্ম্মাটাঁড় ও হিরোধি। হিরোধি ষ্টেশনে একজন আর্মড্‌ পুলিশ থাকে। তার ওপোর হুকুম হোল', বন্দুক নিয়ে খাড়া হও, কিন্তু তার লক্ষ্যবেধের ওপোর এমন কিছু ভরসা নেই। বড় ষ্টেশন কোদার্ম্মা। কোদার্ম্মার ষ্টেশন মাষ্টার শিকারী ও সেখানকার রেলওয়ে পুলিসেও এক পদকপ্রাপ্ত মার্কসম্যান্‌ আছে। দু' জনে দুই বন্দুক নিয়ে পাঞ্জাব মেলের ছাদবিহারী, নগ্নদেহ, ডাকাতস্মন্য গার্ডের প্রাণবধের জন্য তৎপর হয়ে রাইফেলে গুলি ভরে প্রতীক্ষায় খাড়া হোল।

মহাকালের খলখল অট্টহাস্যে ম্লান ধরিত্রী হোল' পরাভূত, বিপর্য্যস্ত!

আট

নিশ্চিত মৃত্যুর কবলগামী ক্ষুব্ধ ঐ ট্রেণের ইণ্টার ক্লাস কামরায় একটি যুবক তার সহগামীকে লক্ষ্য করে বল্‌লে, কি হে, আর কতক্ষণ ?

—পাঁচ সাত মিনিট।

—তাও নয়, যা' স্পীডে যাচ্ছে, অতক্ষণও চল্‌বে না।

পাশের এক বৃদ্ধ ভিজে গলায় বল্লে, কি বল্‌ছেন মশায়, তার মানে ?

ম্লান হাসির রেখা এলো যুবকের মুখে। বল্লে, মানে আর কিছুই নয়, সামনেই লাইনটা গোল হয়ে ঘুরে গেছে, সেখানে গাড়ীটা নির্ঘাৎ ডিরেল্‌ড্‌ হবে।

বুড়ো তার হাত দুটো চেপে ধরে বল্লে, না বাবা না, ও কথা বোলো না, ভালোয় ভালোয়—

থার্ড ক্লাস গাড়ীতে একজন টি-টি-সি যাত্রীদের নানারূপ প্রশ্নে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে এতক্ষণে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মাটী ও পাশের লাইন ঠিক দেখাই যাচ্ছে না, নইলে সে বোধ হয় যেন লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হয়ে আছে। যাত্রীরা তেমন কেউ জানে না, কিন্তু সে ত জানে—লাইনটা এইখানে কতটা গোল হয়ে ঘুরে গেছে।

পোষ্ট অফিসের কাম্‌রায় আকুল হয়ে কেঁদে উঠ্‌লেন ক্ষেত্রবাবু। তিনি এই সবেমাত্র তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন। ছ' মাস পরেই রিটায়ার করার সময়।

গাড়ীতে যে ক'জন সহকারী ছিলেন, তারা কেউই সান্ত্বনা দেবার অবস্থায় ছিলেন না। সামনেই যে লাইনটা গোল হয়ে বেঁকে গেছে, সেটা এঁরা সকলেই ভালোমতে জানেন।

হঠাৎ যেন গাড়ীটার জোর একটু কম হয়ে এলো।

Now or never, ফার্স্ট ক্লাস কামরার অফিসারটি রেলের পাদানিতে পা দিয়েই দেখলেন—না, জোর যেন—

আশে পাশে গাড়ীতে তুমুল এক চীৎকার উঠ্লো।

ট্রেণের বেগ যেন ক্রমেই কমে আসছে—হুর্‌রে, ইয়া আল্লা, জয় জগন্নাথ, কাশী বিশ্বনাথজী কি জয়!

অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে উন্মত্ত মেল ধীরে ধীরে—

শেষে থেমে গেল।

ট্রেণের মধ্যেই সকলেই আনন্দে চীৎকার করে উঠ্লো।

নেমে আস্তে কারুরই সাহস হয় না। তারপর নামলো ছোক্‌রা সব ছাত্রের দল। ট্রেণের প্রত্যেক চাকা থেকে সাদা রঙের বাষ্পীয় ধোঁয়া উঠ্ছে, সমস্ত এঞ্জিনটা আগুনে লাল হয়ে গেছে। এঞ্জিনের সঙ্গে যে কয়লার গাড়ী থাকে, সেই গাড়ীতেও আগুন লেগেছে।

কিন্তু ট্রেণকে রুখ্লে কে?

একটি অর্দ্ধদগ্ধ শ্বেতাঙ্গের মৃতদেহ এ্যাক্সিলারেটারের রড ধরে আগুনের উপর এমনি ঝুলছে! ম্যাডানার মূর্ত্তি যে মানুষের-চোখ দিয়ে দেখ্তে পায়, সে এমনি করেই বিপন্নদের মুক্ত করে নিজে মুক্তিলাভ করে!

অন্ধকারে, দূরান্তে, যেখানে পাহাড় ও বনগুলি নিবিড় হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক্ সেইখানেই মহাকাল লজ্জায় মাথাটি নীচু করে কুণ্ঠা ও গ্লানিতে রাত্রির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিলে!

পৃথিবীর কেন্দ্রীয় দীপশিখা পূর্ব্বের ন্যায় জ্বল্‌তে লাগ্‌লো, অচঞ্চল, নিস্পন্দ !

ষ্টেশনগুলার সংবাদ কিন্তু তখনও বড়ই চাঞ্চল্যময়। ওয়ান আপ? ওয়ান আপ? ওয়ান্ আপ কোথায়? সে নিরুদ্দেশ !

দুঘণ্টা পরে খবর এলো, ওয়ান্ আপের এঞ্জিন ও সামনের ক'খানা গাড়ী পুড়ে গেছে, কিন্তু যাত্রীরা সকলেই নিরাপদ। ড্রাইভার ও গার্ডের কোনই সন্ধান নেই।

ডায়রীর একদিন

শনিবার ২৮শে মার্চ্চ ১৯৩৬।

আজ যেমন করে বড় রাস্তা দিয়ে কীর্ত্তন করে একদল অচেনা লোক একটা মৃতদেহ নিয়ে উৎসব করে শ্মশানের দিকে চলে গেল, ঠিক ঐরকম করেই ওরা আমার বাবাকে নিয়ে গেছে দশ বছর আগে, কীর্ত্তন করে, হরিবোল দিয়ে, খই কড়ি ও পয়সা ছড়িয়ে, বেলা তখন বোধ হয় তিন্‌টে হবে, আমার ঠিক মনে নেই, তবে সামান্য কিছু আভাষ-মাত্র আছে।

এবং তার পূর্ব্বে আমার ঠাকুর্দ্দা যখন মারা গিয়েছিলেন, তখন ত আর আমি ছিলুম না—তখন আমি জন্মাই নি। সেদিন আমার পিতাই ছিলেন আমার স্থানে, সঙ্গে অন্যান্য লোক অবশ্যই ছিল; কেউ কেঁদেছে, কেউ গতাসুর গুণকীর্ত্তন করেছে, আবার কেউ বা এই মৃত্যু-সংবাদে পরম স্বস্তি লাভ করেছে। সে যুগের লোক আজ কেউই নেই,—সে আজ কম করে সত্তর বছর আগেকার কথা।

এবং তারও পূর্ব্বে যখন প্রপিতামহ মারা গিয়েছিলেন,—শুনেছি তিনি নাকি ডাকাতির হাঙ্গামে লাঠালাঠিতে জখম হয়ে মাসখানেক ভুগে সেপ্‌টিক হয়ে মারা যান। তাঁকে দেখবার জন্যে নিশ্চয়ই সেকালের নাপিত এসেছে, বদ্যি এসেছে, একমাস ধরে চিকিৎসাও চলেছে, কিন্তু শেষকালে ধীরে ধীরে ঘনিয়েছে মৃত্যুর কৃষ্ণচ্ছায়া!

এবং তারও আগে—বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ এম্‌নি করে কত কালের কত সব অতীত কাহিনী তাঁরা রচনা করে গেছেন, সে আমার

কিছুই জানা নেই, সে সব ঘটেছে আমার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে,—যাঁরা আমার একান্তরূপে নমস্য, আর আমি যাঁদের অতি আদরের, অথচ নিতান্ত অপরিচিত—

কিন্তু আমার সেই পূর্ব্বতনীদের কোন ইতিহাসই ত নেই! তাঁরা তাদের সুখ দুঃখের কারবার শেষ করে, নরজন্মের ভোগবাসনা মিটিয়ে দিয়ে, স্মৃতিহীন বিদায় নিয়ে পৃথিবী থেকে সরেছেন—

তাঁরা নবাবী আমোলের ফৌজদারের অত্যাচার সহ্য করেছেন—তাঁরা মুসলমান সম্রাটকে মেনে নিয়েছেন। তাঁরা চৈতন্যের সঙ্গে অহিংসার কীর্ত্তন করে বিষহরির পূজায় অসংখ্য পশুবলির আয়োজন করেছেন ভয়ে ও ভক্তিতে; মুসলমানের ছায়াস্পর্শে স্নান করে তাঁরা ইস্‌লাম ধর্ম্মও গ্রহণ করেছেন অকপটে; এই হোল আমার শত শত পূর্ব্বপুরুষদের সহস্রাব্দীর ইতিহাস।

এবং এরও আগে—

হাজার বছর পূর্ব্বে তাঁরা স্বাধীন ছিলেন। অনাবিল আনন্দের মধ্যে তাঁরা তাঁদের সরলতাময় জীবন যাপন করে সেকালের গঙ্গায় বালুসৈকতে বৃদ্ধাবস্থায় দেহরক্ষা করেছেন। তখন ছিল সতীদাহের প্রথা; সাধ্বী পত্নী সহমরণে মরেছে। আগুনের শিখা উঠেছে হাজার বছর আগেকারের দিগন্তকে রক্তিম করে। সেকালের সন্তান বাঁশী বাজিয়ে, চীৎকার করে তারকব্রহ্ম নাম শুনিয়ে হিমাচলবাহী গঙ্গায় স্নান করে পূতদেহে স্বহস্ত-নির্ম্মিত বাস এবং ধটী নিয়ে আপন শূন্যকুটীরে ফিরে এসেছে, হবিষ্যান্ন করেছে, সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জ্জন দ্বারদেশে আপন মনে বসেছিল সামনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-থাকা কালো কালো গাছের দিকে চেয়ে। তার চোখ ভিজে উঠেছে সকলের অজ্ঞাতে, সেদিনকার আবহাওয়াকে ভিজিয়ে ভারী করে তুলেছে তার গভীর নিঃশ্বাস!

হয়ত আমরাই সেদিন এই সব কাজ করেছি—

যুগ যুগান্তর ধরে আমাদের অতৃপ্ত আত্মা এই অসার পৃথিবীতে ভোগ-বাসনায় মুগ্ধ হয়ে মৃত্যুহীন পতঙ্গের মতো অনন্ত বহ্নিসাগরে ঝাঁপ দিয়েছে অসংখ্যবার, আলোর মদে মাতাল হয়ে সে এগিয়ে গেছে, আগুনের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে সে পিছিয়ে এসেছে, কিন্তু এই যাওয়া এবং পালিয়ে আসার বিরাম তার হয় নি ; আজও পর্য্যন্ত কেউ ত আমায় বুঝিয়ে দিতে পারে না যে, আমার এই অর্থহীন যাওয়া আসার কোন উদ্দেশ্যই নেই, অথচ এই গতির মায়া থেকে মুক্তিও যে পাই না !

আকাশের দিকে চেয়ে দেখে আজ তাই বড় আনন্দ পাই, মনে হয় ও আমার কত পরিচিত ! বাতাস আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমারই গায়ে হাত বুলোয়, বলে, কি গো বন্ধু, আমাদের কি চিন্‌তে পারো ; জড় প্রকৃতি বল্‌ছে, প্রিয়তম, আমি যে তোমারই। আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বছর ধরে এইখানে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি আসো এবং যাও, প্রতিবারেই নতুন করে ভালোবাসো এবং বাসাও, এবং হঠাৎ এক সময় ভুলতেও তোমার দ্বিধা হয় না, কিন্তু আমি সেই অনন্তকাল থেকেই দাঁড়িয়ে আছি, তোমার সব বিভিন্ন রূপ আমি যুগ যুগ ধরে দর্শন কচ্ছি—

আমি দেখেছি,—তোমার পূর্ব্বপুরুষ সিন্ধুনদের কূলে পাহাড়ের উপত্যকায় বিশাল বনস্পতির ছায়ায় বসে সামগান করেছিল অতীতের এক আলোময় প্রভাতে। প্রভাতী-বিহঙ্গের দল সেদিন ন্যগ্রোধের শাখায় শাখায় চিত্রার্পিতবৎ বসেছিল, তৃণভোজন ছেড়ে দিয়ে কুরঙ্গ কুরঙ্গিগণ তাদের বড় বড় চোখ তুলে আবক্ষশ্মশ্রু স্তিমিতনয়ন ঋষির দিকে চেয়েছিল মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর রাজাধিরাজ তাঁর মুকুট ও রাজদণ্ড দূরে নিক্ষেপ করে বসেছিল সেই তৃণাসনে, তোমার সেই পূর্ব্বপুরুষ আদিম

গোত্র-পিতার সম্মুখে ; তুমি জানো, তিনিই তোমার বংশের স্রষ্টা,—আজও এই ধরায় তুমি তাঁরই পরিচয়ে পরিচিত, কিন্তু আমি জানি, সেদিনের সেই গোত্ররচয়িতা আর কেউ নয়, সে তুমি—পিতৃপুরুষের রূপ ধরে আজকের এই তুমিই ছিলে সেই অতীত যুগে বর্ত্তমান।

আমি জানি,—তারও অনেক আগে যখন জলপ্রপাতের বেগ নিয়ে অর্দ্ধ সভ্য অবস্থায় তোমাদের বুভুক্ষু আর্য্যগণ 'দরদ' দেশের মধ্য দিয়ে ছুটে এসে পড়েছিল এই ভারতের উর্ব্বরতায়, তখন তারা 'সোয়াট্' এবং 'কুভা' নদীর জলকে ঘুলিয়ে তুলে হারাপ্পার অধিত্যকাকে আগুন ও রক্তে লাল করে, মহেঞ্জোদড়োর শান্ত অধিবাসিদের মেরে কেটে পুড়িয়ে এক দানবীয় শক্তিতে সুন্দর সভ্য দেশকে মৃতের স্তূপে পরিণত করে—তখন সেই জেতার দলেও ছিলে তুমি। কয়ানশ্চিত্তার মন্ত্র পড়া শান্তিজল নিয়ে উদার হস্তে ভারতের দিগ্দেশে ছিটিয়ে দিয়ে ভারতভূমে পরে যাঁরা অনাবিল শান্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, উপনিষদের যে সমস্ত দেবতুল্য ঋষিগণ সারা বিশ্বকে মধুময় করে দেখেছিলেন, অপরকেও সেই চোখ দিয়ে দেখ্‌তে শিখিয়েছিলেন, তাঁরাই ত প্রথমে বিভীষিকার মূর্ত্তি ধরে হত্যা ও মৃত্যুকে সেদিন জনপদের ওপোর ছড়িয়েছিলেন—প্রাক্-বৈদিকযুগের সেই নৃশংসতার মধ্যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষদের জিঘাংসার মধ্যে আমি তোমাকেই যে দেখি এই নিষ্ঠুরতার পরম প্রতীকরূপে!

এবং এরও অনেক আগে আমার মনে পড়ে আমি তোমায় দেখেছি—

ইরাণের শৈলশ্রেণীর মধ্যে তোমার পূর্ব্বপুরুষ সোমরস পান করেছেন, তুমি সেই সোমরসপায়ী তদানীন্তনের যুবা ছিলে। আরবের মরুভূমিতে উষ্ট্র বধ করে তুমি তার কণ্ঠ থেকে পানীয়, বক্ষ থেকে রক্ত এবং সর্ব্বশরীর থেকে মাংস গ্রহণ করে সেই দগ্ধ মাংসে তোমার জীবনযাপন করেছো। আর্ম্মেনিয়ায় শীতের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গুহার অধিকার নিয়ে যাযাবর

আর্য্যগণের সহিত স্থিতিমান সিথিয় জাতির যতবার যুদ্ধ হয়েছে, তার প্রত্যেকবারেই তুমি বার বার করে মৃত্যুবরণ করেছো। মিশরীয়ের দল এসে তোমাকে বলেছে 'গেল্' ত 'মোলেখ্' দেবতার পূজা করতে, মণিখীয়েরা বলেছে তাদের 'মণি' দেবতার নিকট ষাঁড় বলি দিতে, ইস্রীয়েরা এসে তাদের লর্ডের গুণকীর্ত্তন করেছে, জরথুষ্ট্র এসে শিক্ষা দিয়েছে তাঁর 'অহুর'কে উপাসনা করতে—

এবং তারও পূর্ব্বে আমি দেখেছি—

তুমি আর্টিকদেশের বরফের মধ্যে শ্বেতভল্লুকের চর্ম্মে আবৃত হয়ে আম-মাংস ভক্ষণ করেছিলে, তখন মানুষ হয়েও মানুষের পর্য্যুসিত কীটাকুল মাংস এবং জমাট্ রক্তকে আহার্য্য বলে গ্রহণ কর্ত্তে আনন্দবোধ করেছ—এবং তারও পূর্ব্বে—

হে অবিনাশী, অনন্ত-গতিশীল, আত্মার একমাত্র অধীশ্বর, আমি দেখেছি তোমার প্রথম মনুষ্যরূপ! তোমার সেই পূর্ব্বতন মূর্ত্তি, নিয়েন্ডার্থাল্-মানুষ কাঠ ও পাথরের সাহায্যে তৎপ্রাচীনতর মূর্ত্তি গোরিলার সঙ্গে আপ্রাণ যুদ্ধ করেই নিজেকে বাঁচিয়েছে, এবং তারও পূর্ব্বে—

গভীর অরণ্যের মধ্যে তোমার সেই লোমাবৃত বনচারী মূর্ত্তি আমি দেখেছি,—আধুনিকের-তুমি যার নামকরণ করেছো পিথিক্যানথ্রোপাস, চিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং এবং তারও পূর্ব্বে—

যখন তোমার শিশুকে তুমি স্তন্যপান করাতে সক্ষম হয়েছ, ও তারও পূর্ব্বে—

উভচর, জলচর, বিশালকায় জলজ প্রাণী, ব্যাঙ, বাঙাচি, উদ্ভিদ, তৃণ, জীবনকোষের অণু এবং পরমাণু, জড়পিণ্ড—

আমি জানি, এ সবই তোমার পূর্ব্বপুরুষ, এরা তোমারই মূর্ত্তি; এ তোমার ভিন্ন ভিন্ন যুগের বিভিন্ন পরিচ্ছদ, এ তোমার পরিবেশ ও কর্ম্মের

উপযুক্ত সজ্জা। এদের পরিণতি আজ তোমারই মধ্যে পর্য্যবসিত, আবার আগামী কাল—

সেই অনাগত দিনে তুমি তোমার আজকের এই মূর্ত্তিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে চলে যাবে নূতনের সন্ধানে, নব নব মূর্ত্তির মধ্যে তোমার সেই নবতম বিকাশ হবে মহীয়ান; অপরূপ স্রোত এসে তোমার এই আজকের প্রাচীনত্বকে হেলায় তুচ্ছ করেই ছুটবে—

ঠিক্ তেম্‌নি করে, যেমন করে অজ্ঞাত দুই তারকা এসে আমাদের সূর্য্য নীহারিকায় পরিণত হয়েছিল কোন্ এক জ্ঞানপূর্ব্ব কালে। তারকার সঙ্গে তারকার হয়েছিল এক প্রলয়ঙ্কর সংঘাত। সেই সংঘর্ষিত তারকাদ্বয় আমাদের সূর্য্যের পূর্ব্বপুরুষ—

ঘূর্ণমান্ সূর্য্য-নীহারিকা থেকে আমাদের পৃথিবী জ্বলন্ত অবস্থায় দূরে ছিট্‌কে এসে পড়েছে এবং কত কি দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণে মহাব্যোমের মাঝখানে শঙ্খবর্ত্তুলের গতিপথ আপনিই রচনা করে আত্মনাশের সূচনা সে নিজেই করেছে,—

এবং এম্‌নি করেই প্রলয়ের দ্বার দিয়ে সে যেতে চায় নূতন এক সৃষ্টির পুরে, পেতে চায় নূতন এক অভিনব অবয়ব; কালান্তের পরে সে পেতে চায় নবীন উত্তাপ, পুরাতনকে ভেঙ্গে ফেলে নূতনকে গড়াই তার ইপ্সিত আনন্দ, প্রাচীন ভিত্তিকে ঢাকা দিয়ে তারই ওপোর উঠবে তার নবীন প্রাসাদ।

—যেমন মৌমাছিরা পুরাণো চাক ছেড়ে নতুন করে চাক বাঁধে; যেমন বাবুই তার পুরাণো বাসার মায়া কাটিয়ে নতুন করে তৈরী করে ভাবী সন্তানের ঘর; যেমন পদ্মা তার পুরাতন পথ ছেড়ে গ্রাম নগর ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে পথ কাটে; যেমন গ্রীষ্মের পর পাঁচটি ঋতু পার হয়ে নতুন করে পুরাতন গ্রীষ্মই ফিরে আসে!

—এ বিশ্বের গোপনতম আদিম রহস্যই যে তাই। পুরাতনই পুনর্ণবরূপে বারবার অভিনবত্বের সৃষ্টি করে। একই পুরাতন সূর্য্য প্রত্যহ নূতন নূতন আলোকের সন্ধান দেয়, মানুষ মুগ্ধ হয়।

নিখিলের ইঙ্গিতে আজ আমার দৃষ্টির যবনিকা মুক্ত হয়েছে। এই স্বয়ম্ভূ-আমার সমগ্র ইতিহাস আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। আমি দেখি—

নিষ্ক্রিয় নারায়ণ অনন্তশয্যায় নিদ্রিত ছিলেন কাল ও রূপের অতীত হয়ে,—অনাদ্যন্ত পরমার সেই সঙ্গাভিজ্ঞানহীন মনই হোল' আমার পূর্ব্বপুরুষ, সেই হোল' আমার প্রথম মূর্ত্তি।

সেই শেষ-শয্যাশায়ীর মধ্যে ইচ্ছারূপেই হোল' আমার প্রথম জন্ম,—তারপর আমি ভ্রাম্যমানের মতো ঘুরছি, বর্ষে বর্ষে, যুগে যুগে, জন্মে জন্মে, অন্ত এবং অনন্তের মধ্যে এবং বাহিরেও।

পৃথিবীর শেষহীন উৎসবের সর্ব্বত্রই আমি। অনন্তকে কেন্দ্র করে বিশ্বের সীমাহীন বৃত্তের মধ্যে যে ওঙ্কারধ্বনি নিরন্তর প্রতিরণিত হচ্চে, সেই ওঙ্কারের মূল চেতনাবস্তু যে আমি! আমি সেই নিদ্রাশীল নিষ্ক্রিয়ের সক্রিয় রূপ। ক্রিয়ার বাসনায় ক্রিয়াহীনের অন্তরে বীজরূপী আমার সেই প্রথম আবির্ভাব। ভোগের পূর্ণতার মধ্য দিয়ে আমি আবার ফিরবো সেই ভোগশূন্যতার পরম নির্লিপ্তিতে। এ যেন প্রবাসীর গৃহাগমন—অজ্ঞাত-ভোগীর ভোগান্তে ভোগাতীত আবাসে পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন!

এই বিশ্বের অপরিসীম ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের মূলে এক আমিই আছি বর্ত্তমান। আমি এর ভোক্তা, আমি এর ভোগ্য। আমি অত্যাচার করি, আবার আমিই অত্যাচারিত হই। পিতৃরূপী হয়ে আমি পুত্রের সৃষ্টি করি, আবার পুত্র হয়ে গত পিতার আসন গ্রহণ করি—

পরমেশ্বরের রূপ নিয়ে আমি পূজা গ্রহণ করি আমারই কাছ থেকে। গাছের শাখায় ফুল হয়ে আমি ফুটি, মালি হয়ে সেই ফুলকে আমিই চয়ন করি, পূজারী হয়ে সেই ফুলকে দেবতার চরণে অর্পণ করি আমি, আর দেবতা হয়ে নিজের পূজায় নিজেই তৃপ্ত হই।

ভোগের বিভিন্ন গতিতেই জীবের জীবন! সেই গতির প্রতি পদক্ষেপই যে আমার! কাল্‌কের-আমি ও আজকের-আমি এতই বদ্‌লে যাই যে, পাশের-আমি আমার এই নূতন-আমিকে আর চিন্‌তেও পারি না!

আজ তাই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি, বিপরীত আমার মধ্যে কেমন করে এত সহজে একত্রে বাস করে, দান এবং গ্রহণ, দয়া এবং নিষ্ঠুরতা সবেতেই আমার এত আনন্দ কেন, কাজ এবং অকাজ দুয়েতেই আমার প্রবল উৎসাহের উৎস কোথায়! কৃষ্ণের সম্বন্ধে রাধা বলেছিল—

"বুলি চোর পৈসে ঘরে, গিহ্নক সতর্ক করে"

কৃষ্ণ চোরকে গৃহের সন্ধান দিয়ে গৃহস্থকে সতর্ক করে; এখন দেখি এ কৃষ্ণ আমি, এ কৃষ্ণ আমরা সবাই, কারণ কৃষ্ণের ও আমাদের উৎপত্তিস্থল এক ও অভিন্ন, আমরা সকলেই সেই একমাত্র ও রূপহীন নিষ্ক্রিয়ের সন্তান, আমরা সহোদর!

এ সত্যকে অনেকেই উপলব্ধি করেছে, এবং ভবিষ্যতে সকলকেই কর্ত্তে হবে। মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ, অণু, পরমাণু, উদ্ভিদ, জড় সকলেরই এই সত্য উপলব্ধি হবে। প্রলয়ের পূর্ব্বে এই পৃথিবীর সমস্ত বোধিসত্ত্বই সম্বুদ্ধ হয়ে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় হেঁকে উঠ্‌বে—

'সোহং—সোহং'

সেদিন এই ধরণীর কর্ত্তব্য শেষ হবে সকলেই মুক্ত হবে, সেদিনই মহাপ্রলয়।

ঈশ্বরের এক নাম আনন্দঘন,—আমিও আনন্দঘন। আমার দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই; মান অপমান, লাভ লোক্‌সান সবই যে আমার অংশ; দাতা এবং গ্রহীতা, জয়ী এবং পরাজিত,—সবই যে সেই আমি—

মহাব্যাহৃতির মধ্যস্থিত সবিতৃদেবের বরেণ্য বীজরূপে যে অধিষ্ঠীত, সে এই একমাত্র ও পরমতম আমি!

সমাপ্ত

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশিত গল্পগুলির বিবরণ

অতীত জননী—ইহা তিনটি স্বতন্ত্র গল্পরূপে গল্পলহরী মাসিক পত্রিকায় ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই তিনটির প্রথম গল্পের নাম ছিল 'গর্গ' দ্বিতীয়টি 'যক্ষপুরে' ও তৃতীয়টি 'মুক্তি'। ইহারা ভাদ্র, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিথি পূজা—গল্পলহরী ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মূর্ত্ত স্মৃতি—গল্পলহরী ১৩৪৩ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রথমে ইহার নামকরণ হইয়াছিল 'মূর্ত্ত প্রশ্ন'।

বন্দিনী—উত্তরায়ণ মাসিক পত্রিকায় ১৩৪৪ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সাথী—গল্পলহরী ১৩৪৭ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

কেশগুচ্ছ—গল্পলহরী ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত। পরিচিত এক ব্যক্তির নিকট হইতে শুনা গিয়াছিল যে, কোন মৃত ব্যক্তির চুল কাটিয়া রাখাতে রাত্রে সেই মৃতব্যক্তি দেখা দিয়াছিল।

মহাকালের বুভুক্ষা—গল্পলহরী ১৩৪৪ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত। কবে কাহার নিকট শুনা গিয়াছিল যে, ট্রেণ যদি বিগ্‌ড়াইয়া কেবলই ছুটিতে থাকে, তাহা হইলে কি হয়? গল্পটির ইহাই উপলক্ষ্য।

ডায়রীর একদিন—প্রবন্ধটি উত্তরায়ণ ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত। বর্ত্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট অধিকাংশ গল্পেরই বিষয় বস্তু—কিরূপে একই মানবাত্মা জন্মান্তরের মধ্যে দিয়া কর্ম্মচক্র অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকে। এই প্রবন্ধে উক্ত বিশ্বাসই স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

"কথা কও কথা কও ;
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
গোপন কথাটি কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী রেখেছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে,
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও—
ভাষা দাও মোরে, হে মুনি অতীত
কথা কও, কথা কও !"

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত

পাপের ছাপ ২।০

জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন মুখে নূতন সমস্যা যে সংঘর্ষ উপস্থিত করে।

রাজশ্রী ৩৲

উচ্ছৃঙ্খল স্বামী ও সাধ্বী স্ত্রীর সংঘর্ষের অপূর্ব্ব চিত্র।

২৲

অবজ্ঞাতা নারীর জীবনের নূতন অধ্যায়।

২৲

বিপত্নীকের নূতন পত্নীর তৃপ্তি কিসে?

শাস্তি ২॥০

স্বামী-স্ত্রীর জটিল ব্যাপারে শাস্তি লভিল কে?

অভয়ের বিয়ে ২।০

ছায়াচিত্রে রূপায়িত সর্ব্বজন-বিদিত উপন্যাস।

বিপর্য্যয় ২॥০

প্রগতিবাদিনী তরুণীর ভাগ্য ও বিশুদ্ধা বিধবার লালসার কথা।

হারজিত ২৲

দুই বন্ধুর দ্বন্দ্বের সমাধান।

নিষ্কণ্টক ১॥০

মানব-মনের কথা ও কাহিনী।

ললিতের ওকালতী

ওকালতী ব্যাপারে রহস্যঘন সমস্যার বিচিত্র আখ্যান।

দাম—২।০

শেষ পথ ২॥০
অগ্নিসংস্কার ২৲
ঋষির মেয়ে (নাটক)
নারায়ণী (নাটক)
খুনের জের ২৲
বংশধর ২৲ **দুষ্টগ্রহ** ২৲
খেয়ালের খেসারত ২॥০
পিছল পথের শেষে ২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বহুপ্রশংসিত রস-গ্রন্থাবলী

কোষ্ঠীর ফলাফল	১৲	আই হ্যাজ	২৷৹
মা ফলেষু	২৲	ভাদুড়ী মশাই	২৷৷৹
কবলুতি	২৲	সন্ধ্যা শঙ্খ	২৲
কাশীর কিঞ্চিৎ	৸৹	উড়ো খৈ	১৷৷৹

সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

বন্ধনী ১৷৷৹

রাজনীতির পথচারী কতিপয় তরুণ-তরুণীর সময়োপযোগী
জীবন পদ্ধতির বাস্তব ছবি।

হংসবলাকা ১৸৹

বর্ত্তমান বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিখুঁত আলেখ্য।

পান্থনিবাস ২৲

পান্থনিবাসে যাহাদের জী[illegible] ক[illegible]টি, এ চিত্র তাহাদের।

আকাশ [illegible] ২৲

বিচিত্র ভঙ্গিতে আকাশ ও মৃত্তিকার দ্বন্দ্ব।

গৃহকপোতী ২৲

গৃহকপোতীর মত গৃহ রচনার আগ্রহ সংক্রান্ত
মনোজ্ঞ উপন্যাস।

রূপবসন্ত ১৷৷৹ **মধুচক্র ১৲**

ময়ূরাক্ষী ১৷৷৹

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা